ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

আবদুস সাত্তার আইনী
অনূদিত

লেখক পরিচিতি

ড. রাগিব সারজানি

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধ্যাপক, আরববিশ্ব যাকে চেনে বিশিষ্ট ইতিহাসগবেষক, ইসলামি চিন্তাবিদ ও দাঈ হিসেবে।

অধ্যাপক ড. রাগিব সারজানি ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদ থেকে এক্সিলেন্ট গ্রেড নিয়ে স্নাতক করেন। ১৯৯১ সালে পবিত্র কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। ১৯৯২ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক্সিলেন্ট গ্রেড নিয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ১৯৯৮ সালে ইউরোলজি ও কিডনি সার্জারির ওপর ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচডি) ডিগ্রি অর্জন করেন।

ইসলামি ইতিহাস ও গবেষণানির্ভর বিভিন্ন বিষয় তার বুদ্ধিবৃত্তিক পদচারণার মূল অঙ্গন। ইসলামি ইতিহাসকেন্দ্রিক সর্ববৃহৎ ওয়েবসাইট www.islamstory.com-এর তত্ত্বাবধায়ক।

অনবদ্য লেখনীগুণে তিনি লাভ করেছেন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার। সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠনের সাথে।

লেখক-আলোচক ড. রাগিব সারজানির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—তিনি কেবল ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরেই ক্ষান্ত হন না বরং ইতিহাসের ধারাবিবরণী থেকে তুলে আনেন সুপ্ত নানা শিক্ষা ও নির্দেশনা, আগামীর পথচলার পাথেয় এবং জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির চিরন্তন সব সূত্র। তার চিন্তা, গবেষণা, লেখালেখি, দাওয়াতি কার্যক্রম, লেকচার-বক্তৃতা ইত্যাদি কর্মতৎপরতার মূল লক্ষ্য—

মুসলিমজাতির জাগরণের কার্যকারণসমূহ নির্ণয় ও পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে সেগুলোর সদ্ব্যবহার। উম্মাহর সদস্যদের হৃদয়জগতে দ্বীন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা ও প্রত্যাশা তৈরি করা। তাদেরকে চিন্তা ও চেতনা, জ্ঞান ও কর্মে অগ্রবর্তী হতে পথনির্দেশ করা। ইসলামি ইতিহাসের সঠিক ও প্রকৃত রূপ উন্মোচন করা। সভ্যতার বিনির্মাণে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অবদান সুস্পষ্ট করা।

অপর ফ্ল্যাপ দ্রষ্টব্য
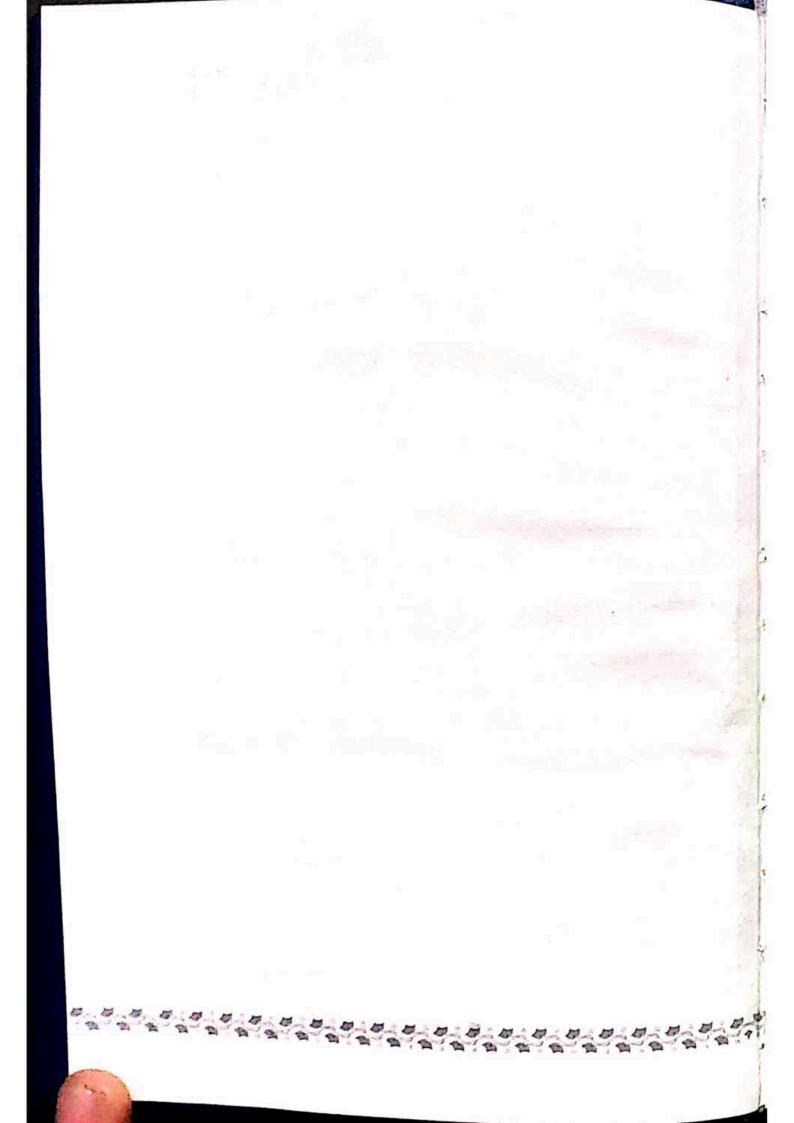
ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে
কী দিয়েছে

প্রথম খণ্ড

আবদুস সাত্তার আইনী
অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে (১ম খণ্ড)
প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উলা ১৪৪২/জানুয়ারি ২০২১
তৃতীয় মুদ্রণ : জুমাদাল উখরা ১৪৪২/ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
quickkcart.com - wafilife.com - rokomari.com
ISBN : 978-984-8012-64-2
Web : maktabatulhasan.com

মূল্য : ২৯০০/- টাকা মাত্র [চার খণ্ড একত্রে]

MuslimJati Bisshoke ki Diyece (1st Part)
Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com fb/Maktabahasan

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

মূল আরবি গ্রন্থ : মা-যা কাদ্দামাল মুসলিমুনা লিল আলাম

লেখক : ড. রাগিব সারজানি

অনুবাদ : আবদুস সাত্তার আইনী (১ম, ২য় ও ৪র্থ খণ্ড)
উমাইর লুৎফর রহমান (৩য় খণ্ড)

সম্পাদনাপর্ষদ : আতাউস সামাদ, আব্দুর রহীম আল-আজহারী, মাহমুদুল হাসান, মিশকাত আহমদ, রেদওয়ান সামী, সদরুল আমীন সাকিব, সাকিব আবদুল্লাহ

বানান সমন্বয় : খন্দকার আব্দুল গাফফার, মাসউদ আহমাদ, মুনতাসির বিল্লাহ, নূর মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, মুহিব্বুল্লাহ মামুন

চিত্রবিন্যাস : আখতারুজ্জামান, উজ্জ্বল আহমেদ

পৃষ্ঠাসজ্জা : আবু আফিফ মাহমুদ

প্রচ্ছদ : আখতারুজ্জামান

সার্বিক সমন্বয় : সুফিয়ান আহমেদ

প্রকাশক : মো. রাকিবুল হাসান খান

সূচিপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

অধিকার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবার

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমাজ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুসলিম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞান-সংস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম এবং জ্ঞানের নতুন দর্শন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলাম এবং বিজ্ঞানীদের চিন্তার পরিবর্তন

চিত্র সূচি

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। তাঁর প্রশংসিত রাসুল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বর্ষিত হোক রহমত ও শান্তিধারা।

মানুষ আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। জমিনে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তিনি তাদের প্রেরণ করেন। মানুষের সুযোগ-সুবিধার লক্ষ্যে পৃথিবীর সকল-কিছু তাদের অধীন করে দেন এবং পৃথিবীজুড়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যুগে যুগে নবী-রাসুল ও কিতাব পাঠান। তারপর মানবসম্প্রদায় সে অনুযায়ী আল্লাহপ্রিয় দেশ, জাতি ও সমাজ গঠন করে এবং তার উন্নয়নকল্পে চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয়ের মাধ্যমে চমৎকার এক পৃথিবী সাজায়।

ইসলাম আল্লাহ তাআলার মনোনীত ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা এবং এই ধর্মের অনুসারী মুসলিমজাতি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উম্মাহ। কেননা মানবজাতির কল্যাণেই তাদের আবির্ভাব। তাদের সর্বপ্রধান কীর্তি হচ্ছে, মহান রবের প্রতি আত্মনিবেদিত মানবজাতি গঠনে তারা অনন্যসাধারণ। তবে মুসলিমজাতির অবদান শুধু রবের সাথে মানবজাতির সেতুবন্ধন সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানবকল্যাণের প্রতিটি শাখাতেই তাদের অবদান ও ভূমিকা অনস্বীকার্য। হাজার বছরের ইতিহাস তাদের কৃতিত্বে ভরপুর। তবে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে এই জাতির অধিকাংশ সদস্যই তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আবিষ্কার-উন্নয়ন সম্পর্কে অবগত নয়। যে কারণে তারা হীনম্মন্যতার শিকার। নিজ জাতির গৌরবময় অধ্যায় না জানার কারণে পশ্চাৎপদতার আঁধার তাদের যেন কাটে না।

ড. রাগিব সারজানি সাম্প্রতিক সময়ের বিশিষ্ট মুসলিম ইতিহাসবিদ। ইসলামি ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে লিখে ইতিমধ্যে তিনি বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তার বদ্ধপরিকর চিন্তা-চেতনা হচ্ছে মুসলিমজাতির মাঝে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া। জাতির সন্তানদের মাঝে তাদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা ও তাদের আত্মপরিচয়ে বলীয়ান

করা। সে ধারারই এক মূল্যবান উপহার *মা-যা কাদ্দামাল মুসলিমুনা লিল আলাম* নামক গ্রন্থ, যা আজ অনূদিতরূপে পাঠকের হাতে। ব্যাপক তথ্যসমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি পাঠকমহলে সমাদর লাভ করে। জাতিগঠন ও জগদ্‌বিনির্মাণে মানবেতিহাসের পরতে পরতে মুসলিমদের আবিষ্কার, উন্নয়ন ও অবদানের বীরত্বগাথা নিয়ে এটি এক অনন্য রচনা।

চমৎকার বিষয়বস্তু, নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত, মানোত্তীর্ণ উপস্থাপনা সব মিলিয়ে এটি লেখকের অনবদ্য এক সৃষ্টি। রচনামানে উত্তীর্ণ হয়ে তা 'মুবারক অ্যাওয়ার্ডের' জন্য শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে মনোনীত হয়। বাংলাভাষী পাঠকসমাজ দীর্ঘদিন যাবৎ এ ধরনের গ্রন্থশূন্যতা অনুভব করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ পাঠকের সেই শূন্যতা পূরণে সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করি।

গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম ও সম্পাদনার পেছনে দীর্ঘ সময় ও পরিশ্রম ব্যয় হয়েছে। সম্মানিত অনুবাদকদ্বয় ও সম্পাদনাপর্ষদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তা আজ পাঠকের হাতে। গ্রন্থটির বৈষয়িক গুরুত্ব বিবেচনা করে একে যথাসম্ভব নির্ভুল ও সুন্দর করার প্রচেষ্টা ব্যয় হয়েছে। আমরা আশা করি, এটি পাঠককে তৃপ্ত করতে সক্ষম হবে। তবুও মানবীয় দুর্বলতাহেতু এতে কোনোপ্রকার ভুলভ্রান্তি ও অসৌন্দর্য থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই পাঠকের নজরে কোনোপ্রকার ত্রুটি গোচরীভূত হলে নসিহাস্বরূপ আমাদের তা জানানোর অনুরোধ থাকল। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন।

সম্পাদনাপর্ষদ
মাকতাবাতুল হাসান
জুমাদাল উলা, ১৪৪২ হি.

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর অশেষ রহমতে এই গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদকর্ম সম্পন্ন হলো। ড. রাগিব সারজানি কর্তৃক রচিত এটি তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বলা যায়, এই গ্রন্থ তাকে খ্যাতির চূড়ায় আসীন করেছে এবং তাকে প্রভূত সম্মান এনে দিয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি ইসলামি সভ্যতার যে চিত্রাঙ্কন করেছেন তা অনন্য ও তুলনারহিত। কিছু কিছু জায়গা সংক্ষিপ্ত হলেও গ্রন্থটির চমৎকার বিন্যাস তা পুষিয়ে দিয়েছে। প্রথমে তিনি ইসলামপূর্ব বিশ্ব ও অন্যান্য সভ্যতার চিত্র তুলে ধরেছেন। তারপর ইসলামি সভ্যতার উদ্ভব, উৎস ও বৈশিষ্ট্যাবলির ওপর আলোকপাত করেছেন। মূল্যবোধ ও নৈতিকতার দিক থেকে ইসলামি সভ্যতাই যে অগ্রগামী তা তিনি জোরালো ভাষায় প্রমাণ করেছেন। মানবাধিকার, চিন্তা ও ধর্মের স্বাধীনতা, মুসলিম পরিবার ও সমাজের কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে দালিলিক আলোচনা করেছেন। ইসলামি সভ্যতার যুদ্ধকালীন আচরণ ও নৈতিকতা এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেছেন।

ইসলামি সভ্যতায় জ্ঞানের ব্যাপকতা, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের দর্শন, জ্ঞানী সমাজের চিন্তার পরিবর্তন, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ইত্যাদি বিষয় লেখক হৃদয়গ্রাহীরূপে তুলে ধরেছেন। জ্ঞানের পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতি ও প্রায়োগিক দিকের ওপর যেমন আলোকপাত করেছেন, তেমনই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেমন : চিকিৎসাবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, রসায়নশাস্ত্র, ওষুধবিজ্ঞান, বীজগণিত ও যন্ত্রপ্রকৌশলে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অনন্য আবিষ্কার ও অবদান তুলে ধরেছেন।

সভ্যতা বিনির্মাণে আকিদা-বিশ্বাসের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার অবদান অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে লেখক তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। জ্ঞানের উদ্ভাবন, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর আকিদা-বিশ্বাস, স্রষ্টা-সম্পর্কিত ধারণার সংশোধন ইত্যাদির

পাশাপাশি ইসলামি দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ও সমাজবিদ্যার ওপর আলোকপাত করেছেন।

সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামি সভ্যতার অবদান কী তা অত্যন্ত দালিলিক বয়ানে তুলে ধরেছেন লেখক। বিচারবিভাগ, প্রশাসন, স্বাস্থ্যবিভাগ, পান্থনিবাস, মুসাফিরখানা—এগুলোর উন্নতি ইসলামি সভ্যতার উৎকর্ষেরই পরিচায়ক। ইসলামি শিল্পকলা, স্থাপত্যকলা, অলংকরণশিল্প, আরবি লিপিকলা, তৈজসপত্রের নান্দনিকতা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর সৌন্দর্য, পরিবেশের সৌন্দর্য, বাগানচর্চা—এগুলোর আলোচনায় ইসলামি সভ্যতার সৌন্দর্যপ্রিয়তাই ফুটে উঠেছে। চারিত্রিক সৌন্দর্য, সূক্ষ্ম রুচিবোধ এবং নাম ও উপাধির নান্দনিকতাও সভ্যতার উৎকর্ষের পরিচায়ক। এই ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতা ছিল অনন্য।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও সভ্যতার বিকাশে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব ও অবদান অনস্বীকার্য। চিন্তা ও বিশ্বাস, জ্ঞানবিজ্ঞান, ভাষা-সাহিত্য ও শিল্প—সব ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সভ্যতার ওপর ইসলামি সভ্যতার প্রভাব রয়েছে। ইসলামি সভ্যতাই মূলত ইউরোপীয় সভ্যতার পথ রচনা করে দিয়েছে। বিশ্বের বিখ্যাত মনীষীরা এসব বিষয় স্বীকার করে নিয়েছে। ড. রাগিব সারজানি উপর্যুক্ত বিষয়গুলো প্রামাণিকতাসহ প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন।

বাংলাভাষায় এই ধরনের গ্রন্থ নেই বললেই চলে। গ্রন্থটির অনুবাদ এই সময়ের একটি যৌক্তিক দাবি ছিল। আমরা এই দাবি পূরণ করতে পেরে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি।

গ্রন্থটির অনুবাদে আমি সর্বোচ্চ শ্রম ব্যয় করেছি। প্রতিটি বক্তব্য পাঠকের বোধগম্য ভাষায় পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। সহজবোধ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও টীকা সংযোজন করেছি। গ্রন্থটির পাঠে পাঠকশ্রেণি উপকৃত হবেন আশা করি এবং এতেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আবদুস সাত্তার আইনী
পন্তারী, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁর গুণগান গাই, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের অন্তরের এবং কর্মরাশির অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাই। বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবিগণ এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাঁর পথে আহ্বানকারীদের ওপর বর্ষিত হোক আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত।

আমি যেসব বিষয়ে লিখতে উৎসাহী ছিলাম এবং এখনো আছি, তার অন্যতম হলো ইসলামি সভ্যতা। মানব-প্রকৃতির কালযাত্রা বোঝার জন্য অবশ্যই ইসলামি সভ্যতার গভীর পাঠ নিতে হবে। এটা শুধু এ কারণে নয় যে, ইসলামি সভ্যতা মানবেতিহাসের একটি পর্যায় এবং শুধু এ কারণেও নয় যে, তা প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে নতুন সভ্যতার মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছে; বরং মানবসভ্যতায় মুসলিমদের রয়েছে বিপুল ও বিশাল গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ইসলামি সভ্যতার পাঠ নেওয়া ছাড়া মানবসভ্যতা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কী উৎকর্ষ সাধন করেছে তা অনুধাবন করা অসম্ভব। মানবসভ্যতার ইতিহাস জানতে হলে নবুয়তের যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইসলামি সভ্যতাকে তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ জানতে হবে। কেননা, মানবেতিহাসে এটি এক স্বর্ণোজ্জ্বল সময়।

ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি উগ্র আক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে লেখালেখির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে গেছে। এই আক্রমণের ব্যানার ও বিষয় হলো মুসলিমদের পিছিয়ে পড়া ও পশ্চাৎমুখিতা এবং নিশ্চলতা ও বর্বরতার অপবাদ দেওয়া, সন্ত্রাস ও সহিংসতা মুসলিমদের মৌলিক চারিত্র ও স্বভাব বলে দাবি করা। অধিকাংশ মুসলিমই এসব অপবাদের সামনে হাত গুটিয়ে জিহ্বা মুখের ভেতর পুরে দাঁড়িয়ে আছেন; তারা সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর দিতে পারছেন না, প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও নিতে পারছেন না। এই

মৌনতাবলম্বন মূলত আমাদের শেকড় ও ইতিহাস এবং আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে মারাত্মক অজ্ঞতার ফল।

যে অজ্ঞতা আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনাকে অবরুদ্ধ রেখেছে, তার চেয়েও ভয়ংকর ব্যাপার এই যে হতাশা ও নৈরাশ্য মুসলিমদের চেতনাশক্তিকে বিকল করে দিয়েছে। এই হতাশা ও নৈরাশ্য মুসলিম উম্মাহর বর্তমান যুগের কিছু কার্যকলাপের প্রতিফল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামি বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান অনেকের হৃদয়ে যাতনার সৃষ্টি করবে, যেমন শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এমনকি চারিত্রিক অবস্থা এতটা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে যা মুসলিম উম্মাহর মতো একটি সভ্য উন্নত জাতির জন্য মোটেই মানানসই নয়। এ বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে এবং আমাদের চিত্তকে এমন হতাশা ও অবসন্নতায় ডুবিয়ে দেয় যা গ্রহণযোগ্য নয়, উপযোগীও নয়।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হলো আমাদের শেকড়ে ফিরে যাওয়া; আমাদের ইতিহাস পাঠ করা, আমাদের নেতৃত্ব ও ক্ষমতার কার্যকারণগুলো অনুধাবন করা। এই উম্মাহর সূচনাকাল যা-কিছু দ্বারা উৎকর্ষমণ্ডিত হয়েছিল, তার পরবর্তীকালও সেসব বিষয় দ্বারাই উৎকর্ষমণ্ডিত হবে। এ কারণে কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন বা প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চায় কাজে লাগানোর জন্য এই ইতিহাস পাঠ করব না এবং এই সভ্যতায় পাণ্ডিত্য অর্জন করব না; বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো, সেই ভিত্তিভূমিকে ফিরিয়ে আনা, ভেঙে পড়া টুকরোগুলোকে পুনর্নির্মাণ করা এবং মুসলিমজাতিকে সঠিক গন্তব্যপথে ফিরিয়ে আনা। একইভাবে আমাদের লক্ষ্য হলো, মানবসভ্যতার যাত্রায় আমাদের অবদান এবং মানবজীবনে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বিশ্বকে অবহিত করা। এটা অনুগ্রহ ফলানো নয় এবং অহংকারেরও বিষয় নয়। বরং এটা সত্যকে তার উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো, যে ধর্ম বিশ্বমানবের জন্য একটি সর্বোত্তম জাতি নির্মাণ করেছে।

বিষয়টি অত্যন্ত প্রিয় হওয়া এবং এ বিষয়ে লিখতে আমার আগ্রহ-উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও আমি প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে গোপন করব না যে, এ বিষয়ে কলম ধরা অত্যন্ত শক্ত কাজ।

বিভিন্ন কারণে এই কাঠিন্য সৃষ্টি হয়েছে : সভ্যতার সংজ্ঞা নির্মাণে চিন্তাবিদ ও লেখকগণের মতভিন্নতা, মানবসভ্যতার শত শত বিষয়ে মুসলিমদের ব্যাপক অবদান, যে সময়কে ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি তার বিপুল বিস্তৃতি, কারণ আমরা চৌদ্দ শতাব্দীরও বেশি সময়ের প্রচেষ্টা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। আরও একটি কারণ এই যে, আমরা পশ্চিমের দেশ স্পেন থেকে নিয়ে প্রাচ্যের দেশ চীনসহ অসংখ্য ভূখণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করব, যেখানে মুসলিমগণ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বংশবিস্তার করেছেন। এসব জটিলতা বইটিতে বারবার বিন্যাস-পুনর্বিন্যাস করতে বাধ্য করেছে। যখনই আমি বইটির অধ্যায় ও অনুচ্ছেদগুলো বিন্যাসের একটি রূপরেখা দাঁড় করেছি, আমাকে অন্য একটি রূপরেখা দাঁড় করাতে হয়েছে। অবশেষে এটি বক্ষ্যমাণ অবস্থায় রূপ নিয়েছে। আমার মনে হয়, যদি আরেকবার দৃষ্টি বোলাতাম, তবে আমাকে আরেকবার বিন্যস্ত করতে হতো।

সম্ভবত এ বিষয়বস্তুতে সবচেয়ে জটিল ব্যাপার হলো সভ্যতার সংজ্ঞায়নে চিন্তাবিদদের মধ্যে স্পষ্ট মতভিন্নতা, সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও পরিচয়। পূর্ববর্তী চিন্তাবিদদের কাছে সভ্যতা বলতে কেবল 'নগরে বাসস্থান'-ই বোঝাত। আর নগর বলতে মরুভূমি বা গ্রাম এলাকার বিপরীত বিষয় বোঝানো হতো। এ ব্যাপারে ইবনে মানযুর[১] বলেছেন, সভ্যতা হলো নগরে বসবাস। তাদের মতে নাগরিক মানুষ এবং যাযাবর ও গ্রাম্য মানুষ এক নয়।[২]

কিন্তু এরপরে সভ্যতার উল্লিখিত অর্থের বিকাশ ও উন্নতি ঘটেছে এবং শিল্প, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, আইনকানুন, মোটকথা নাগরিক মানুষেরা যা-কিছু উপভোগ করে তার সব অন্তর্ভুক্ত করেছে। অর্থাৎ, গ্রামীণ বা যাযাবর মানুষের জীবনাচারে এসব উপকরণ থাকে না, কিন্তু এসব বিষয় নাগরিক মানুষের জীবন সুন্দর ও সুচারু করে তোলে। অর্থাৎ, বর্ণিত সংজ্ঞায়

---

১. ইবনে মানযুর : আবুল ফজল মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম ইবনে আলি, জামালুদ্দিন ইবনে মানযুর আল-আনসারি আর-রওয়াইফিয়ি আল-ইফরিকি (৬৩০-৭১১ হিজরি/১২৩২-১৩১১ খ্রিষ্টাব্দ)। প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী। মিশরে জন্মগ্রহণ করেন, কেউ বলেছেন তার জন্ম ত্রিপোলিতে। তিনি কায়রোর ইনশা দপ্তরে চাকরি করেন। এরপর ত্রিপোলিতে বিচারক পদে নিযুক্ত হন। আবার মিশরে ফিরে আসেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, খাইরুদ্দিন আয-যিরিকলি, *আল-'আলাম*, খ. ৭, পৃ. ১০৮।

২. ইবনে মানযুর : *লিসানুল আরব*, حضر মূলধাতু, খ. ৪, পৃ. ১৯৬।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো জীবনের জন্য আবশ্যক নয় বরং সৌন্দর্যবর্ধক। ইবনে খালদুন[৩] সভ্যতাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, কোনো বসতির প্রয়োজনাতিরিক্ত স্বাভাবিক প্রচলিত অবস্থা। বিলাসব্যসনের পার্থক্যের দ্বারা অতিরিক্ত বিষয়গুলোর পার্থক্য নির্ণীত হয়। এ ক্ষেত্রে জাতিসমূহের মধ্যে স্বল্পতায় ও আধিক্যে সীমাহীন পার্থক্য রয়েছে।[৪]

সম্ভবত সভ্যতার মূল শব্দটি ইউরোপীয় পরিভাষায় একই অর্থ বুঝিয়ে থাকবে। সভ্যতার ইংরেজি প্রতিশব্দ civilization ল্যাটিন শব্দ civis থেকে এসেছে। শব্দটি নাগরিক বা নগরের অধিবাসী বোঝায়।[৫] অর্থাৎ, শব্দটি ইউরোপীয়দের কাছে যারা শহরে বাস করে তাদের বোঝায়। পরবর্তীকালে অন্যদের কাছে যেমন শব্দটি ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লাভ করেছে, তেমনই ইউরোপীয়দের কাছেও শহরে বসবাসকারী মানুষের অবস্থাবলিকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে এ শব্দটি অর্থগত বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা লাভ করেছে। এ কারণে চিন্তাবিদদের কাছে সভ্যতা ও নাগরিক জীবন শব্দ দুটি অনেকাংশে সমার্থবোধক হয়ে উঠেছে, যদিও এগুলোর অর্থের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

কিন্তু এই ভাষাগত মৌলিক অর্থ চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের সর্বসম্মত চিন্তা ও অভিমতকে প্রতিফলিত করে না। কারণ তাদের পরস্পর বিপরীতমুখী ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে। এই মতভিন্নতা কেবল (সভ্যতা শব্দটির) ভাষাগত ভিন্নতা বোঝায় না; বরং চিন্তাগত, আদর্শগত, চরিত্রগত এমনকি বিশ্বাসগত ভিন্নতাও বোঝায়।

কোনো কোনো চিন্তাবিদ মানুষকে সভ্যতার বিষয়বস্তু করেছেন এবং মানুষের চারিত্রিক, নৈতিক ও আচরণগত উৎকর্ষকে সভ্যতারূপে বিবেচনা করেছেন। সন্দেহ নেই যে, এটি একটি চমৎকার অভিমত। এতে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় এবং তাকে বস্তুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়। এখানে একইসঙ্গে মানুষের চিন্তা ও আবেগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। উদাহরণত,

---

৩. ইবনে খালদুন : আবু যায়দ আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খালদুন (৭৩২-৮০৮ হিজরি/ ১৩৩২-১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দ)। ইতিহাসবিদ, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী। জন্ম ও বেড়ে ওঠা তিউনিসিয়ায়। দেখুন, ইবনুল ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, খ. ৭, পৃ. ৭৬ এবং আস-সাখাবি, *আদ-দাওউল লামিউ*, খ. ৪, পৃ. ১৪৫-১৪৯।

৪. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ১, পৃ. ৩৬৮, ৩৬৯।

৫. তাওফিক আল-ওয়ায়ি, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা মুকারিনাতুন বিল হাদারাতিল গারবিয়্যাহ*, পৃ. ৩১।

এই ঘরানার চিন্তাবিদদের একজন হলেন মালেক ইবনে নবি[৬]। তিনি সভ্যতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন 'চিন্তাগত অনুসন্ধান ও আত্মাগত অনুসন্ধান' হিসেবে।[৭] একইভাবে সাইয়িদ কুতুব[৮] এই অর্থকেই জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন, সভ্যতা হলো যা মানবজাতিকে চিন্তাভাবনা, আদর্শ-মতাদর্শ এবং মানুষের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো মূল্যবোধ দান করে।[৯] এই দুইজনের পূর্বে অ্যালেক্সিস ক্যারেল[১০] অনুরূপ লক্ষ্যপানে এগিয়েছেন এবং সভ্যতাকে চিন্তাগত ও আত্মিক

---

৬. মালেক ইবনে নবি (১৯০৫-১৯৭৩ খ্রি.) : আলজেরিয়ান চিন্তাবিদ, দার্শনিক। বর্তমান যুগের ইসলামি চিন্তাবিদদের অন্যতম। ইসলামি সভ্যতা ও রেনেসাঁস সম্পর্কে লিখে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। প্যারিস, কায়রো ও আলজেরিয়ায় বসবাস করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

الظاهرة القرانية، شروط النهضة، وجهة العالم الإسلامي.

৭. মালেক ইবনে নবি, *শুরুতুন নাহদা*, পৃ. ৩৩।

৮. পুরো নাম সাইয়িদ কুতুব ইবরাহিম হুসাইন আশ-শারিবি। মিশরের আসইয়োত জেলার মুশা গ্রামে ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা উসমান হুসাইন এবং মা ফাতিমা। কুতুব তার বংশীয় অভিধা। গ্রামেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং কুরআন শরিফ হিফয করেন। ১৯২২ সালে কায়রোর মাদরাসাতুল মুআল্লিমিন আল-আওয়ালিয়্যা (আবদুল আযিয)-এ ভর্তি হন। ১৯২৪ সালে এখানে তিন বছরের কোর্স সমাপ্ত করে ১৯২৫ সালে মাদরাসা-ই-তাজহিযিয়্যাতে ভর্তি হন। এখানে চার বছরের শিক্ষা সম্পন্ন করে ১৯২৯ সালের শেষ দিকে দারুল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৩৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছরের পাঠ সম্পন্ন করেন। একই বছরের ডিসেম্বরে তাহজিরিয়্যা দাউদিয়্যাতে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত আরও তিনটি মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এ বছরের ১ মার্চ শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিভাগে যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে মন্ত্রণালয় তাকে আমেরিকায় প্রেরণ করে। ১৯৫০ সালে আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন। ১৯৫২ সালের ১৮ অক্টোবর তিনি মন্ত্রণালয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন। কিন্তু মন্ত্রী তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি। ১৯৫৪ সালের ১৩ জানুয়ারি সাইয়িদ কুতুবের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয় এবং অভিযোগ করা হয় যে তিনি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকাকালে সরকারবিরোধী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৫০ সাল থেকেই সম্পৃক্ত থাকলেও সাইয়িদ কুতুব ১৯৫৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। ১৯৫৫ সালের ১৩ জুলাই পিপল্‌স্ কোর্ট সাইয়িদ কুতুবকে পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। ১৯৬৪ সালে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। ১৯৬৫ সালের ৯ আগস্ট তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬৬ সালের ২১ আগস্ট সাইয়িদ কুতুবসহ সাতজনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। ২৯ আগস্ট ভোর রাতে সাইয়িদ কুতুব ও তার দুই সঙ্গীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

৯. সাইয়িদ কুতুব, *আল-মুসতাকবালু লি হাযাদ-দ্বীন*, পৃ. ৬৩।

১০. অ্যালেক্সিস ক্যারেল (Alexis Carrel 1873-1944) : ফরাসি চিকিৎসক ও চিন্তাবিদ। ফ্রান্সে ও যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করেছেন। ১৯১২ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে অবদানের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। *Man, The Unknown* গ্রন্থটি লিখে তিনি চিন্তার জগতে বিশিষ্টতা অর্জন করেন।

অনুসন্ধান এবং মানুষের মানসিক, জৈবিক ও মানবিক সৌভাগ্যের জন্য নিয়োজিত জ্ঞান বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন।[১১] গুস্তাভ লি বোঁ[১২] প্রায় একইরকম সংজ্ঞা দিয়েছেন, সভ্যতা হলো চিন্তা-চেতনা, আদর্শ ও বিশ্বাসের পরিপক্বতা এবং মানুষের অনুভূতি-উপলব্ধির উৎকর্ষ সাধন।[১৩] এসব সংজ্ঞায় মানুষের অভ্যন্তরীণ জগৎ, তার চিন্তাভাবনা ও চরিত্রকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

কোনো কোনো চিন্তাবিদ সভ্যতা বলতে মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট ও উৎপাদিত বিষয় ও বস্তুকে বুঝিয়েছেন। উপর্যুক্ত চিন্তাবিদদের মতো তারা মানুষের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। বরং তারা মানবগোষ্ঠী সমাজে কী উৎপাদন করেছে তার প্রতি লক্ষ রাখেন। জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের উৎপাদিত বিষয়সমূহকে তারা সম্যক দৃষ্টিতে দেখতে চান অথবা তারা একটি দিকের বিবেচনায় অপর একটি দিককে বেশি গুরুত্ব দিতে চান। যেমন ড. হুসাইন মুনিস[১৪] মনে করেন, জীবনকে সুন্দর ও সুচারু করার জন্য মানবমণ্ডলী যে প্রচেষ্টা ব্যয় করে তার ফলাফলই সভ্যতা। চাই ওই ফল অর্জনের জন্য উদেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচেষ্টা ব্যয়িত হোক অথবা বস্তুগতভাবে ও পরোক্ষভাবে অর্জিত হোক।[১৫] তিনি মানুষের প্রচেষ্টা ও তার উৎপাদনের প্রতি সম্যক দৃষ্টিপাত করেছেন। একইভাবে উইল ডুরান্ট[১৬] চিন্তা ও

---

১১. *Man, The Unknown*, পৃ. ৫৭।

১২. গুস্তাভ লি বোঁ (Gustave Le Bon 1841-1931) : ফরাসি প্রাচ্যবিদ। মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ হলো : *The World of Islamic Civilization (1974)*। গ্রন্থটিকে আরবীয় ইসলামি সভ্যতা বিষয়ে সাম্প্রতিকালে ইউরোপে প্রকাশিত অন্যতম মৌলিক বই হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৩. গুস্তাভ লি বোঁ, *Psychologie du Socialisme*, আরবি অনুবাদ *রুহুল জামাআহ* থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১৭।

১৪. হুসাইন মুনিস (১৯১১-১৯৯৬ খ্রি.) : কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক ও আরবি ভাষাসংঘের সদস্য ছিলেন। মাদ্রিদে অবস্থিত ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টারের পরিচালক ছিলেন। মিশর থেকে প্রকাশিত *আল-হিলাল* পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন কিছুদিন। ইতিহাস ও সভ্যতা বিষয়ে আরবি, ইংরেজি, ফরাসি ও স্প্যানিশ ভাষায় রচিত তার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে।

১৫. হুসাইন মুনিস, *আল-হাদারা দিরাসাতুন ফি উসুলি ওয়া আওয়ামিলি কিয়ামিহা ওয়া তাতাউরিহা*, পৃ. ১৩।

১৬. উইল ডুরান্ট (১৮৮৫-১৯৮১ খ্রি.) : বিখ্যাত মার্কিন ইতিহাসবিদ। তার সর্ববৃহৎ গ্রন্থ হলো ৪২ খণ্ডে প্রকাশিত *The Story of Civilization* (সভ্যতার গল্প)। এটাতে তিনি সূচনালগ্ন থেকে

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানব-উৎপাদনকে বিশিষ্টতা দান করেছেন। জীবনের অন্যান্য কার্যকারণকে এই উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সভ্যতা হলো সামাজিক শৃঙ্খলা, যা মানুষকে চারটি উপাদানের দ্বারা সাংস্কৃতিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উপাদান চারটি এই : অর্থনৈতিক উৎস, রাজনৈতিক সংগঠন, স্বভাবগত ধ্যানধারণা এবং জ্ঞান ও শাস্ত্রচর্চা।[১৭]

কোনো কোনো চিন্তাবিদ সভ্যতার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করে থাকেন। তারা সভ্যতাকে মানবজীবনের আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসের স্বাচ্ছন্দ্যপ্রদ বিষয় ও বস্তু বলে আখ্যায়িত করেন। তারা মানবের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তা এবং চরিত্র ও আদর্শেরও মূল্য নেই তাদের কাছে। এই ধরনের বস্তুবাদী চিন্তাবিদদের মধ্যে দুটি ঘরানা রয়েছে। একদল হলো বস্তু পূজারি, জাতি বা সমাজ বিনির্মাণে আদর্শ ও মূল্যবোধ একটি মৌলিক চালিকাশক্তি—এ বিষয়টিকে তারা চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, সমাজতন্ত্রীরা ও পুঁজিবাদীরা এই দলের অন্তর্ভুক্ত। তারা সভ্যতা ও নাগরিক সমাজব্যবস্থাকে সমার্থক বলে বিবেচনা করেন। ড. আহমাদ শালবি[১৮] তাদের থেকে বর্ণনা করেছেন, নাগরিক সমাজব্যবস্থার সংজ্ঞা হলো, বৌদ্ধিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, তথা চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, কৃষি, শিল্প ও যন্ত্রের উদ্ভাবনবিদ্যা ইত্যাদির উৎকর্ষ।[১৯]

এই দলেই কেউ কেউ আছেন যারা চরিত্র ও চারিত্রিক গুণাবলিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। যেমন নিৎশে[২০] এবং এমন অন্য

নিয়ে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সভ্যতার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এটি আরবিতে *কিসসাতুল হাদারাহ* নামে অনূদিত হয়েছে।

১৭. উইল ডুরান্ট, *The Story of Civilization*, আরবি অনুবাদ *কিসসাতুল হাদারাহ* থেকে উদ্ধৃত, খ. ১, পৃ. ৯।

১৮. আহমাদ শালবি (১৯১৫-২০০০ খ্রি.) : সমকালীন মিশরের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুল উলুমে পড়ালেখা শেষ করেন। মিশরের ও আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *মাউসুআতুত তারিখিল ইসলামিয়্যি*, এবং *মাউসুআতুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*।

১৯. আহমাদ শালবি, *মাউসুআতুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ২০।

২০. নিৎশে : ভাববাদী জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিখ ভিলহেল্ম নিৎশে (Friedrich Wilhelm Nietzsche) ১৮৪৪ সালের ১৫ অক্টোবর জার্মানির প্রুশিয়ার অন্তর্গত রকেন গ্রামের এক প্রোটেস্ট্যান্ট পুরোহিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বন ও লাইপৎসিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব ও

দার্শনিকগণ যারা বলেন, সভ্যতা হলো মধ্যপন্থা ও চরিত্রের বিনাশ ঘটানো এবং যা-ইচ্ছা-তাই করার ক্ষেত্রে আমাদের মুক্ত-স্বাধীন স্বভাবের লাগাম ছেড়ে দেওয়া। তারা আরও বলেছেন, চরিত্র দুর্বল মানুষদের উদ্ভাবন ছাড়া কিছু নয়। যাতে তারা এর দ্বারা শক্তিমানদের রাজাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারে। আমরা চরিত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি।[২১]

আরেক দল বস্তুবাদী আছেন যারা চরিত্রের ভূমিকাকে খাটো করতে চান না, তবে তারা সভ্যতাকে চূড়ান্তরূপে বস্তুবাদী বিষয় মনে করেন। তাদের লেখা থেকে এটাই বোঝা যায়। মানবচরিত্রের সঙ্গে সভ্যতার কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন ইবনে খালদুনের নিম্নলিখিত বক্তব্য থেকে এই ধরনের অর্থই ফুটে ওঠে,

> সভ্যতা হলো বিলাসব্যসনে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি, তার অবস্থার উৎকর্ষ সাধন—রন্ধন, পোশাক-আশাক, গৃহসজ্জা, গৃহনির্মাণ, আসবাব ও তৈজসপত্র—যা-কিছু জীবনকে সুন্দর ও সুচারু করে এমন শিল্পমণ্ডিত বস্তুরাশিতে আসক্তি। এই রুচিশীলতা অসংখ্য শিল্পবস্তুর নির্মাণ আবশ্যক করে তোলে।[২২]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইবনে খালদুন চরিত্র ও মূল্যবোধকে সভ্যতা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাননি, বরং তিনি জাতি বিনির্মাণে চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সাব্যস্ত করেছেন। তবে আমরা যেমন বলেছি, তিনি এখানে সভ্যতা শব্দটিকে নাগরিক জীবন ও তার অনুগামী বিষয়সমূহের বিশেষণ বলে বিবেচনা করেছেন।

ধ্রুপদী ভাষাবিদ্যার মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ভাষাবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, রাষ্ট্র ও আইনের সমস্যাবলিতেও তার আগ্রহ দেখা যায়। প্রচলিত নৈতিক ধারণা সম্পর্কে নিৎশের অবজ্ঞা সর্বজনবিদিত। তার দর্শন স্বাতন্ত্র্যবাদী, অতিমানবে বিশ্বাসী, সাম্যবাদের বিরোধী ও খ্রিষ্টধর্মের পরিপন্থী। সমাজতন্ত্রে আতঙ্ক, জনগণের প্রতি ঘৃণা, যেকোনো মূল্যে পুঁজিবাদী সমাজের অনিবার্য বিনাশ প্রতিরোধের প্রয়াস হিসেবে তার মতবাদ চিহ্নিত হয়ে আসছে। বিশ শতকে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী রাজনীতির উত্থানের পেছনে নিৎশের দর্শনের প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা হয়। তার রচনাবলিতে কাব্যময়তা ও আবেগপূর্ণ স্নিগ্ধ মাধুর্যের পাশাপাশি ব্যাধিগ্রস্ত মনের সংবেদনশীলতাও লক্ষণীয়। *'জরথুস্ত্রের বাণী'*, *'ভালোমন্দের অতীত'*, *'নীতির পরিবর্তন'* এবং *'খ্রিষ্ট-বিরোধ'* তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। নিৎশে ২৫ আগস্ট ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ মৃত্যুবরণ করেন।

[২১]. আন্দ্রে ক্রিসঁ, *Le problème moral et les philosophes* (১৯৩৩), আরবি অনুবাদ *আল-মুশকিলাতুল আখলাকিয়্যা ওয়াল-ফালাসিফাহ* থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৩২।

[২২]. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ২, পৃ. ৮৭৯।

আমরা যেমন দেখছি, সভ্যতার অনেক সংজ্ঞা ও পরিচয় রয়েছে। অর্থাৎ, চিন্তাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য নেই। এটা যেমন এদিকে ইঙ্গিত করে যে, শব্দটি নতুন উদ্ভাবিত এবং এ কারণে প্রত্যেক চিন্তাবিদের কাছে তার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে তেমনই তা মানবচিন্তার প্রতিটি ঘরানার ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ ও আইডিয়োলজির প্রতি ইঙ্গিত করে। এসব সংজ্ঞা বিপরীতমুখী হোক বা সম্পূরক, সভ্যতা সম্পর্কিত আলোচনাকে জটিল করে তুলেছে। এ বিষয়ে যারা আলোচনা করতে চান তাদের প্রত্যেকের বিশেষ চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।

আমি মনে করি, সভ্যতা হলো স্রষ্টার সঙ্গে এবং বসবাসরত মানবমণ্ডলী ও ঐশ্বর্যপূর্ণ পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক নির্মাণে মানুষের শক্তি ও যোগ্যতা।

আমার মতে, যখনই এই সম্পর্কের উন্নতি ঘটে তখনই সভ্যতার অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। আর যখনই এ সম্পর্কের অবনতি ঘটে ও দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই মানুষ পিছিয়ে পড়ে, তার অধঃপতন ঘটে।

সুতরাং সভ্যতা হলো প্রথমত মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যকার ক্রিয়াকর্মের, দ্বিতীয়ত সমাজে বসবাসরত অন্য মানবমণ্ডলীর সঙ্গে তাদের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার আচার-আচরণের, তৃতীয়ত মানুষ ও পৃথিবীর পরিবেশের—যেখানে আছে পশুপাখি, মাছ, বৃক্ষরাজি, ভূমি, খনিজ সম্পদ, অন্যান্য ঐশ্বর্যসহ যাবতীয় সৃষ্টি—মধ্যকার সম্পর্কের ফলাফল।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী তিনটি সম্পর্ক দাঁড়াল। সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখর হলো মানুষের পক্ষে উল্লিখিত তিনটি পর্যায়ে সর্বোত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারা। আর অসভ্যতা ও অধঃপতনের চূড়ান্ত স্তর হলো একইসঙ্গে তিনটি সম্পর্কের অবনতি ঘটা। এ সম্পর্ক তিনটির উঁচু-নিচু বিভিন্ন স্তর রয়েছে, এসব সম্পর্কের স্বরূপ ও প্রকৃতির ভিন্নতার কারণে এক সমাজ থেকে অন্য সমাজের প্রেক্ষিতে সভ্যতার স্তর ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

এই সংজ্ঞা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, পৃথিবীতে অনেক সভ্য সমাজ রয়েছে, কিন্তু সভ্যতার একটি দিকের বিবেচনায় তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকলেও সভ্যতার অন্যান্য দিকের বিবেচনায় তারা অসভ্যতা ও পশ্চাৎপদতার চরমতম পর্যায়ে রয়েছে।

যে মানবগোষ্ঠী সুখসৌভাগ্য ও আরাম-আয়েশ নিশ্চিত করার জন্য বস্তুরাশিকে যথার্থরূপে কাজে লাগাতে পারে, হাতিয়ার ও উপকরণ তৈরি করে, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ক্রমশ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে এবং পরিবেশ-পৃথিবীর অন্যান্য উপাদানের কোনোরূপ ক্ষতি না করেই এ সকল বস্তু দ্বারা উপকৃত হতে পারে, তারা একটি সম্পর্কের বিবেচনায় সভ্য মানবগোষ্ঠী। এটিকে আমি উপর্যুক্ত সংজ্ঞায় তৃতীয় পর্যায়ের সম্পর্ক বলে উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ, মানুষ ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক। কিন্তু এই মানবগোষ্ঠীই স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে থাকতে পারে অথবা স্রষ্টার প্রতি মনোনিবেশ ও তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার বিষয়টিকে তারা অবজ্ঞা করতে পারে এবং একজন বান্দারূপে বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক নির্মাণে যে চাহিদা তা তারা পূরণ নাও করতে পারে। এ দিকটির বিবেচনায় এই মানবগোষ্ঠী অসভ্যতা ও অধঃপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

আবার এমন হতে পারে, কোনো মানুষ স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবা, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব ভালো আচরণ করে, তাদের সঙ্গে উত্তম চরিত্র ও উৎকৃষ্ট মূল্যবোধের পরিচয় দেয়। এ দিকটির বিবেচনায় সে সভ্য মানুষ। কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে তার কার্যকলাপ খুব খারাপ, পশুপাখি ও বৃক্ষরাজির প্রতি তার কোনো মনোযোগ নেই, সেগুলোকে কষ্ট দেয়, ধ্বংস করে এবং সীমালঙ্ঘন করে। এই দিকটির বিবেচনায় সে পশ্চাৎপদ ও অধঃপতিত।

এমনকি মানুষ কোনো পর্যায়ের এক দিকের বিবেচনায় সভ্য ও অন্যদিক বিবেচনায় অসভ্যও হতে পারে। যেমন সে নিজের আত্মীয়স্বজন, সমাজ ও গোত্রীয় লোকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। এ দিকটির বিবেচনায় সে সভ্য। কিন্তু ভিন্ন সমাজ ও গোত্রের লোকদের সঙ্গে তার আচরণ খুবই খারাপ, নিজের পরিবারের সঙ্গে যে ন্যায়সংগত আচরণ করে তাদের সঙ্গে তা করে না এবং নিজ গোত্রীয় লোকদের সঙ্গে যে মমতাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, ভিন্ন গোত্রীয় লোকদের সঙ্গে সে সম্পর্ক নেই। এই দিকটির বিবেচনায় সে অসভ্য। তার জুলুম অনুযায়ীই তার পশ্চাৎপদতা এবং তার দুষ্কৃতি অনুযায়ীই তার অসভ্যতা।

যে মানুষ উন্নত হাতিয়ার উদ্ভাবন করে তা আত্মরক্ষা, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ব্যবহার করে সে সভ্য; কিন্তু জুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়নে তা ব্যবহার করলে সে অসভ্য মানুষ।

উল্লিখিত তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে আমাদের চারপাশে বিরাজমান সমাজব্যবস্থার প্রতি আমাদের অনেক সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে পারি। যে-সকল রাষ্ট্রকে বর্তমানে সভ্য রাষ্ট্র বলা হয়ে থাকে, যেমন আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও এরকম অন্যান্য রাষ্ট্র, তারা পৃথিবী-পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিবেচনায় সভ্য। মানবাধিকার ও প্রাণী-অধিকারের কিছু বিষয় বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতেও তারা সভ্য। কিন্তু তারা তাদের সমাজের ভেতরে ও বাইরে কিছু চারিত্রিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে অসভ্য ও পশ্চাৎপদ। যে মানুষটি বিবাহিত জীবনের বলয়ের বাইরে যৌন-সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং অশ্লীলতার প্রসার, অবাধ যৌনতাচর্চা, নারী-পুরুষের নির্লজ্জ মেলামেশা, বংশকৌলিন্য বিনাশ করে সন্তান নষ্ট করাসহ সমাজে বিভিন্ন ফেতনা-ফ্যাসাদের জন্ম দেয় তার পক্ষে সভ্য হওয়া সম্ভব নয়। যে লোকটি মা-বাবাকে অবজ্ঞা-অবহেলা করে এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার পক্ষেও সভ্য হওয়া সম্ভব নয়। যে লোকটা মদ্যপান করে, সুদি লেনদেন করে, মাদক সেবন ও চালানের সঙ্গে যুক্ত, জুয়া খেলে, লাম্পট্য ও দুশ্চরিত্রতায় মত্ত সে কখনো সভ্য হতে পারে না। যে মানুষ দ্বৈত নীতি অবলম্বন করে, দুর্বল জনগোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়, গরিব মানুষের অর্থসম্পদ লুণ্ঠন করে, তারও পক্ষে কখনো সভ্য হওয়া সম্ভব নয়।

উপরন্তু উপর্যুক্ত জাতি-গোষ্ঠীগুলো মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে চরমতম পশ্চাৎপদ। স্রষ্টা আছেন বলে যাবতীয় সুস্পষ্ট প্রমাণ, তাঁর মুজিযা ও কুদরতের কারিশমা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী কিছুতেই সভ্য হতে পারে না। একইভাবে যারা মানুষপূজা, পাথরপূজা ও গরুপূজার বিষয়টিকে মেনে নিয়েছে তাদের পক্ষেও সভ্য হওয়া সম্ভব নয়। এ কথার অর্থ এই নয় যে, জীবনের অন্যান্য দিকের বিবেচনায় তাদের সভ্য হওয়ার বিষয়টি আমরা অস্বীকার করছি। তারা উপকারী ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছে, উপকারী হাতিয়ার ও যন্ত্র তৈরি করেছে, অন্য অবদানও আছে। কিন্তু এটা হলো বিবেচনাযোগ্য যেসব দিক আছে তার একটি দিকমাত্র।

উপর্যুক্ত মানদণ্ডসমূহের প্রেক্ষিতে কোনো ধরনের পক্ষপাত ছাড়াই আমি বলতে পারি যে, পৃথিবীর বুকে ইসলামি সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা যা তিনটি সম্পর্কের প্রতিটির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধন করেছে। এখানে স্রষ্টা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সত্যনিষ্ঠ ধারণা রয়েছে, কীভাবে তার যথাযথ আনুগত্য ও ইবাদত করা যায় সেটাও বোঝা আছে। এই সভ্যতাই আল্লাহ তাআলার ইবাদতের পরে চারিত্রিক গুণাবলির পরিপূর্ণতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। কাছের বা দূরের উম্মতের সকল সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ও আচার-আচরণে উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। যারা শত্রুপক্ষ ও বিরুদ্ধতাবাদী তাদের সঙ্গে উত্তম চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে। বরং ইসলামি সভ্যতাই যুদ্ধকালীন চরিত্রের বিবেচনাকে মানবিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে। অর্থাৎ, মুসলিমগণ অন্যদের সঙ্গে চরম বিরোধকালে, এমনকি যুদ্ধের সময়ও চারিত্রিক মানদণ্ডের প্রতি সম্মান বজায় রাখেন। মুসলিম হিসেবে যে সভ্য আচরণ তাদের পক্ষে সম্ভব সে আচরণই তারা করে থাকেন। ইসলামি সভ্যতাই বিড়ালকে বেঁধে রেখে মেরে ফেলার কারণে এক নারীর জাহান্নামি হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে[২৩] এবং এই সভ্যতাই পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে এক পুরুষের[২৪] বা (অন্য বর্ণনামতে) দুশ্চরিত্রা নারীর জান্নাতি হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে।[২৫] ইসলামি সভ্যতাই জীবনমুখী জ্ঞান–চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা,

---

[২৩]. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার কারণে এক নারীকে আযাব দেওয়া হয়েছে। সে বিড়ালটিকে খাবার দেয়নি, পানি দেয়নি, এমনকি জমিনের ঘাস খেয়ে বাঁচার জন্য ছেড়েও দেয়নি।' *বুখারি*, কিতাব : আল-মুসাকাত, বাব : ফাদলু সাকয়িল মা, হাদিস নং ২২৩৬; *মুসলিম*, কিতাব : আস-সালাম, বাব : তাহরিমু কাতলিল হিররাহ, হাদিস নং ২২৪২।

[২৪]. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'একজন লোক দেখল যে, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে কাদামাটি খাচ্ছে। সে তার মোজা খুলে তাতে পানি ভরে কুকুরটিকে পান করিয়ে তৃপ্ত করল। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।' *বুখারি*, কিতাব : আল-উযু, বাব : আল-মাউল লাযি ইয়ুগসালু বিহি শারুল ইনসান, হাদিস নং ১৭১; *মুসলিম*, কিতাব : আস-সালাম, বাব : ফাদলু সাকিল-বাহায়িমিল মুহতারামাহ ওয়া ইতআমুহা, হাদিস নং ২২৪৪।

[২৫]. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পিপাসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে একটি কুকুর একটি কূপের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বনি ইসরাইলের এক দুশ্চরিত্রা নারী তা দেখতে পেল। সে তার পাদুকা খুলে কূপ থেকে পানি তুলে কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।' *বুখারি*, কিতাব : আল-আম্বিয়া, বাব : তুমি কি মনে করো যে কাহফ ও গুহার অধিবাসীরা..., হাদিস নং ৩২৮০; *মুসলিম*, কিতাব : আস-সালাম, বাব : ফাদলু সাকিল বাহায়িমিল মুহতারামাহ ওয়া ইতআমুহা, হাদিস নং ২২৪৫।

রসায়নবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, ভূবিদ্যা ইত্যাকার অনেক জ্ঞানবিজ্ঞানে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে।

এই দৃশ্যপটে ইসলামি সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা যা প্রতিটি পর্যায়ে উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছেছে। অন্যান্য সভ্যতা কোনো-না-কোনো দিক বিবেচনায় ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। এ থেকেই আমরা আল্লাহর এই বাণীকে বুঝতে পারি,

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾

> তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব ঘটেছে।[২৬]

এটা ভিত্তিহীন অহেতুক বিষয় নয়। বরং আমরা ইসলামের সুদৃঢ় আদর্শের ফলে এই সভ্য উন্নত উৎকর্ষমণ্ডিত অবস্থায় পৌঁছেছি। এর দ্বারা কেবল মুসলিমরা নয়, অমুসলিমরাও সৌভাগ্যবান হয়েছে এবং সমস্ত বিশ্ববাসী উপকার লাভ করেছে। এ কারণে আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি।

আমরাই একমাত্র জাতি যাদের রয়েছে জীবনাচারের সঠিক ও শুদ্ধ মানদণ্ড। এই মানদণ্ডের দ্বারা আমরা যেকোনো ক্রিয়াকলাপ ভালো না মন্দ তা বিচার করতে পারি। অধিকাংশ মানুষ নামমাত্র উপাসনা করে, তাদের নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। ইবাদতের সঠিক মানদণ্ড ও পদ্ধতি রয়েছে কেবল মুসলিমদের কাছে। অধিকাংশ মানুষ নির্দিষ্ট চারিত্রিক নীতি দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখে, কিন্তু এই চারিত্রিক নীতি ও মানদণ্ড নির্ধারণে তাদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। একটি সমাজব্যবস্থায় যেটাকে ন্যায়সংগত মনে করা হয় অন্য সমাজব্যবস্থায় সেটাকে জুলুম ও অন্যায় ভাবা হয়। কেউ কেউ যেটাকে দয়া ও অনুগ্রহ মনে করে, অন্যরা সেটাকে নৃশংসতা মনে করে। সঠিক চারিত্রিক নীতি ও মানদণ্ড ইসলাম ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা ইসলামি শরিয়তকে বিশ্ববাসীর জীবনবিধান মনোনীত করেছেন।

যে মতাদর্শ আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর জন্য নাযিল করেছেন তার কারণে সভ্যতার বা অসভ্যতার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সমাজের ওপর কর্তৃত্ব

---

২৬. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১১০।

করার যোগ্যতা তাদের দেওয়া হয়েছে, এই বক্তব্যের জোরালো সমর্থন আমরা পাই আল্লাহর এই বাণী থেকে,

﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾

এবং তোমরা সাক্ষী হও মানবজাতির।[২৭]

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রোমানরা কোনো বিবেচনায় সভ্য হলেও অন্য বিবেচনায় সভ্য ছিল না। পারস্য বা ভারতীয় বা চৈনিক সমাজব্যবস্থার ব্যাপারে আমরা সাক্ষী রয়েছি। একইভাবে আধুনিক ইউরোপীয় ও আমেরিকান সমাজব্যবস্থার ব্যাপারেও আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। একইভাবে যেসব সমাজব্যবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত হবে সেগুলোর ব্যাপারে আমরা সাক্ষী থাকব। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যে-সকল সমাজব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারেও আমরা সাক্ষী। সেসব সমাজব্যবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি সত্য, তবে কুরআনুল কারিমে রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে সেগুলোর সংবাদ আমরা জেনেছি। রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ সংবাদ আমরা অবগত হয়েছি। হযরত আবু সাইদ খুদরি রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস থেকে আমরা এমনটাই বুঝে থাকি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُولُونَ لَا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ فَيَقُولُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ»

কিয়ামতের দিন নুহ আ. ও তার উম্মত উপস্থিত হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি আমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছ? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক। তারপর আল্লাহ তার উম্মতকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি তোমাদের কাছে

---

[২৭]. সুরা হজ : আয়াত ৭৮।

আমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছিলেন? তারা বলবে, না, আমাদের কাছে কোনো নবী আসেনি। তখন আল্লাহ নুহ আ.-কে বলবেন, তোমার পক্ষে কে সাক্ষী রয়েছে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মত। তখন আমরা সাক্ষ্য দেবো যে, তিনি আল্লাহ তাআলার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এ কথারই উল্লেখ করেছেন, 'এইভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হও।'[২৮], [২৯]

এই বইয়ে আমরা গড়পড়তা সাধারণ সভ্যতা নিয়ে—যার অনেক তুল্য ও সমকক্ষ রয়েছে—আলোচনা করব না, বরং আমরা 'নমুনা-সভ্যতা' সম্পর্কে আলোচনা করব, যার মানদণ্ডে নিজেদের যাচাই করা প্রত্যেক সমাজের উচিত।

এই বই পাঠে আমরা আবশ্যিকভাবে যা জানতে পারব, এগুলোতেই সভ্যতা সীমিত উদ্দেশ্য নয়, এটা অসম্ভবও। এখানে কিছু প্রবেশদ্বার উল্লেখ করব, কিছু দুয়ার উন্মুক্ত করব। যদ্দ্বারা কূলহীন ইসলামি সভ্যতার সাগরে প্রবেশ করতে পারি।

ইসলামি সভ্যতার ক্ষেত্রে এটা সম্ভবত সর্বজনবিদিত বিষয় যে, এই সভ্যতার উৎকর্ষ ও সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহর সঙ্গে গভীর ও দৃঢ় বন্ধন। এই দুটি উৎসই মুসলিম এবং তাদের প্রতিপালক, সমাজ ও পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্ক দৃঢ়ীকরণে সম্যক ভূমিকা রেখেছে। কুরআন ও সুন্নাহে আইনকানুন ও সূক্ষ্ম নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে, যা প্রতিটি ক্ষেত্র ও প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নত সভ্যতা নির্মাণের দায়িত্ব পালন করেছে। এমনকি বস্তুগত যাবতীয় বিষয়, বরং আনন্দ-বিলাসের বিষয়গুলোও কুরআন ও সুন্নাহর সংহত নীতি-আদর্শে আলোচিত হয়েছে। আরবদের ইসলামপূর্ব ইতিহাস কোনোভাবেই এদিকে ইঙ্গিত করেনি যে তারা একসময় পৃথিবীর নেতৃত্বে সমাসীন হবে এবং বিশ্বের সবচেয়ে নামিদামি সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করবে। ইসলাম ও তার আইনকানুন আত্মস্থ ও আঁকড়ে ধরা ছাড়া

---

২৮. সুরা বাকারা : আয়াত ১৪৩।

২৯. *বুখারি*, কিতাব : আম্বিয়া, হাদিস নং ৩১৬১।

আরবদের উন্নতি ও উৎকর্ষের কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। উমর ফারুক রা. এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, 'আমরা ছিলাম হীন জাতি, আল্লাহ তাআলা ইসলাম দ্বারা আমাদের সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ যা দ্বারা আমাদের সম্মানিত করেছেন তা ছাড়া অন্যকিছু দ্বারা যদি সম্মান চাই তবে আল্লাহ আমাদের অপদস্থ করবেন।'[৩০] যারা এই বই পড়বেন তাদের প্রত্যেকের মনে যে প্রশ্নের উদয় হবে, উমর ফারুক রা.-এর বক্তব্য থেকেই তার জবাব দিতে পারি। প্রশ্নটি এই, আমরা যদি উন্নতি ও উৎকর্ষের উচ্চতর শিখরে পৌঁছেই থাকি তবে বর্তমানে আমাদের অবস্থা করুণ কেন? কেন এই বিপর্যয়, দুর্দশা, জটিলতা, অধঃপতন ও পশ্চাৎপদতা?

এই প্রশ্নের জবাব খুবই সহজ ও স্পষ্ট, মুসলিমগণ তাদের শক্তি ও ক্ষমতার উপকরণ পরিত্যাগ করেছে, কুরআন ও সুন্নাহকে অবজ্ঞা করেছে। কুরআন-সুন্নাহর সংহত আইনকানুন ও অবিনশ্বর বিধানকে তারা অবহেলা করেছে। শুধু তাই নয়, মুসলিমগণ পশ্চিমাদের দ্বারা এমনভাবে প্রতারণার শিকার হয়েছে যে তারা পাশ্চাত্যসভ্যতায় তাদের উত্তরণ ও শক্তির উপকরণ খুঁজতে লেগে গেছে। তারা এটা বুঝতেও পারছে না যে, পশ্চিমা সভ্যতা কোনো প্রেক্ষিতের বিচারে উন্নতি লাভ করলেও অন্যান্য প্রেক্ষিতের বিবেচনায় অধঃপতিত ও পশ্চাৎপদ। কারণ চূড়ান্ত বিচারে সেটা মানবসৃষ্ট সভ্যতা এবং মানুষ সঠিক কিছু করে তো কিছু ভুল করে। একমাত্র ইসলামই সুসংহত ও সুগঠিত জীবনবিধান, এতে কোনো ভ্রান্তি নেই, কোনো ত্রুটি নেই।

আমাদের অবশ্যকর্তব্য আমাদের দ্বীন ও শরিয়তের প্রতি কার্যত আস্থা রাখা, যাতে আমরা ইসলাম নিয়ে গর্ববোধ ও সম্মানিত বোধ করতে পারি এবং অন্যান্য মানবসভ্যতার তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ববোধ করতে পারি। এসব কথা অহংকার ও আত্মম্ভরিতাবশত নয়, বরং আমাদের যে বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে এবং চারপাশের মানবমণ্ডলীর প্রতি যে অনুগ্রহ ও ভালোবাসা রয়েছে তার কারণেই। মানুষ অনেক সময়ই নিজের অজ্ঞাতসারেই, অবচেতন মনেই বহুবিধ জটিলতা ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। তখন মুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ব্যতীত অন্যকোথাও মুক্তি মেলে না। গুস্তাভ

---

৩০. মুসতাদরাকে হাকেম, খ. ১, পৃ. ১৩০।

লি বোঁর কথায় উপর্যুক্ত বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি ইসলামি সভ্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন এবং বলেছেন, আরব মুসলিমদের সভ্যতা ইউরোপীয় জংলি জাতিগুলোকে মনুষ্যত্বের জগতে টেনে নিয়ে গিয়েছে। পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরবদের লিখিত গ্রন্থরাশি ছাড়া জ্ঞানের কোনো উৎসের খবর জানে না। আরব মুসলিমরা ইউরোপকে বস্তুগত, জ্ঞানগত ও চরিত্রগত দিক দিয়ে সভ্য করে তুলেছে। ইতিহাসে এমন কোনো জাতির কথা নেই যারা সভ্যতায় মুসলিমদের সমান অবদান রাখতে পেরেছে।[৩১]

উপর্যুক্ত সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক আলোচনা এবং এই বই সম্পর্কে গভীর আলোকপাতের পর যে প্রশ্নটি আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় তা এই, এই বই পাঠের পর আমাদের কী করা উচিত? আমাদের পূর্বসূরি মনীষীবৃন্দ সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে যে শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন তা জানার পর আমাদের কর্তব্য কী?

এটি গুরুত্বপূর্ণ, বরং চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং সম্ভবত এই প্রশ্নের জবাব খোঁজাই আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যে অবস্থা ও স্তর নির্ধারণ করেছেন সেখানে ফিরে আসার প্রথম পথ।

হ্যাঁ, এই প্রশ্নের জবাব আমি বইয়ের শেষে দেবো, ইসলামি ইতিহাসের শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে প্রমোদভ্রমণের পর আপনারা তা জানতে পারবেন।

আসুন, এবার বইটি পড়া যাক!

আল্লাহ তাআলাই সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

—ড. রাগিব সারজানি

---

৩১. গুস্তাভ লি বোঁ : *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ২৭৬।

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর তুলনায় ইসলামি সভ্যতা

ইসলামি সভ্যতা বিশ্বকে অজ্ঞতা ও পশ্চাৎপদতা এবং মূল্যবোধ ও চারিত্রিক অধঃপতন থেকে উদ্ধার করেছে যা ইসলামপূর্ব বিশ্বকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিল। ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি ও স্তম্ভ রচিত হয়েছে আল্লাহর কুরআন ও রাসুলের সুন্নাহ থেকে, তারপর তা বিশ্বভূমির বর্ণ-ধর্ম-লিঙ্গ-নির্বিশেষে সকল জাতির জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। গোটা বিশ্বে নেতৃত্বের আসন দখল করার জন্য ইসলামি সভ্যতার এমন সব অসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোনো সভ্যতার নেই। ইসলামি সভ্যতাই মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদগুলোতে আমরা এ বিষয়েই আলোচনা করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামের বিকাশলগ্নে বিশ্বসভ্যতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামি সভ্যতার উৎস ও স্তম্ভ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামি সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ
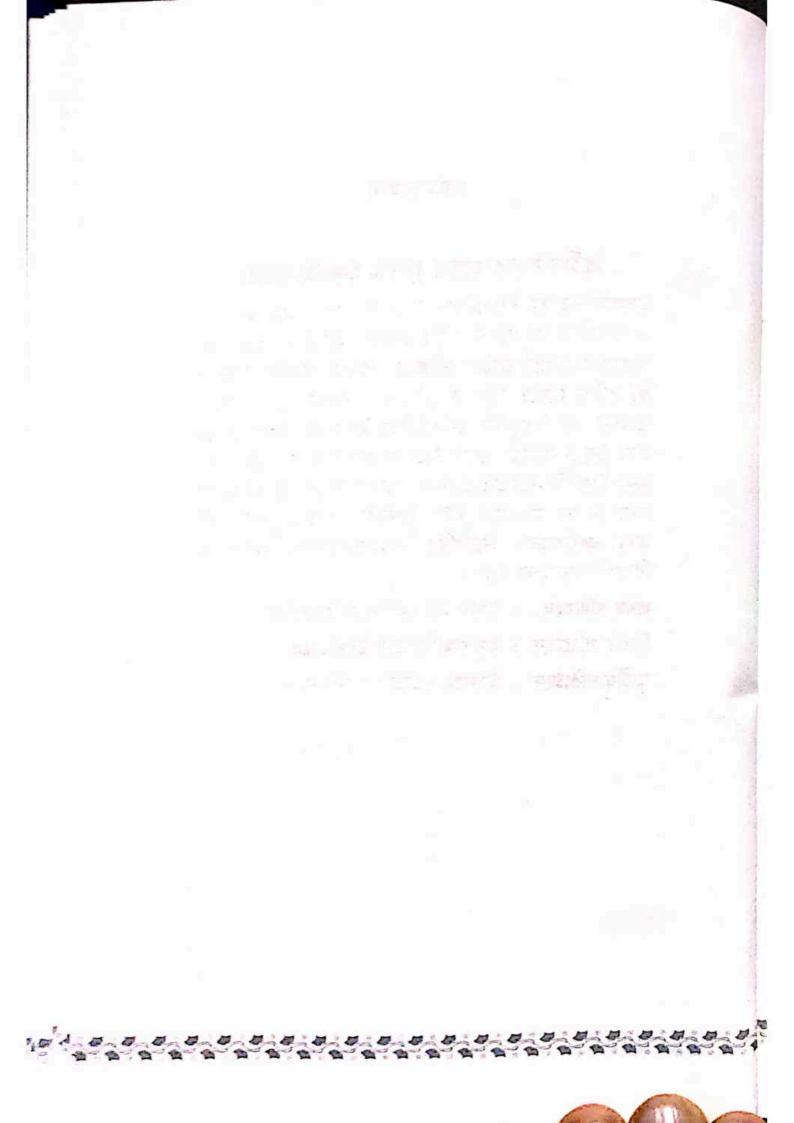
প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের বিকাশলগ্নে বিশ্বসভ্যতা

ইসলামপূর্ব বিশ্ব অনেকগুলো সভ্যতা যাপন করেছে। এসব সভ্যতা মানবজাতির বিকাশ ও উৎকর্ষে একটা পর্যায়ে অবদান রেখেছে, কিন্তু তার সবগুলোই প্রবৃত্তি ও ভোগের পেছনে ছুটেছে, ফলে তাদের শোচনীয় পতন ঘটেছে। এরপর আরও উন্নত মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, যা ওই সকল সভ্যতার যা-কিছু ভালো তার উত্তরাধিকার লাভ করেছে। এই সভ্যতার রয়েছে বিশেষ স্বাদ, রং ও ঘ্রাণ, যার আরামদায়ক ছায়ায় সবাই স্বস্তি ও সৌভাগ্যের সঙ্গে বসবাস করেছে। হ্যাঁ, তা হলো ইসলামি সভ্যতা।

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা সভ্যতাসমূহের প্রকৃতি বিচার করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : গ্রিক সভ্যতা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ভারতীয় সভ্যতা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : পারস্যসভ্যতা

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : রোমান সভ্যতা

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ইসলামপূর্ব আরব

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : একনজরে ইসলামপূর্ব বিশ্ব

প্রথম অনুচ্ছেদ

গ্রিক সভ্যতা

গ্রিক সভ্যতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন বিশ্বসভ্যতা বিবেচনা করা হয়। দর্শন, জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পে গ্রিস উৎকর্ষ সাধন করেছিল। সেখানে জন্ম নিয়েছিলেন অনেক বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও সাহিত্যিক, যারা ছিলেন বিশ্বচিন্তার স্তম্ভ। যেমন সক্রেটিস[৩২], প্লেটো[৩৩], অ্যারিস্টটল[৩৪]।

---

৩২. ভাববাদী দার্শনিক সক্রেটিস (Socrates 469-399 BC) গ্রিসের অন্যতম প্রধান অ্যাপোলিক গোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা সাফ্রোনিস্কস ছিলেন একজন ভাস্কর এবং মা ফেনারিটি ছিলেন ধাত্রী। সক্রেটিসের চেহারা ছিল কিম্ভূত; বেঁটে ও মোটা ছিলেন, নাক ছিল ছড়ানো ও চ্যাপটা, চোখ দুটি ছিল কোটরের বাইরে। তার স্ত্রী জানথিপি ছিলেন খুব বদমেজাজি। সক্রেটিস জীবন রক্ষার জন্য জরুরি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সম্পদ চাইতেন না। তার ছিল বিস্ময়কর রকম কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা। খুব সাদামাটা পোশাক পরতেন। এমনকি জুতো পর্যন্ত পায়ে দিতেন না। বলতেন, পোশাক হলো বাইরের আবরণ, মানুষের আসল সৌন্দর্য হচ্ছে তার জ্ঞান। দেশের তরুণদের বিপথগামী করা হচ্ছে এই অজুহাতে শাসকেরা সক্রেটিসকে বন্দি করে এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়। শিষ্যেরা প্রহরীদের ঘুষ দিয়ে সহজেই তার পালানোর ব্যবস্থা করে। কিন্তু তিনি পালাননি, ক্ষমাও চাননি। দণ্ডাদেশ অনুযায়ী হেমলক বিষ পান করে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বলেছেন, সবাই মনে করে যে তারা সবকিছু জানে এবং কোনো সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তার সমাধানও করে ফেলে। কিন্তু আসলে তাদের দেওয়া সমাধানে অনেক ভুল, অনেক অপূর্ণতা থেকে যায়। তাদের সঙ্গে নিজের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, তারা জানে না যে তারা জানে না আর আমি জানি যে আমি কিছু জানি না।-অনুবাদক

৩৩. ৪২৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম এরিস্টক্লস। প্লেটো শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশাল কাঁধ। বিশাল কাঁধের অধিকারী ছিলেন বলে তাকে প্লেটো বলে ডাকা হতো। তার গুরু হলেন সক্রেটিস এবং তার শিষ্য হলেন অ্যারিস্টটল। প্লেটোর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *রিপাবলিক*, *অ্যাপোলজি*, *ক্রিটো*, *ফিদো*, *পার্মিনাইদিস*, *থিটিটাস* ও *সিম্পোজিয়াম*। ৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সক্রেটিসকে দর্শনশাস্ত্রের জনক এবং প্লেটোকে তার পূর্ণতাদানকারী বলা হয়।-অনুবাদক

৩৪. অ্যারিস্টটল (AristotleBC-322 BC) সর্বকালের অন্যতম প্রধান দার্শনিক হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। জন্ম মেসিডোনিয়ার স্টাগিরা নামক স্থানে। পিতা চিকিৎসক। ১৭ বছর বয়সে প্লেটোর একাডেমিতে যোগ দেন। বিশ্বজয়ী বীর আলেকজান্ডারের শিক্ষক হিসেবে মেসিডোনিয়ায় যান। মতবিরোধ দেখা দিলে আবার এথেন্সে ফিরে আসেন। জীবন ও জগতের এমন কোনো দিক ছিল না যেদিকে তিনি গবেষকের দৃষ্টিতে তাকাননি। এজন্য তাকে জ্ঞানের সমুদ্র বলা হতো। বিজ্ঞান ও দর্শনে তার চিন্তা দেড় হাজারেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বের জ্ঞানপিপাসুদের প্রভাবিত করেছে। তিনি মনে করতেন, মাটি, বায়ু, আগুন ও পানি-এই চারটি

তারা ছাড়াও অনেক মনীষী ছিলেন। তারা কতিপয় সত্য উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব পালন এবং তাদের সমাজজীবনে কিছু মূল্যবোধের বীজ রোপণ করেছিলেন। এগুলো ছিল তাদের যৌক্তিক চিন্তারাশি, বাহ্যিক কার্যকারণ ও তাদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনার ফল।

গ্রিক সভ্যতা দর্শন ও চিন্তার ক্ষেত্রে যে উৎকর্ষ সাধন করেছিল এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানের যে পরিপক্বতা অর্জন করেছিল, তাদের পূর্বে আর কোনো জাতি এ অভিজ্ঞতা লাভ করেনি। কিন্তু এই সভ্যতা ক্রমাগত অধঃপতনের দিকে এগিয়েছে। গ্রিক মনীষীরা যে ঐতিহ্য রেখে গিয়েছিলেন তা পরখ করে দেখলে আমাদের সামনে গ্রিক সভ্যতার পতনের কারণগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নোবল সিটি বা অভিজাত নগরী-সম্পর্কিত প্লেটোর ধারণা আমরা আলোচনা করতে পারি। তিনি মনে করতেন যে, অভিজাত নগরী তিন শ্রেণির মানুষ দ্বারা গড়ে উঠবে। প্রথম শ্রেণিতে থাকবে দার্শনিক ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ। দ্বিতীয় শ্রেণিতে থাকবে সেনাসদস্যরা এবং তৃতীয় শ্রেণিতে থাকবে শ্রমিক ও কৃষকেরা। অভিজাত নগরীতে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন কেবল দার্শনিকেরা, তাতে সেনাশ্রেণি বা শ্রমিকশ্রেণির কোনো অধিকার থাকবে না। প্লেটো সেনাশ্রেণির জন্য চরম শৃঙ্খলা বিধিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি সৈনিকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করেছিলেন। সৈনিকদের মালিকানার অধিকার ছিল না, পরিবার গঠন করার অধিকারও ছিল না। তাদের স্ত্রীও ছিল না, সন্তানও ছিল না। সৈনিকদের জন্য নির্ধারিত নারীরা হতো যৌথ বা এজমালি সম্পত্তি। এ সকল নারীর সন্তানদের পিতৃপরিচয় ছিল না, তারা হতো রাষ্ট্রের সন্তান। অভিজাত নগরীতে তৃতীয় শ্রেণি অর্থাৎ মজদুর ও কৃষকদের দায়িত্ব ছিল শাসকশ্রেণি ও সেনাশ্রেণির সেবা ও খেদমত নিশ্চিত করার জন্য শ্রম ব্যয় করা। এই শ্রেণির কোনো মানবিক অধিকারই ছিল না। প্লেটোর নগরীতে অসুস্থের কোনো ঠাঁই ছিল না। রাষ্ট্র তাদেরকে দূরে ছুড়ে দিত। এই হলো প্লেটোর অভিজাত নগরীর চিত্র।[৩৫]

মূল পদার্থে এই পৃথিবী বিভক্ত। অ্যারিস্টটলের সব চিন্তা সঠিক ছিল না। তবু তিনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এ কারণে যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৌলিক বিষয়ে তিনিই প্রথমে চিন্তার সূত্রপাত করেন।-অনুবাদক

৩৫. আহমাদ শালবি, *মাউসুআতুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, ১ম খ., পৃ. ৫৪।

প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ দাস হয়ে ওঠে এবং দাসত্ব দাস-মানবদের জন্য একটি বৈধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা, এ ব্যাপারে মহাদার্শনিক অ্যারিস্টটল আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন এবং ইতিবাচক মত ব্যক্ত করেছেন। তার এই মত ছিল অপরিহার্য, ফলে সমাজে দুই শ্রেণির মানবের উদ্ভব ঘটেছিল—শাসক ও শাসিত। উঁচু শ্রেণির সদস্যদের দ্বারা নিচু শ্রেণির সদস্যদের শাসিত হওয়া ছিল অবধারিত। অ্যারিস্টটলের মতে, প্রকৃতি দাস-মানবদের দিয়েছে শক্তিশালী দেহ, পক্ষান্তরে স্বাধীন মানবদের দিয়েছে অসাধারণ বুদ্ধি ও পরিপক্ব চিন্তা। ফলে স্বাধীন মানব ক্ষমতাচর্চার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠেছে, এই মূলনীতির ভিত্তিতে যে, চিন্তা দেহকে পরিচালিত করে। অ্যারিস্টটলের অবস্থান ছিল প্রাকৃতিক অধিকারে সমতানীতির বিরুদ্ধে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃতি এক শ্রেণির মানবকে বুদ্ধি ও চিন্তা দ্বারা (অন্যদের থেকে) বিশিষ্ট করেছে। আর অন্যদেরকে দেহের অঙ্গগুলো ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়েছে। এইভাবে প্রকৃতি মানবমণ্ডলীর স্বাধীন সদস্যদের দেহকে দাস সদস্যদের দেহ থেকে ভিন্নভাবে গড়ে তুলেছে। দাস শ্রেণির সদস্যরা শ্রমসাধ্য কঠিন কর্মগুলো সম্পন্ন করার জন্য আবশ্যক শক্তি পেয়েছে, পক্ষান্তরে স্বাধীন সদস্যদের শরীর প্রকৃতিগতভাবেই ওইসব কঠিন কাজের জন্য উপযুক্ত নয়, কারণ তাদের সুঠাম শিরদাঁড়া ওইসব শ্রমসাধ্য কাজ সম্পন্ন করার পক্ষে অনুপযুক্ত। বস্তুত প্রকৃতি মানবমণ্ডলীর স্বাধীন সদস্যদের প্রস্তুত করেছে কেবল নাগরিক বা শহুরে জীবনের দায়িত্ব পালনের জন্য।[৩৬]

গ্রিক চিন্তাধারা এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল। সবাই এই চিন্তাধারার মূল্যায়ন করেছে এবং একে একপ্রকার প্রজ্ঞা বলে আখ্যায়িত করেছে। উইল ডুরান্ট এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, উত্তম চরিত্রের ক্ষেত্রে গ্রিকরা দৃষ্টান্ত হতে পারে না। তিনি এর কারণ দেখিয়েছেন এই যে, তাদের চিন্তা ও বুদ্ধির বিকাশ তাদের অধিকাংশকে চরিত্রের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তাদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ ছিল, চরিত্র বলতে কোনো বিষয় তাদের মধ্যে ছিল না। নিজেদের সন্তান ছাড়া আর কাউকে তারা প্রাধান্য দিত না। হৃদয়ের আবেগ ও যাতনা তারা কমই বুঝতে

---

৩৬. গানিম মুহাম্মাদ সালেহ, *আল-ফিকরুস সিয়াসিয়্যিল কাদিমু ওয়াল-ওয়াসিত*, পৃ. ১০৯-১১০।

পারত। তারা নিজেদের যতটা ভালোবেসেছে, প্রতিবেশীদের ততটা ভালোবাসার কথা চিন্তাই করতে পারত না।[৩৭]

গ্রিক সভ্যতার ক্রমান্বয় অধঃপতনের ক্ষেত্রে আরও কিছু বিষয় যোগ করে নিন, তারা কামচরিতার্থে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল এবং কেবল ইন্দ্রিয়সুখের পেছনে ছুটছিল। এটাই তাদের সভ্যতার অধঃপতন ত্বরান্বিত করেছিল। কারণ, জৈবিক সম্পর্কের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল এবং তা সৎ মানুষের জীবন ধ্বংস করে দিয়েছিল। এমনকি দার্শনিকরা খাদ্যের উৎসগুলোতে অধিবাসীদের চাপ কমানোর অজুহাত দেখিয়ে শিশুহত্যা বৈধ করেছিল। এর ফলে নগর ও দেশ বিরান হয়ে পড়েছিল।

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, নৈতিকতার শৃঙ্খল ছিন্নকরণ এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মম্ভরিতার আস্ফালন গ্রিক সভ্যতার পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। মেনানদার[৩৮] তার নাটকগুলোতে এথেন্সের জীবনকে চিত্রায়িত করেছেন, এথেন্সের জীবন ছিল চরিত্রহীনতা, ভ্রষ্টতা ও জৈবিক যথেচ্ছাচারে ভরপুর। তাই পতন ছিল স্বাভাবিক পরিণাম।[৩৯]

---

৩৭. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ৭, পৃ. ৯৩ ও তার পরবর্তী (কিছুটা পরিমার্জিত)।

৩৮. মেনানদার (Menander 342/41-290 BC) : গ্রিক নাট্যকার, তিনি ১০৮টি কমেডি নাটক রচনা করেন।

৩৯. শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ওয়া মুজাযুন আনিল হাদারাতিস সাবিকা*, পৃ. ৮৬।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ভারতীয় সভ্যতা

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটে। মানবজাতির অভিযাত্রায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তৃত অবদান রয়েছে। অধিকাংশের মতে তারা গাণিতিক সংখ্যা (০-৯) আবিষ্কার করেছিল। ত্রিকোণমিতিতেও তাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। দেড়, আড়াই, সাড়ে তিন (বিজোড় সংখ্যার অর্ধেক) ইত্যাদি সংখ্যাও প্রথম তারাই ব্যবহার করেছিল। জ্যামিতির ত্রিকোণমিতির[৪০] ক্ষেত্রে সাইন (sine) -এর সারণিও তাদের আবিষ্কার। একইভাবে ভারতীয় সভ্যতা চিকিৎসাবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় অবদান রেখেছে।[৪১]

ভারতীয় সভ্যতা উন্নতি ও উৎকর্ষের শিখরে পৌছা সত্ত্বেও খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবনতি ও অধঃপতনের পথে দ্রুত নেমে যেতে থাকে। এর কিছু কারণ ও হেতু ছিল।

সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি[৪২] রহ. খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় সভ্যতা কীরূপ ছিল তা আলোচনা করতে গিয়ে উল্লিখিত চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি বলেছেন,

---

৪০. ত্রিকোণমিতি : সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণ ও বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্যের অনুপাত, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের একটির বিপরীত দিকের বাহুর দৈর্ঘ্যের অনুপাত।-অনুবাদক

৪১. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ৩, পৃ. ২৩৮।

৪২. আবুল হাসান আলি ইবনে আবদুল হাই ইবনে ফখরুদ্দিন আল-হাসানি জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, সংগ্রামী সাধক, বিশিষ্ট আরবি সাহিত্যিক। সমকালীন বিশ্বের অন্যতম প্রধান ইসলামি চিন্তাবিদ আবুল হাসান আলি নদবি (জন্ম ৫ ডিসেম্বর ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ এবং মৃত্যু ৩১ ডিসেম্বর ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ) ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলিতে জন্মগ্রহণ করেন। উর্দুভাষী হওয়া সত্ত্বেও তার রচনাবলির প্রায় সবই আরবি ভাষায়। লখনৌ নদওয়াতুল উলামার মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বপালনের পাশাপাশি ইউরোপ, আমেরিকা, ও মধ্যপ্রাচ্যের অসংখ্য শিক্ষা, সাহিত্য ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। দুইশতাধিক গ্রন্থপ্রণেতা

اتفقت كلمة المؤلفين في تاريخ الهند على أن أحط أدوارها ديانة وخلقًا واجتماعًا، ذلك العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس الميلادي.

ভারতবর্ষের ইতিহাস যারা রচনা করেছেন তারা এ বিষয়ে একমত যে, খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোড়া থেকে যে সময়কালের সূচনা হয়েছে সেটাই ছিল ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সবচেয়ে অধঃপতিত যুগ।

আবুল হাসান আলি নদবি বিশ্বাসগত অরাজকতার চিত্র তুলে ধরার পর বলেছেন, ভারতে বর্ণবৈষম্যের নীতি পাশবিকভাবে চর্চিত হয়েছিল। পৃথিবীর কোনো মানবগোষ্ঠীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের চেয়ে চরম বর্ণবিদ্বেষ, বর্ণে বর্ণে বিপুল পার্থক্য এবং মানবমর্যাদার ভয়ানক ভূলুণ্ঠন সম্পর্কে জানা যায়নি।

খ্রিষ্টপূর্ব তিন শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম-সভ্যতার সূচনা ঘটে। এতে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার জন্য নতুন নির্দেশনা প্রস্তুত করা হয়। এই নির্দেশনায় নাগরিক ও রাজনৈতিক আইন লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এ ব্যাপারে গোটা দেশ একমত হয়। ভারতীয়দের জীবনে এটিই হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রীয় আইন ও ধর্মীয় সূত্রসম্ভার। এটি বর্তমানে মনুশাস্ত্র (মনুসংহিতা) নামে পরিচিত। এই আইন দেশের অধিবাসীদের চার শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে। সেগুলো হলো :

১. ব্রাহ্মণ : গণক ও ধর্মীয় পুরোহিত শ্রেণি।
২. ক্ষত্রিয় : সৈনিক বা যোদ্ধা শ্রেণি।
৩. বৈশ্য : কৃষক ও বণিক শ্রেণি।
৪. শূদ্র : সেবক ও দাস শ্রেণি।

আল্লামা নদবির ৩ খণ্ডে প্রকাশিত আত্মজীবনী 'কারওয়ানে যিন্দেগি' এখন গোটা মুসলিমবিশ্বে সমাদৃত। গোটা মুসলিমবিশ্বের পাশাপাশি প্রায় গোটা পৃথিবীই তিনি ভ্রমণ করেছেন। একাধারে আধ্যাত্মিক নেতা, উচ্চ পর্যায়ের চিন্তাবিদ, লেখক, সাহিত্যিক ও আন্তর্জাতিক মানের সংগঠক হিসাবে তিনি তার সমকালীন বিশ্বের অভূতপূর্ব স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করেন। ১৯৮৪ ও ১৯৯৪ সালে দুবার তিনি বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি ছিলেন শহিদে বালাকোট হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহিদ রহ.-এর অধস্তন ৫ম পুরুষ। উত্তর ভারতে শহিদ বেরেলবির পারিবারিক গোরস্থানেই আল্লামা নদবিও শায়িত আছেন।-অনুবাদক

মনুসংহিতা ব্রাহ্মণ শ্রেণির জন্য এমনসব মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে যা তাদেরকে দেবতাসনে আসীন করেছে। মনু বলেছেন, ব্রাহ্মণরা হলো ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তারাই সৃষ্টিজগতের দেবতা। পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব তাদের অধীন। তারা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু। তারা তাদের দাস শূদ্রশ্রেণির সম্পদ থেকে যা খুশি নিতে পারবে। কারণ, দাস কোনোকিছুর মালিক হতে পারে না, তার সমস্ত সম্পত্তিই তার প্রভুর সম্পত্তি।

মনুসংহিতার আইনের ফলে ভারতীয় সমাজে শূদ্রশ্রেণি ছিল পশুর চেয়েও পতিত, কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট। কুকুর, বিড়াল, ব্যাঙ, গিরগিটি, কাক ও পেঁচা হত্যার যে জরিমানা ছিল, শূদ্রশ্রেণির লোকদের হত্যার জরিমানাও ছিল একই।[৪৩]

ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থান[৪৪] ক্রীতদাসীর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। জুয়াখেলায় পুরুষেরা নিজের স্ত্রীকে বাজি রাখত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক নারীর একাধিক স্বামী হতো। আবার কারও স্বামী মারা গেলে সে চিরতরে বিধবা হয়ে যেত, কখনো দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারত না। তার জীবন হয়ে উঠত লাঞ্ছনা-যন্ত্রণার লক্ষ্যস্থল। সে মৃত স্বামীর বাড়িতে দাসী হিসেবে থাকত এবং স্বামীর ভাইবোনদের সেবা করে জীবন কাটাত। কখনো পার্থিব জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে পুড়িয়ে ফেলে আত্মাহুতি দিত।[৪৫]

ইসলামের পূর্বে এমনই ছিল ভারতীয় সভ্যতা। এমন লজ্জাজনক অজ্ঞতা, নিকৃষ্ট পৌত্তলিকতা এবং সামাজিক অন্যায়-অবিচারের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোনো জাতির মধ্যে ছিল না। ইতিহাসেও এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। আল-বিরুনি[৪৬] তার গ্রন্থে এসব বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং এগুলোর

---

৪৩. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ৩, পৃ. ১৬৪-১৬৮।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭-১৮৩।

৪৫. আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৬৮-৭৬।

৪৬. আবু রাইহান আল-বিরুনি বা আবু রাইহান মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-বিরুনি আল-খাওয়ারিজমি (২৬২-৪৪০ হি./৯৭৩-১০৪৭ খ্রি.) ছিলেন মধ্যযুগের বিশ্বখ্যাত আরবীয় শিক্ষাবিদ ও গবেষক। তিনি অত্যন্ত মৌলিক ও গভীর চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। খাওয়ারিজমের বাইরে বসবাস করতেন বলে সাধারণভাবে তিনি আল-বিরুনি (প্রবাসী) নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন গণিতবিদ, জ্যোতিষ্পদার্থবিদ, রসায়ন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পারদর্শী। অধিকন্তু ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক, পঞ্জিকাবিদ, দার্শনিক এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ ও

সমালোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তার গ্রন্থটি হলো, تَحْقِيق ما لِلْهِنْد مِنْ مَقُوْلَة مَقْبُوْلَة فِي العَقْل أو مَرْذُوْلَة। অধিক জানতে আগ্রহী হলে এই গ্রন্থটি পড়ুন।

ধর্মতত্ত্বের নিরপেক্ষ বিশ্লেষক। স্বাধীন চিন্তা, মুক্তবুদ্ধি, সাহসিকতা, নির্ভীক সমালোচনা ও সঠিক মতামতের জন্য যুগশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্ধ ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধকে আল-বিরুনির কাল বলে উল্লেখ করা হয়। তিনিই প্রথম প্রাচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞান, বিশেষ করে ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অধ্যাপক মাপার মতে, আল-বিরুনি শুধু মুসলিমবিশ্বেরই নন, বরং তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিদের একজন। তিনি একটি অতি সাধারণ ইরানি পারিবারে ৪ সেপ্টেম্বর ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম ২৫ বছর তিনি নিজের জন্মভূমিতে অতিবাহিত করেন। অধ্যয়নকালেই তিনি তার কিছু প্রাথমিক রচনা প্রকাশ করেন এবং প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ইবনে সিনার সঙ্গে পত্রবিনিময় করেন। আল-বিরুনির মাতৃভাষা ছিল খাওয়ারিজমের আঞ্চলিক ইরানি ভাষা। কিন্তু তিনি তার রচনাবলি আরবিতে লিখে গেছেন। আরবি ভাষায় তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি আরবিতে কিছু কবিতাও রচনা করেন। অবশ্য শেষের দিকে কিছু গ্রন্থ ফারসিতে অথবা আরবি ও ফারসি উভয় ভাষাতেই রচনা করেন। তিনি গ্রিক ভাষাও জানতেন। হিব্রু ও সিরীয় ভাষাতেও তার জ্ঞান ছিল। তিনি ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শাহ আবুল হাসান আলি ইবনে মামুন কর্তৃক বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন। তিনি আলি ইবনে মামুনের পর তার ভাইয়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং অনেক রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়াও রাজকীয় দৌত্যকার্যের দায়িত্বেও নিয়োজিত থাকেন। মামুন তার সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ১০১৬-১৭ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হওয়ার পর সুলতান মাহমুদ খাওয়ারিজম দখল করে নেন। গণিতবিদ আবু নাসের মানসুর ইবনে আলি ও চিকিৎসক আবুল খাইর আল-হুসাইন ইবনে বাবা আল-খাম্মার আল-বাগদাদির সঙ্গে গজনি চলে যান। এখানেই তার জ্ঞানচর্চার স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। তখন থেকে তিনি গজনির শাহি দরবারে সম্ভবত রাজ-জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি কয়েকবার সুলতান মাহমুদের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতে এসেছিলেন। গজনির সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ভারতে প্রায় ১২ বছর অবস্থান করেন। এখানে সংস্কৃত ভাষা শেখেন এবং হিন্দুধর্ম, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, দেশাচার, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ভারতীয় কিছু আঞ্চলিক ভাষাতেও জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তিনি এই এক যুগের অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা রচনা করেন তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ *কিতাবু তারিখিল হিন্দ*। আল-বিরুনি ৬৩ বছর বয়সে গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন। তারপরও তিনি ১২ বছর বেঁচেছিলেন। ১৩ ডিসেম্বর ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান। আল-বিরুনির সর্বমোট ১১৩টি গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে ১০৩টি গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ১০টি গ্রন্থ অসম্পূর্ণ বলে উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রতীয়মান হয়, তার রচিত গ্রন্থের সর্বমোট সংখ্যা ১৮০টি।-অনুবাদক

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

পারস্যসভ্যতা

পারসিকরা বিপুল বিস্তৃত সাম্রাজ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। সভ্য বিশ্বের কর্তৃত্বে ও নেতৃত্বে তারা ছিল রোমানদের সমান। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে সাসানীয় শাসনামলে (Sassanid dynasty) পারস্যসভ্যতার বিকাশ ঘটে। রাজনীতি, প্রশাসন, যুদ্ধজয়, বিলাসব্যসন ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যে তারা উৎকর্ষ সাধন করে। তাদের একটি জাতিগত ধর্ম ছিল, তা হলো জরথুস্ত্রের ধর্ম। সাহিত্যরসমণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি ভাষাও তাদের ছিল, তা হলো পাহলভি ভাষা।[৪৭]

আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ছিল এরূপ, প্রাচীন যুগে তারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করত এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা দিত। এরপর তারা পূর্বসূরিদের মতো সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে মর্যাদা দিতে শুরু করে। এরপর সমাজসংস্কারকরূপে জরথুস্ত্রের (খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৬৬০-৫৮৩) আবির্ভাব ঘটে। তিনি দেশবাসীর ধর্মীয় চেতনা ও আদর্শের সংস্কার-চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। তিনি বলেন, বিশ্বজগতের যা-কিছু আলোকিত ও উদ্ভাসিত তার সবকিছুতে আল্লাহর নুর বিচ্ছুরিত হয়। তিনি নামায বা উপাসনার সময় সূর্য ও আগুনের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হতে নির্দেশ দেন (কারণ এতে আল্লাহরই উপাসনা করা হবে) এবং চারটি উপাদানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে নিষেধ করেন। উপাদান চারটি এই : আগুন, বায়ু, মাটি ও পানি। জরথুস্ত্রের মৃত্যুর পর যে-সকল মনীষীর আবির্ভাব ঘটে তারা জরথুস্ত্রপন্থীদের জন্য বিভিন্ন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করে। তারা তাদের জন্য এমনসব বিষয়ে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যেগুলোর জন্য আগুন অনিবার্য। (কারণ, এতে আগুনের অমর্যাদা হতে পারে।) ফলে তাদের কর্মকাণ্ড কৃষিকাজ ও ব্যবসায়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আগুনকে এভাবে মর্যাদা দান ও উপাসনার সময় তাকে কেবলা হিসেবে

---

৪৭. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ৬৭।

গ্রহণের কারণে মানুষ ধীরে ধীরে আগুনেরই উপাসনা করতে শুরু করে। অবশেষে তারা আগুনকে উপাস্য বানিয়ে নেয় এবং আগুনের জন্য তারা বেদি ও উপাসনালয় নির্মাণ করে। আগুনের উপাসনা বাদে সমস্ত আকিদা ও ধর্মীয় সংস্কারের বিলুপ্তি ঘটে।[৪৮]

আগুন যখন তার উপাসনাকারীদের কাছে শরিয়ত পাঠাল না, রাসুল প্রেরণ করল না, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করল না, অপরাধী ও পাপাচারীদের শাস্তি দিলো না তখন অগ্নি-উপাসকদের কাছে ধর্ম হয়ে দাঁড়াল কেবল কতিপয় আচার ও প্রথা যা তারা নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত জায়গায় চর্চা করত। উপাসনালয়ের বাইরে ঘর-বাড়িতে, প্রশাসন ও বিচারালয়ে, দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে, রাজনীতি ও সমাজে তারা ছিল স্বাধীন। তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা ও মনোবাসনা অনুযায়ী চলত, তাদের চিন্তা তাদের যেভাবে পরিচালিত করত অথবা তাদের হিতাহিত জ্ঞান যা নির্দেশ দিত তারা তা-ই করত। প্রতিটি যুগে প্রতিটি দেশে এটাই ছিল মুশরিকদের অবস্থা।[৪৯]

অতি প্রাচীন কাল থেকেই তাদের নৈতিকতা ও চরিত্রের ভিত্তি ছিল নড়বড়ে ও ভঙ্গুর। এমনকি আত্মীয়তার পবিত্র (মাহরাম) সম্পর্কগুলোও—বিশ্বের সমস্ত মানুষই স্বভাবগতভাবে এ সম্পর্কগুলোকে পবিত্র এবং যাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ককে ঘৃণ্য মনে করত—বিরোধ ও বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় ইয়াযদিগারদ[৫০], যিনি খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে সাসানীয় সম্রাট ছিলেন, নিজের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন, তারপর তাকে খুনও করেছিলেন। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সাসানীয় সম্রাট বাহরাম চুবিন[৫১] নিজের বোনকে বিয়ে করেছিলেন। ডেনমার্কের

---

৪৮. Shahin Makarios, *তারিখে ইরান*, পৃ. ২২১-২২৪।

৪৯. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ., *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৬৩-৬৪।

৫০. দ্বিতীয় ইয়াযদিগারদ (Yazdegerd II) : পারস্যের ষোড়শ সাসানীয় সম্রাট। রাজত্বকাল ৪৩৯ থেকে ৪৫৭ খ্রিষ্টাব্দ। তার পূর্বসূরি সম্রাট তার পিতা পঞ্চম বাহরাম এবং তার উত্তরসূরি সম্রাট তৃতীয় হরমিযদ। বাইজান্টিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে তিনি বেশ পরিচিতি লাভ করেছিলেন।-অনুবাদক

৫১. বাহরাম চুবিন (Bahrām Chōbin) : তিনি সাসানীয় সম্রাট দ্বিতীয় খসরু থেকে ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং এক বছর (৫৯০-৫৯১ খ্রিষ্টাব্দ) তা ধরে রাখতে পেরেছিলেন। এক বছর পর সম্রাট খসরু ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন।-অনুবাদক

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক ও ইরানের ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ ড. আর্থার ক্রিস্টেনসেন[৫২] বলেন, সাসানীয় যুগের সামসময়িক ইতিহাসবিদগণ—যেমন জাতহিয়াস ও অন্যরা—স্বীকার করেছেন যে, পারসিকদের মধ্যে রক্তসম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়দের (যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) বিয়ে করার প্রথা ছিল। সাসানীয় যুগের ইতিহাসে এ ধরনের বিয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পারসিকদের কাছে এ ধরনের বিবাহ অপরাধ বা পাপ বলে পরিগণিত হতো না। বরং এটা ছিল একটি পুণ্যময় কাজ, যার দ্বারা তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চাইত। চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং 'ইরানিরা বাছবিচারহীনভাবে বিয়ে করত' বলে সম্ভবত এমন বিবাহপ্রথার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।[৫৩]

খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে মানির[৫৪] আবির্ভাব ঘটে। তার আন্দোলন ছিল মূলত দেশে বিরাজমান যৌন অনাচার ও উচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে এক স্বভাববিরুদ্ধ কঠিন প্রতিক্রিয়া। মানি এই লাগামহীন যৌনতাচর্চার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি অযৌন জীবনযাপন ও কুমারব্রত পালন করতে আহ্বান জানালেন এবং বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। তার অভিপ্রায় ছিল মানুষের বংশবিস্তার রোধ করা এবং তিনি মানবজাতির আসন্ন বিনাশ চেয়েছিলেন। সম্রাট বাহরাম ২৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মানিকে হত্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ তো পৃথিবীকে বিরানভূমিতে পরিণত করার আহ্বান নিয়ে বেরিয়েছে। সুতরাং তার কোনো অভিপ্রায় সফল হওয়ার পূর্বেই তাকে ধ্বংস করে ফেলা উচিত।

---

৫২. ড. আর্থার ইমানুয়েল ক্রিস্টেনসেন (Arthur Christensen) : জন্ম ৯ জানুয়ারি ১৮৭৫ এবং মৃত্যু ৩১ মার্চ ১৯৪৫ খ্রি.। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইরান-বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন। ইরান-বিষয়ক ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ। ইসলামপূর্ব ও ইসলামপরবর্তী ইরানের ইতিহাস যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে আর্থার ক্রিস্টেনসেনকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।

৫৩. সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ., *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, অধ্যায় : إيران والحركات الهدامة فيها. পৃ. ৫৬-৫৭; ড. আর্থার ক্রিস্টেনসেনের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। মূল গ্রন্থটি ফরাসি ভাষায় লিখিত। উর্দু অনুবাদ করেছেন ড. মুহাম্মাদ ইকবাল এবং আরবি অনুবাদ করেছেন ইয়াহইয়া আল-খাশশাব (দারুন-নাহদাতিল আরাবিয়্যাহ, বৈরুত)। অনুবাদক দুজন একই নাম দিয়েছেন : *ইরান ফি আহদিস সাসানিন*। আবুল হাসান আলি নদবি রহ. উর্দু অনুবাদের সহায়তা নিয়েছেন।

৫৪. মানি : মানিবাদের প্রবক্তা। জন্ম ইরানে, ২১৬ খ্রিষ্টাব্দে। ২৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তার অনুসারীরা তাকে নবী মনে করে।

মানির মৃত্যু ঘটেছিল বটে, কিন্তু পারসিক সমাজে তার শিক্ষার প্রভাব ইসলামের বিজয়ধারার পরও টিকে ছিল।[৫৫]

এরপর পারসিকদের স্বভাবাত্মা মানির ধ্বংসাত্মক শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং মাযদাকের[৫৬] আহ্বানে প্রবেশ করে। মাযদাকের জন্ম ৪৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ঘোষণা করেন যে, মানুষ সমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং তাদের উচিত সমতার সঙ্গে বসবাস করা, যাতে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকে। যেহেতু মানুষের মন নারী ও সম্পদ অধিকারে আনতে ও কুক্ষিগত করতে সবচেয়ে বেশি লালায়িত তাই মাযদাকের কাছে নারী ও সম্পদের ক্ষেত্রে সমতা ও যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াল। আল্লামা শাহরাস্তানি[৫৭] বলেছেন,

> وكان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال، ولما كان أكثر ذلك إنما يقع بسبب النساء والأموال أحل النساء وأباح الأموال، وجعل الناس شركة فيهما كاشتراكهم في الماء والنار والكلأ.

মাযদাক মানুষকে পারস্পরিক বিরোধ, কলহবিবাদ ও যুদ্ধে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছিলেন। এগুলোর বেশিরভাগ যেহেতু নারী ও সম্পদের কারণেই হয়ে থাকে, তাই তিনি নারীদের হালাল ঘোষণা করেছিলেন এবং সব ধরনের সম্পদ বৈধ ঘোষণা করেছিলেন।

---

৫৫. প্রাগুক্ত।

৫৬. মাযদাক (Mazdak) : বিখ্যাত পারসিক দার্শনিক ও জরথুস্ত্রীয় পুরোহিত। সাসানীয় সম্রাট ও প্রথম খসরুর পিতা প্রথম কুবায (Kavadh I 488-513)-এর যুগে তার আবির্ভাব ঘটে। মৃত্যু হয় সম্ভবত ৫২৪ বা ৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি কুবাযকে তার মতাদর্শের প্রতি আহ্বান করলে কুবায সাড়া দেন। পরবর্তীকালে খসরু মাযদাক তার ওপর অপবাদ দিয়েছেন বলে জানতে পারেন। ফলে তাকে ডেকে পাঠান এবং হত্যা করেন। মাযদাক নারী ও সম্পদ–এ দুটির বৈধতার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

৫৭. আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল কারিম ইবনে আহমাদ শাহরাস্তানি (৪৭৯-৫৪৮ হিজরি/১০৮৬-১১৫৩ খ্রিষ্টাব্দ) : দার্শনিক ও আশআরি মতাদর্শের ধর্মতাত্ত্বিক। ধর্মতত্ত্ব, প্রচলিত ধর্ম ও দার্শনিক মতবাদ বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : الملل والنحل، نهاية الإقدام في علم الكلام، الإرشاد إلى عقائد العباد، تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام، مصارعات الفلاسفة، تاريخ الحكماء، المبدأ والمعاد، تفسير سورة يوسف، مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار في التفسير। ইরানের শাহরাস্তানে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। জীবনচরিত-রচয়িতা ইয়াকুত আল-হামাবি তার জ্ঞান-বিদ্যার উচ্চকিত প্রশংসা করেছেন।

> পানি, আগুন ও ঘাসে যেমন মানুষের যৌথ মালিকানা রয়েছে তেমনই নারী ও সম্পদের ক্ষেত্রেও সবাইকে যৌথ অংশীদার বানিয়ে দিয়েছিলেন।[৫৮]

মাযদাকের এই আহ্বান যুবকশ্রেণি, ধনিকশ্রেণি ও বিলাসভোগীদের জন্য অনুকূল হয়েছিল, তাদের মনোবৃত্তির সহায়ক হয়েছিল এবং রাজদরবারের সুরক্ষা লাভ করে সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়েছিল। সাসানীয় সম্রাট প্রথম কুবায[৫৯] মাযদাকের আহ্বান ও তা প্রচারে সহায়তা দিয়েছিলেন, তা সংহতকরণে উদ্যমশীল হয়েছিলেন। ফলে এই আহ্বানের প্রভাবে পারস্য নৈতিক বিপর্যয় ও যৌন স্বেচ্ছাচারিতায় নিমজ্জিত হয়েছিল। ইমাম তাবারি রহ. বলেছেন,

> ইতর শ্রেণির লোকেরা এটার (মাযদাকের আহ্বান ও নীতি) সুযোগ গ্রহণ করল ও তা কাজে লাগাল। তারা মাযদাক ও তার সহচরদের ঘিরে ধরল এবং তাদের পিছু পিছু ছুটল। ফলে সাধারণ মানুষেরা তাদের দ্বারা আক্রান্ত হলো। ইতরদের শক্তি বেড়ে গেল, তারা লোকদের বাড়িতে আক্রমণ চালিয়ে তাদের পরাস্ত করে ঘর-নারী-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে শুরু করল। কেউ তাদের বাধা দিতে পারল না। তারা সাসানীয় সম্রাট কুবাযকে এই ঘৃণ্য কাজ শোভনীয় করে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করল এবং এর বিপরীত হলে তাকে অপসারণ করা হবে বলে হুমকি দিলো। ফলে সবাই এই ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হলো, এমনকি বাবা তার সন্তানের পরিচয় জানল না এবং সন্তান তার বাবার পরিচয় জানল না। সাধারণ লোকদের সাধ্যের ভেতরে কিছু থাকল না।[৬০]

পারস্যসম্রাটগণ (কায়সারগণ) দাবি করতেন যে, তাদের ধমনিতে ঐশী রক্ত প্রবহমান এবং তাদের স্বভাবচরিত্রে রয়েছে ঊর্ধ্বজাগতিক পবিত্র উপাদান। পারস্যবাসীরাও তাদের এই দাবি মেনে নিয়েছিল। তাদেরকে তারা ঈশ্বর ও উপাস্যের স্থানে বসিয়েছিল। তাদের উদ্দেশে তারা প্রাণী উৎসর্গ করত। (কায়ানি পরিবারের ক্ষেত্রে) তারা বিশ্বাস করত যে, এ

---

৫৮. ইমাম শাহরাস্তানি, *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল*, খ. ১, পৃ. ২৪৮।

৫৯. পারস্যের সাসানীয় সম্রাট এবং প্রথম খসরুর পিতা। প্রথমবার রাজত্বকাল ৪৮৮-৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দ এবং দ্বিতীয়বার রাজত্বকাল ৪৯৮-৫৩১ খ্রিষ্টাব্দ।

৬০. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ১, পৃ. ৪১৯।

সকল সম্রাটই কেবল রাজমুকুট পরিধানের উপযুক্ত এবং তারাই কেবল ভূমিকর আদায় করতে পারেন। রাজ্য ও রাজ্যভান্ডারের ক্ষেত্রে এই নীতিই চলে আসছিল, উত্তরসূরি থেকে পূর্বসূরি, দাদা থেকে পিতা এই অধিকার প্রাপ্ত হতো। জালিম ছাড়া কেউ তাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়নি। নিকৃষ্ট জারজ সন্তান ছাড়া কেউ তাদের সঙ্গে বিতণ্ডা করেনি। পারস্যবাসীরা রাজ্য ও রাজ-কোষাগারের ক্ষেত্রে রাজত্ব ও উত্তরাধিকারে বিশ্বাস করত। তারা এর কোনো পরিবর্তন চাইত না, এর কোনো বিকল্প তাদের কাম্য ছিল না।[৬১]

ইরানে মানুষের সামাজিক স্তরগুলোর মধ্যে বিরাট বৈষম্য ও ফাঁক থেকে গিয়েছিল। আর্থার ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, ইরানের সমাজব্যবস্থা বংশমর্যাদা ও পেশার বিবেচনার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের সামাজিক স্তরগুলোর মধ্যে বিরাট খাদ ছিল, যার ওপর কোনো সেতু তৈরি করা যায়নি এবং কোনো বন্ধন তাদের সংযুক্ত করতে পারেনি।[৬২]

এমনই ছিল পারস্যসভ্যতা। জৈবিক বিলাস, যুদ্ধের জন্য শক্তি সঞ্চয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। তারা সম্রাটদের গোটা জাতি ও সর্বস্তরের মানুষের উর্ধ্বে পবিত্র উপাস্যের স্থান দিয়েছিল।

---

[৬১]. সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ., *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৫৯-৫৮।

[৬২]. সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ., *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, অধ্যায় : তাফাউত বায়নাত-তাবাকাত, পৃ. ৬০; ড. আর্থার ক্রিস্টেনসেনের *ইরান ফি আহদিস সাসানিন* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

রোমান সভ্যতা

গ্রিক সভ্যতার পর রোমান সভ্যতাকে ইউরোপের সবচেয়ে বড় সভ্যতা মনে করা হয়। এই সভ্যতা প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও নতুন নগরকেন্দ্রিতার সঙ্গে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এর মধ্যে একটি হলো তাদের প্রণীত শাসনবিধি। এ শাসনবিধি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে রোমান চিন্তাবিদ ও দার্শনিকগণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। তাদের Legal status of persons (ব্যক্তির আইনগত অবস্থা)-য় আমরা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের প্রকৃতি, ব্যক্তির অধিকার ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা পেয়ে যাই।

রোমানরা সভ্যতা ও অগ্রগতির সংহত পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং শক্তি ও প্রতাপের সঙ্গে সভ্য পৃথিবীকে শাসন করার ক্ষেত্রে তারা পারসিকদের অংশীদার হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের পূর্বে তা গভীর খাদে পৌঁছে গিয়েছিল। সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা নৈরাজ্যের নিম্নতম স্তরে পতনোন্মুখ ছিল।

ড. আহমাদ শালবি রোমান সভ্যতার পরিস্থিতি ও অবস্থার সারসংক্ষেপ দাঁড় করিয়েছেন এবং বলেছেন, রোমানরা খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে আক্রমণ চালিয়ে ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার করে। তারপর ৬৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিরিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করে এবং ৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মিশর দখল করে নেয়। ফলে ইউরোপের ও প্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতাঞ্চলগুলো রোমানদের কর্তৃত্বাধীনে চলে যায়। এই অঞ্চলগুলো রোমান শাসনাধীন থেকে উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার শিকার হয়, উদ্ভাবন ও চিন্তার শক্তি পর্যুদস্ত হয়। রোমানদের অত্যাচার ও জুলুমের জোয়ালের নিচে উৎকর্ষের অগ্নিশিখা নির্বাপিত হয়। রোমান সাম্রাজ্য তাদের আধিপত্যাধীন এলাকাগুলোতে সভ্যতার মশাল বহন করে নিয়ে যেতে পারেনি। কারণ রোম কোনো কালেই চিন্তার কোনো কেন্দ্রভূমি ছিল না, যেমন প্রাচীন মিশরের কেন্দ্র ছিল আইনে শামস, বা গ্রিক সভ্যতার উত্থানের সময় কেন্দ্র

ছিল এথেন্স ও আলেকজান্দ্রিয়া। এ কারণে সভ্যতার উদ্যম ও বিকাশ থেমে গিয়েছিল।[৬৩]

হযরত ঈসা মাসিহ আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের পরও সম্রাট কনস্টান্টাইনের (২৭২-৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) শাসনকাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল রোমানদের রাষ্ট্রীয় নীতিতে পৌত্তলিকতা থেকে গিয়েছিল। সম্রাট কনস্টান্টাইন ৩০৬ থেকে ৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্য শাসন করেছেন। এই সম্রাট কিছু নীতি ও কার্যাবলি গ্রহণ করেছিলেন যার দ্বারা মাসিহি ধর্মের (খ্রিষ্টধর্মের) কোমর মজবুত হয়েছিল। এরপর খ্রিষ্টধর্মের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল। সম্রাট কনস্টান্টাইন তখন মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু তিনি খ্রিষ্টধর্মের জন্য যা-কিছু করেছেন সেটাকে গির্জার কর্ণধারেরা তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট মনে করেনি। তারা এই সম্রাটের নামে Donation of Constantine নাম দিয়ে একটি দলিল তৈরি করে। এই দলিল ঘোষণা করে যে, সম্রাট পোপকে পোপতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রভূত পার্থিব ক্ষমতা দিয়েছেন। এই পোপতন্ত্র ছিল মূলত পোপদেরই তৈরি। সমালোচকগণ সমালোচনার সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে এই দলিলের অসারতা প্রমাণ করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, খ্রিষ্টধর্মের ব্যাপারে কনস্টান্টাইনের অবস্থান ধর্মগুরুদের অধিকতর কর্তৃত্বপরায়ণ হতে প্রলুব্ধ করেছিল। যা ধর্মের বিষয়াবলি অতিক্রম করে গিয়ে পার্থিব বিষয়ে পর্যবসিত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে গির্জার কর্ণধারেরা সফল হয়েছিল। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষের দিকে মিলানের বিশপ সম্রাট থিওডোসিয়াস (Theodosius I)-এর কতিপয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং অবশেষে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াস মৃত্যুবরণ করেন।[৬৪]

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকের শুরু থেকে গির্জা কর্তৃপক্ষ রোমান সাম্রাজ্যে বহুবিধ বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে, প্রধানত চিন্তাগত বিভিন্ন ধারায়। এ সকল চিন্তাধারার শেকড় ও ভিত্তি ছিল মিশরীয় অথবা ফিনিসীয়। এসব চিন্তাধারা ও শিক্ষাধারার ক্ষেত্রে গির্জার অবস্থান কী ছিল? নিম্নলিখিত কয়েকটি বিবেচনায় তাদের অবস্থান নির্ণয় করা যায় :

---

৬৩. আহমাদ শালবি, মাওসুআতুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৫৬।
৬৪. আহমাদ শালবি, মাওসুআতুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৫৬-৫৭।

ক. দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন তার সব পবিত্র গ্রন্থের (বাইবেলের) দুই মলাটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং এ পবিত্র গ্রন্থই সমস্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার ভিত্তি এবং কেবল গির্জার ধর্মগুরুরাই এ গ্রন্থের বাণীসমূহ ব্যাখ্যার অধিকার রাখেন। শুধু তাই নয়, জনমণ্ডলীকেও এই ব্যাখ্যা কোনো ধরনের চিন্তা ও বোঝাপড়া ব্যতীত মেনে নিতে হবে।

খ. উল্লিখিত বক্তব্য অনুসারে লোকদের প্রধান বিশ্বাস ছিল এই যে, পবিত্র কিতাব (বাইবেল) ব্যতীত সবকিছু সম্পূর্ণরূপে বাতিল। সুতরাং ভিন্নকিছুর সমর্থন ও পঠনপাঠন বৈধ নয়।

গ. গির্জার ধর্মগুরুরা এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি ও তাঁর আইন বাস্তবায়নকারী। সুতরাং যারা তাদের চিন্তাধারার বিরোধিতা করবে তাদের শাস্তি প্রদান এবং যারা তাদের আনুগত্য করবে তাদের পুরস্কার প্রদানের অধিকার গির্জার ধর্মগুরুদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যেমন আল্লাহ তাআলার মানুষের ক্ষেত্রে এই দুটি কাজ সম্পূর্ণরূপে করে থাকেন।

ঘ. খ্রিষ্টধর্ম মাসিহ আলাইহি সালাম কর্তৃক আনীত মুজিযা ও অলৌকিক বিষয়াবলির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই মুজিযা ও অলৌকিক বিষয়াবলি প্রাকৃতিক নিয়মনীতি ও জ্ঞানগত মৌলিকতার বিপরীত ও বিরোধী হয়ে থাকে। আর খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা যেহেতু মুজিযা ও অলৌকিক বিষয়াবলি একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করত, সেহেতু তারা এর পক্ষ নিয়ে জ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কেননা, জ্ঞান অলৌকিকতার বিপরীত বিষয়।

ঙ. খ্রিষ্টধর্মের দলিলগুলো ছিল দেহ, সম্পদ ও ভোগসামগ্রীর প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন দুনিয়াবিমুখতা এবং আসমানি রাজ্যের প্রতীক্ষার পক্ষে, আর প্রাচ্যে বিকশিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানরাশি ছিল পার্থিব জগতের সেবায় নিবেদিত, তাই খ্রিষ্টীয় ধর্মগুরুদের চিন্তাধারা এ সকল জ্ঞানের বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৬৫]

এ কারণে গির্জা বহুবিধ জ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, যেভাবে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল জ্ঞানী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। তা ছাড়া গির্জা কর্তৃপক্ষ কতিপয় চিন্তাধারাকে পবিত্র গ্রন্থের লাগাম পরিয়ে দেয় এবং সেগুলোকে

---

৬৫. আহমাদ শালবি, *মাওসুআতুল হাদারাতিল ইসলামিয়া*, খ. ১, পৃ. ৫৭-৫৮।

নিজেরা কুক্ষিগত করে নেয়। তারা অসংখ্য চিন্তাধারার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার বিরোধী ছিল। তাই গির্জা এসব জ্ঞানধারার কিছু গ্রন্থকে পুড়িয়ে ফেলে এবং অবশিষ্ট গ্রন্থরাশিকে মাটির গর্ভে সমাধিস্থ করে। ফলে কেউ তার খোঁজ পায়নি, সবই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।[৬৬]

গির্জা দীর্ঘ সময় ধরে এই রাজনীতি চালায়। যখন স্বাধীনতার যুগ শুরু হলো এবং গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলা ও জব্দ করার বিষয়টি তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল, তখন তারা কিছু সিদ্ধান্ত প্রকাশ করল, যা খ্রিষ্টানদের জন্য ওইসব গ্রন্থপাঠ নিষিদ্ধ করে, যে গ্রন্থগুলো ছিল তাদের ধর্মবিরোধী, ধর্মের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং গির্জার গুমোর ফাঁসকারী। পৃথিবী ঘুরছে এই মত যারা ব্যক্ত করেছিল তারা তাদেরকেও একইভাবে 'ধর্মচ্যুত' ঘোষণা করে। এভাবেই খ্রিষ্টধর্মের কর্ণধারেরা পৃথিবীতে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে বিশাল সভ্যতার যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তা ধ্বংস করে দেয়। অধিকন্তু এ সকল লোক ধর্মকে পুঁজিরূপে খাটায় এবং ধর্মের বিকৃতি সাধন করে। ধর্মকে আলোকবর্তিকা বানানোর বদলে তারা এটিকে মূর্খতা ও অন্ধকারের অবলম্বন বানিয়ে ফেলে।[৬৭]

অন্যদিকে খ্রিষ্টধর্মের পার্শ্বিক বিষয়াবলিতে, এমনকি মৌলিক বিষয়সমূহে কূটতর্ক, গভীর বিবাদবিসংবাদের ঝড় শুরু হয়েছিল। তা জাতির চিন্তাকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল, জাতির সন্তানদের বুদ্ধি-বিবেচনাকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল এবং তার জ্ঞানগত শক্তিকে গিলে ফেলেছিল। এসব বিষয় অনেক সময় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, হত্যা, বিনাশ, উৎপীড়ন, আক্রমণ, লুণ্ঠন ও গুপ্তহত্যার রূপ নিয়েছিল। শিক্ষালয়, উপাসনালয়, বাড়িঘর সবকিছু ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমরশিবিরে পরিণত হয়েছিল। গোটা দেশ গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত হয়েছিল। এই ধর্মীয় বিরোধের ভয়াবহ প্রকাশ ঘটেছিল সিরিয়া ও রোমান সাম্রাজ্যের খ্রিষ্টানগোষ্ঠী এবং মিশরের খ্রিষ্টানগোষ্ঠীর মধ্যে। আরও সূক্ষ্মভাবে বললে এটি ছিল মুলকানিয়্যা (Melkite/রাজধর্ম) ও মানুফিসিয়্যা (Manichaeism/মানিবাদ) ধর্মাদর্শের বিরোধ। মুলকানিয়্যার মূলনীতি ছিল যিশুখ্রিষ্টের মানবিক সত্তা ও ঐশ্বরিক সত্তার

৬৬. ইবনে নুবাতা আল-মিসরি, *সারহুল উয়ুন ফি শরহি রিসালাত ইবনে যায়দুন*, পৃ. ৩৬; ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৩৩৩।

৬৭. আহমাদ শালবি, *মাওসুআতুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৫৭-৬০।

মিলনে (দ্বৈতসত্তায়) বিশ্বাসস্থাপন এবং মানিবাদীরা বিশ্বাস করত যে, যিশুখ্রিষ্টের একটিমাত্র সত্তা রয়েছে, তা হলো ঐশ্বরিক সত্তা, তার ঐশ্বরিক সত্তায় তার মানবিক সত্তা বিলীন হয়ে গেছে। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে এই গোষ্ঠী দুটির বিরোধ ও সংঘাত চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এমনকি তা যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দুটি ভিন্ন ধর্মের মধ্যে তুমুল লড়াই অথবা ইহুদি ও নাসারাদের মধ্যকার বিবাদ। যেখানে ইহুদিদের দাবি নাসারারা কোনো ধর্মের ওপর নেই এবং নাসারাদের দাবি ইহুদিরা কোনো ধর্মের ওপর নেই।[৬৮]

সামাজিক দিক বিবেচনা করতে গেলে রোমান সমাজ দুটি স্তরে বিভক্ত ছিল, অভিজাত শ্রেণি ও দাস শ্রেণি। যাবতীয় অধিকার ছিল অভিজাত শ্রেণির জন্য। আর দাস শ্রেণির জন্য কোনো ধরনের নাগরিক অধিকার ছিল না। সত্য এই যে, রোমান আইনকানুন দাস শ্রেণির ক্ষেত্রে 'ব্যক্তি' শব্দটি প্রয়োগ করতে দ্বিধান্বিত ছিল। অবশেষে তার 'ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি' নামকরণ করে এই জটিলতা থেকে বেরিয়ে আসে। রোমান অভিজাত শ্রেণির লোকেরা দাসদেরকে 'পণ্য' গণ্য করত। তাই তাদের মালিকানার অধিকার ছিল না, তারা কারও উত্তরাধিকারী হতে পারত না, তাদেরও কেউ উত্তরাধিকারী হতো না, তারা বৈধভাবে স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত না। তাদের সব সন্তানসন্ততিকে অবৈধ সন্তান বলে গণ্য করা হতো। একইভাবে তারা দাসীদের সন্তানদেরকে দাস বিবেচনা করত, তাদের পিতা স্বাধীন ও অভিজাত শ্রেণির হলেও। অভিজাত শ্রেণির লোকদের জন্য আইনগত বন্দোবস্ত বা ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকেই দাস ও দাসীদের সঙ্গে গর্হিত কাজ করার অধিকার ছিল। অন্যদিকে দাসদের জন্য জুলুম ও নির্যাতনের বিচার চাওয়ার অধিকার বা শক্তি ছিল না। দাসদের নির্যাতন করা হলে নির্যাতককে বিচারের সম্মুখীন করার জন্য অধিকার প্রদানের বিষয়টি ছিল মনিবের হাতে। উপরন্তু মনিবই দাসদের প্রহার করত, বন্দি করে রাখত, বনেজঙ্গলে হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দিত, ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করত, কোনো অজুহাতে বা অজুহাত ছাড়াই তাদের হত্যা করত। দাসদের মালিকদের পক্ষ থেকে গৃহীত সাধারণ মতামতের বাইরে দাস শ্রেণির তত্ত্বাবধানের জন্য আর কোনো ব্যবস্থা ছিল

---

৬৮. সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৪৩।

না। কোনো দাস পালিয়ে যাওয়ার পর তাকে আটক করতে পারলে মনিবের অধিকার ছিল ওই দাসকে আগুনে ঝলসানোর অথবা শূলবিদ্ধ করে হত্যা করার। সম্রাট অগাস্টাস গর্ববোধ করতেন যে তিনি ত্রিশ হাজার পলাতক দাসকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছিলেন এবং দাবি করার মতো মালিক না পেয়ে তাদের শূলবিদ্ধ করে হত্যা করেছিলেন। উল্লিখিত নির্যাতনের ভয়ে বা অন্যকোনো কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত কোনো দাস যদি তার মনিবকে হত্যা করত তবে রোমান আইন ওই মনিবের সকল দাসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ দিত। ৬১ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সিনেটর পেডানিয়াস সেকানদাস (Lucius Pedanius Secundus) তার এক দাস কর্তৃক নিহত হন। এ ঘটনার পর রোমান সিনেটররা রোমান আইন অনুযায়ী তার সকল দাসের মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন। ফলে তার চারশ দাসকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিছু সংখ্যক সিনেটর এই নির্দেশের বিরোধিতা করেছিলেন এবং একটি বিক্ষুব্ধ দল রাস্তায় নেমে ক্ষমা ঘোষণার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সিনেটর সভা এই আইন বাস্তবায়নে জোরজবরদস্তি করে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এমন নির্মম সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করলে মনিবরা তাদের দাসদের ব্যাপারে নিরাপত্তা বোধ করবেন না।[৬৯]

শুধু এটাই নয়, রোমান আইন মনিবকে এ অধিকার দিয়েছিল যে, সে তার দাসকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে অথবা জীবনদান করতে পারবে। ওই যুগে দাসের সংখ্যা খুব বেশি বেড়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন যে, রোমান রাজ্যগুলোতে দাসের সংখ্যা স্বাধীন মানুষের চেয়ে তিনগুণ বেশি ছিল।[৭০]

রোমান সমাজে নারীদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। ওই যুগের নারীদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, নারী ছিল আত্মাহীন কাঠামো। এ কারণে নারীর পরকালীন জীবন বলতে কিছু নেই। নারী ছিল অপবিত্র। তাই তাদের গোশত খাওয়ার অধিকার ছিল না, হাসারও অধিকার ছিল না। এমনকি

---

৬৯. উইল ডুরান্ট, কিসসাতুল হাদারাহ, খ. ১০, পৃ. ৩৭০-৩৭১।

৭০. আহমাদ আমিন, ফাজরুল ইসলাম, পৃ. ৮৮।

কথা বলার অধিকারও ছিল না। তারা নারীর মুখে লোহার তালা লাগিয়ে দিয়েছিল।[৭১]

আমরা যা-কিছু উল্লেখ করেছি তার পরিণতি ছিল ভয়াবহ। রোমান সভ্যতার নক্ষত্র অস্তমিত হতে শুরু করেছিল। মানবিক গুণাবলির ভিত্তিসমূহ ধসে গিয়েছিল। চরিত্র ও নৈতিকতার অবলম্বনগুলো ধ্বংস হয়ে পড়েছিল। এডওয়ার্ড গিবন তার লেখায় এসব বিষয় চিত্রায়িত করেছেন এবং বলেছেন, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে রোমান সাম্রাজ্য তার বিনাশ ও অধঃপতনের শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়েছিল।[৭২]

Asif Rahman

---

৭১. আহমাদ শালবি, *মুকারানাতুল আদইয়ান*, খ. ২, পৃ. ১৮৮; আফিফ তাইয়ারাহ, *আদ-দীনুল ইসলামি*, পৃ. ২৭১।

৭২. এডওয়ার্ড গিবন, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, খ. ৫, পৃ. ৩৩, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৪৬।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

ইসলামপূর্ব আরব

ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব যে অবস্থায় উন্নীত হয়েছিল তার শ্রেষ্ঠত্ব ও ভিন্নতা স্বীকার করে নিয়েও আরবের ইসলামপূর্ব যুগ 'জাহিলিয়্যা' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। তাই ইসলামপূর্ব আরবের ইতিহাসকে 'আত-তারিখুল জাহিলি' বা 'তারিখুল জাহিলিয়্যা' (অজ্ঞতার যুগের ইতিহাস/অন্ধকার যুগের ইতিহাস) বলা হয়। 'জাহিলিয়্যা' শব্দটি অন্ধকার ও অজ্ঞতা বোঝানোর পাশাপাশি যাযাবর জীবন ও পশ্চাৎপদতাও বোঝায়। যেমন আরবরা সভ্যতার ক্ষেত্রে তাদের চারপাশের মানুষদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল। তাদের অধিকাংশই মূর্খতা ও উদাসীনতায় নিমজ্জিত গোত্রসমূহের জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বহির্বিশ্বেরও তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ ছিল না। তারা ছিল নিরক্ষর মূর্তিপূজারি, তাদের জ্ঞানগত পূর্ণতার কোনো ইতিহাস নেই।[৭৩]

জাহিলি যুগে বিশ্বের সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠীর তুলনায় আরবরা ছিল কিছু অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবগত যোগ্যতার অধিকারী। যেমন ভাষানৈপুণ্য ও বাগ্মিতা, স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার প্রতি অনুরাগ, সাহসিকতা ও বীরত্ব, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উৎসাহ ও উদ্দীপনা, স্পষ্ট ভাষণ, অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তি, সমতাপ্রেম ও ইচ্ছাশক্তি, প্রতিশ্রুতিপূরণ ও আমানত রক্ষা। কিন্তু নবুয়ত ও নবীগণের শিক্ষা থেকে তাদের কালগত দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এক আরব উপদ্বীপে আবদ্ধ ছিল এবং বাপদাদাদের ধর্ম ও জাতীয় আচার-সংস্কারকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে ছিল। এসব কারণে শেষদিকে (খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে) তারা ভীষণ ধর্মীয় অবক্ষয়ের শিকার হয়েছিল এবং চরম পর্যায়ের পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। সামসময়িক

---

৭৩. জাওয়াদ আলি, *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, খ. ১, পৃ. ৩৭।

কোনো জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে যার দৃষ্টান্ত পাওয়া ছিল ভার। তা ছাড়া তারা নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল। ফলে তারা নৈতিকভাবে চরম অধঃপতিত হয়ে পড়েছিল, তাদের সমাজ হয়ে পড়েছিল নষ্ট-ভ্রষ্ট, তাদের অবকাঠামো ছিল ভঙ্গুর ও পতনোম্মুখ। কারণ জাহিলি জীবনের নিকৃষ্ট দোষ-ব্যাধি তাদের মধ্যে জেঁকে বসেছিল এবং তারা আসমানি ধর্মসমূহের গুণাবলি ও সৌন্দর্য থেকে দূরে সরে গিয়েছিল।[৭৪]

ধর্মীয় দিক বিবেচনা করতে গেলে, গোটা আরব উপদ্বীপে প্রতিমাপূজা ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি প্রতিটি গোত্রে, তারপর প্রতিটি বাড়িতে প্রতিমা স্থান পেয়েছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি আবু রাজা আল-উতারিদি রা. বর্ণনা করেন,

«كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الْآخَرَ فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنَا بِهِ»

(ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমরা) পাথরের পূজা করতাম। যখন এটি অপেক্ষা অন্য একটি ভালো পাথর পেয়ে যেতাম তখন এটিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অন্যটি গ্রহণ করতাম (অন্যটির পূজা শুরু করতাম)। যখন কোনো পাথর পেতাম না, কিছু মাটি একত্র করে স্তূপ বানিয়ে নিতাম। তারপর একটি ছাগী নিয়ে আসতাম এবং ওই স্তূপের ওপর ছাগীটিকে দোহন করতাম। (যাতে তা কৃত্রিম পাথরের মতো দেখায়।) তারপর স্তূপটির চারপাশে তাওয়াফ করতাম।[৭৫]

প্রতিমা ছাড়াও আরবদের আরও দেবতা ছিল। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ফেরেশতা, জিন ও নক্ষত্র। তারা বিশ্বাস করত যে, ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার কন্যা। তাই তারা আল্লাহ তাআলার কাছে ফেরেশতাদের সুপারিশকারীরূপে গ্রহণ করে। এমনকি প্রার্থনা কবুলের মাধ্যম হিসেবেও ফেরেশতাদের গ্রহণ করে। একইভাবে তারা জিনদেরকেও আল্লাহর

---

৭৪. সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ., *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৭৬-৭৭।

৭৫. *বুখারি*, হাদিস নং ৪১১৭।

তাআলার শরিক বানিয়ে তাদের অলৌকিক শক্তি ও প্রভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের পূজা করতে শুরু করে।[৭৬]

আরও একটি কারণ এই যে, ইহুদিরা তখন গোটা আরবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। ইহুদিধর্মের নেতারা আল্লাহ তাআলাকে ব্যতিরেকে নিজেরাই প্রভুর আসনে সমাসীন হয়েছিল। তারা জনমণ্ডলীর ওপর খড়্গ ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং তাদের কাছে এমনকি মনের চিন্তা ও ঠোঁটের ফিসফিসানির জন্যও মানুষকে জবাবদিহি করতে হতো। তারা তাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জনের পেছনে নিয়োজিত করেছিল। যদিও এতে ধর্মের বিনাশ ঘটেছিল এবং ধর্মহীনতা, অবিশ্বাস ও কুফরি ছড়িয়ে পড়েছিল।

অন্যদিকে খ্রিষ্টধর্ম এক ভীষণ দুর্বোধ্য পৌত্তলিকতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তা (ত্রিত্ববাদের ধারণার ফলে) আল্লাহ তাআলা ও মানুষের মধ্যে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। আরবের খ্রিষ্টধর্ম অনুসারীদের অন্তরে এই ধর্মের কোনোরূপ সত্যিকার প্রভাব ছিল না।[৭৭]

নৈতিক ও চারিত্রিক দিক বিবেচনায় তারা চরম অবক্ষয় ও অধঃপতনের শিকার হয়েছিল। মদ্যপান মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সমাজের গভীরতায় তার কঠিন শেকড় বিস্তার করেছিল। এ কারণে তখনকার কাব্যকলা, ইতিহাস ও সাহিত্যের একটি বিরাট অংশই ছিল মদের দখলে। একইভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জুয়া তার থাবা ছড়িয়ে দিয়েছিল। কাতাদা[৭৮] বলেন, জাহিলি যুগে মানুষ তার স্ত্রী ও সম্পদের ওপরও জুয়া খেলত, বাজি ধরত। তারপর রিক্ত-নিঃস্ব হয়ে বেদনার্ত চোখে দেখত যে, তার স্ত্রী ও সম্পদ অন্যের হাতে চলে গেছে। এর ফলে তাদের মধ্যে ভয়াবহ শত্রুতা ও কলহবিবাদ শুরু হতো।[৭৯]

---

৭৬. আবুল মুনযির হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়িব আল-কালবি, *কিতাবুল আসনাম*, পৃ. ৪৪।

৭৭. সফিউদ্দিন মুবারকপুরি, *আর-রাহিকুল মাখতুম*, পৃ. ৪৭।

৭৮. কাতাদা আস-সাদুদি (৬০-১১৭/১১৮ হিজরি) : বিশিষ্ট তাবেয়ি ও উঁচুস্তরের আলেম। আবু উবাইদা বলেন, প্রতিদিন বনু উমাইয়া এলাকা থেকে কোনো-না-কোনো ব্যক্তি কাতাদা আস-সাদুসির দরজায় কড়া নাড়তেন এবং তার কাছে হাদিস, বংশধারা বা কবিতা জানতে চাইতেন। তিনি ইরাকের ওয়াসিত জেলায় মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, ৪/৮৫-৮৬; যাহাবি, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ১,পৃ. ১২২-১২৩।

৭৯. তাবারি, *জামিউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন*, খ. ১০, পৃ. ৫৭৩; আযিমাবাদি, *আওনুল মাবুদ*, খ. ১০, পৃ. ৭৯।

একইভাবে আরবদের ও ইহুদিদের মধ্যে সুদি কারবার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সুদি কারবারের শেকড় অনেকদূর পর্যন্ত প্রোথিত ছিল। এমনকি তারা বলেছিল, বেচাকেনা তো সুদের মতোই। একইভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছিল। ব্যভিচার একটি প্রচলিত প্রথার রূপ ধারণ করেছিল। পুরুষ ইচ্ছে করলেই কয়েকজন উপপত্নী বা রক্ষিতা গ্রহণ করতে পারত, নারীরাও মনে ধরলে কয়েকজন উপপতি বা প্রণয়সঙ্গী গ্রহণ করতে পারত। এতে কোনো বৈধ বন্ধন বা চুক্তির প্রয়োজন হতো না। ওই যুগে কী ধরনের বিবাহ প্রচলিত ছিল তার প্রকারভেদ উল্লেখ করে সাইয়িদা আয়িশা রা. বলেন,

«إِنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ»

জাহিলি যুগে চার প্রকারের বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রথম প্রকার : বর্তমান যে ব্যবস্থা চলছে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কোনো নারীর অভিভাবকের কাছে তার অধীনে থাকা নারী অথবা তার কন্যার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দেবে এবং তার মোহর নির্ধারণের পর বিবাহ করবে। দ্বিতীয় প্রকার : কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার মাসিক (ঋতুস্রাব) থেকে মুক্ত হওয়ার পর এই কথা বলত যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও এবং তার সঙ্গে যৌনসঙ্গম করো। এরপর স্বামী তার এই স্ত্রী থেকে পৃথক থাকত এবং কখনো স্ত্রীসহবাস করত না, যতক্ষণ না তার এই স্ত্রী যে লোকটার সঙ্গে যৌনসঙ্গমে মিলিত হচ্ছে তার দ্বারা গর্ভবতী হতো। যখন তার গর্ভ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতো তখন ইচ্ছা করলে স্বামী তার এই স্ত্রীর সাথে সহবাস করত। স্বামী উন্নত ধরনের সন্তান প্রজননের আশায় এই কাজ করত। এ ধরনের বিবাহকে 'নিকাহুল ইসতিবদা' বলা হতো। তৃতীয় প্রকার বিবাহ : দশজনের কম সংখ্যক ব্যক্তি একত্র হয়ে পালাক্রমে একই নারীর সাথে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতো। যদি নারীটি গর্ভবতী হতো, তারপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কিছুদিন অতিবাহিত হতো, সেই নারী তার সঙ্গে সঙ্গমকারী সব পুরুষকে ডেকে পাঠাত এবং কেউই আসতে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না। তারা সবাই নারীটির সামনে সমবেত হওয়ার পর সে তাদেরকে বলত, তোমরা সকলেই জানো তোমরা কী করেছ! এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি। সুতরাং হে অমুক! এটা তোমারই সন্তান। ওই নারী যাকে খুশি তার নাম ধরে ডাকত, তখন ওই পুরুষ নবজাতক শিশুটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকত এবং সে তা অস্বীকার করতে পারত না। চতুর্থ প্রকারের বিবাহ : বহু পুরুষ একজনমাত্র নারীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতো এবং ওই নারী তার কাছে যত পুরুষ আসত, কাউকে রমণসঙ্গী করতে অস্বীকার করত না। তারা ছিল বারবনিতা। বারবনিতারা তাদের চিহ্নরূপে নিজ নিজ ঘরের সামনে পতাকা উড়িয়ে রাখত। যে কেউ ইচ্ছা করলে অবাধে তাদের সঙ্গে যৌনসম্ভোগে লিপ্ত হতে পারত। যদি এসব নারীর মধ্যে কেউ গর্ভবতী হতো এবং সন্তান প্রসব করত তাহলে যৌনসঙ্গমকারী সকল পুরুষ সমবেত হতো

> এবং 'কায়িফ'[৮০]-কে ডেকে আনত। এ সকল ব্যক্তি সন্তানটির সঙ্গে যে লোকটির সাদৃশ্য পেত তাকে বলত, এটি তোমার সন্তান। তখন ওই পুরুষটি নবজাতক সন্তানকে নিজের নয় বলে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না।[৮১]

নারীদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে বলতে গেলে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সারমর্মরূপে যে কথা বলেছেন সেটা উল্লেখ করাই সমীচীন। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! আমরা জাহিলি যুগে নারীদের কোনোকিছুরূপে গণ্য করতাম না। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে যা নাযিল করলেন তা তো সবার সামনেই রয়েছে।'[৮২]

নারীদের কোনো উত্তরাধিকার ছিল না। উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আরবরা বলত, আমাদের মধ্যে যারা তরবারি ধারণ করতে পারে এবং সম্পদ ও ভূখণ্ড রক্ষা করতে পারে তারাই কেবল উত্তরাধিকার পাবে। তাই কোনো লোক মারা গেলে তার পুত্রসন্তান উত্তরাধিকার পেত। পুত্রসন্তান না থাকলে তার নিকটাত্মীয় অভিভাবক তা পেত। পিতা বা ভাই বা চাচা, যে-ই হোক না কেন। আর মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও কন্যাদেরকে যে লোকটি উত্তরাধিকার পেয়েছে তার স্ত্রী ও কন্যাদের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হতো। তারা যা পেত, এরাও তা-ই পেত; তাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তাত এদের ওপরও একই দায়িত্ব বর্তাত। নারীর জন্য তার স্বামীর ওপর আদতেই কোনোরূপ অধিকার ছিল না। তালাকের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। পুরুষরা ইচ্ছামতো যে-কয়জন খুশি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত, নির্ধারিত কোনো সংখ্যা ছিল না। আরবদের একটি জঘন্য প্রথা ছিল এমন, কোনো লোক তার স্ত্রী এবং এই স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীদের সন্তান রেখে মারা গেলে তার বড় পুত্রসন্তান তার পিতার স্ত্রীর ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার

---

৮০. যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সন্তানের গোপন চিহ্ন দেখে তার পিতার সঙ্গে সাদৃশ্য নির্ণয় করতে পারতেন। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *ফাতহুল বারি*, খ. ৯, পৃ. ১৮৫।

৮১. *বুখারি*, কিতাব : বিবাহ, বাব : মান কালা লা নিকাহা ইল্লা বি-ওয়ালিয়্যিন, হাদিস নং ৪৮৩৪; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২২৭২।

৮২. *বুখারি*, কিতাব : আত-তাফসির, বাব : তাফসিরু সুরাতিত তালাক, হাদিস নং ৪৬২৯; *মুসলিম*, কিতাব : তালাক, বাব : ইলা ও ইতিযালুন নিসা ওয়া তাখইরিহিন্না, হাদিস নং ১৪৭৯।

পেত। সে তার পিতার অন্যান্য সম্পদের মতো স্ত্রীকেও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ মনে করত।[৮৩]

মেয়েদের প্রতি আরবদের ঘৃণা এই পর্যায়ে পৌছেছিল যে তারা মেয়েদের জীবন্ত পুঁতে ফেলতে শুরু করল। মেয়েদের পুঁতে ফেলা ছিল জাহিলি যুগের সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য প্রথা। আরবের কোনো কন্যাসন্তান যদি মাটির গর্ভে প্রোথিত হওয়া থেকে কোনোক্রমে বেঁচে যেত, তবে তাকে এক অন্ধকারপূর্ণ দুর্বিষহ জীবনের অপেক্ষায় থাকতে হতো। আল-কুরআনুল কারিম এই অবস্থাকে বর্ণনা করেছে এভাবে,

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ○ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

তাদের কাউকে যখন কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয় তার গ্লানির কারণে সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপনে চলে যায়। সে চিন্তা করে, হীনতাসত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা অতি নিকৃষ্ট![৮৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে জাযিরাতুল আরবের পরিস্থিতি এমনই ছিল।

---

[৮৩]. ড. মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইসমাইল আল-মুকাদ্দাম, *আল-মারআতু বায়না তাকরিমিল ইসলাম ওয়া ইহানাতুল জাহিলিয়্যা*, পৃ. ৫৭।

[৮৪]. সুরা নাহল : আয়াত ৫৮-৫৯।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

একনজরে ইসলামপূর্ব বিশ্ব

আমরা ইসলামপূর্ব বিশ্বের কয়েকটি বৃহৎ সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছি। এখন আমরা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে বিশ্ব, মানবমণ্ডলী ও মানবতার কী অবস্থা ছিল তার প্রতি সাধারণভাবে দৃষ্টিপাত করব। তার থেকে যে সারমর্ম আমরা পাই তা এই যে, স্তূপীকৃত গভীর অমানিশা চূর্ণবিচূর্ণ করার এবং মানবতার স্কন্ধমূলে আটকে পড়া যন্ত্রণা-দুর্দশাকে দূরীভূত করার জন্য ইসলামের আলো ও ইসলামি সভ্যতার প্রয়োজন প্রকট ছিল।

ইসলামপূর্ব বিশ্বের মোটামুটি অবস্থার প্রতি সাধারণভাবে দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস উদ্ধৃত করছি। ইয়ায ইবনে হিমার রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

> আল্লাহ তাআলা জমিনের মানবমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, তখন (তাদের চরম পথভ্রষ্টতার কারণে) কতিপয় আহলে কিতাব ব্যতীত আরব ও অনারব সকলের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।[৮৫]

মানুষের অবস্থা অধঃপতনের এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তা তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার ঘৃণা ও ক্রোধকে আবশ্যক করে তুলেছিল। হাদিসে ব্যবহৃত (مقت) 'মাক্ত' শব্দটি প্রচণ্ড ঘৃণা বোঝায়। কতিপয় আহলে কিতাবের কথা বলতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক (بقايا) 'বাকায়া' শব্দের ব্যবহার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত

---

৮৫. *মুসলিম*, কিতাব : আল-জান্নাহ ওয়া সিফাতু নাইমিহা ওয়া আহলিহা, হাদিস নং ২৮৬৫।

করে। যেন তারা বহু প্রাচীন যুগের নিদর্শন, বাস্তবিক মানবমণ্ডলীর মধ্যে তাদের কোনো মূল্য নেই। অন্যদিকে এই কতিপয় আহলে কিতাব কখনোই পরিপূর্ণ সমাজ গঠন করতে পারেননি, বরং তারা সমাজের মুষ্টিমেয় সদস্য বলেই গণ্য ছিলেন।

সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীর বুকে না ছিল কোনো বোধসম্পন্ন বিবেকবান জাতি, না ছিল নীতিনৈতিকতা ও মর্যাদাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো সমাজ। দয়া ও ইনসাফের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো শাসনব্যবস্থা ছিল না, জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান শাসকও ছিল না, নেতাও ছিল না। আর নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) আনীত বিশুদ্ধ ধর্ম একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল।[৮৬]

গোটা মানববিশ্বে পরিবেশ-পরিস্থিতি ছিল নষ্ট-ভ্রষ্ট, অধঃপতিত, বিনাশ-কবলিত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়—জীবনের সব দিকে, সব ক্ষেত্রে সমানভাবে ফ্যাসাদ ও গোলযোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। দুনিয়াকে গ্রাস করেছিল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, মূর্খতা ও অজ্ঞতা দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল, যা দুনিয়াকে কুসংস্কার, অলিক ধ্যানধারণার সংঘর্ষপূর্ণ সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছিল। মানুষের কুপ্রবৃত্তি ও রিপুই ছিল দুনিয়ার পরিচালক। তাই মানুষ পাথরের, সূর্যের, চন্দ্রের, আগুনের, এমনকি পশুর পূজা করত। গোটা মানবগোষ্ঠী বিভক্ত হয়ে পড়েছিল দুইভাগে, শাসক শ্রেণি ও দাস শ্রেণি। তারা এতিম ও অসহায়দের সম্পদ আত্মসাৎ করত, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করত। তাদের পারস্পরিক লেনদেনই ছিল হানাহানি, লুণ্ঠন, ছিনতাই, রাহাজানি। শুধু তাই নয়, অপরাধ, পাপাচার ও গর্হিত কাজ করে তারা গৌরববোধ করত। তাদের নিয়ন্ত্রণ করার মতো নিয়মনীতি বা আইন ছিল না, ছিল কেবল মাৎস্যন্যায়, পাশবিক স্বেচ্ছাচারিতা এবং জোর যার মুল্লুক তার নীতি। শক্তিমানরা দুর্বলদের শোষণ ও উৎপীড়ন করত, ধনীরা গরিবদের দাস

---

৮৬. সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ., *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৯১।

বানিয়ে রাখত। সবাই বন্দি ছিল দুর্ভেদ্য অন্ধকারে, যার কোনো শেষ ছিল না, যেখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথ ছিল না।

এসব পরিস্থিতি মানবমণ্ডলীকে উদ্‌ভ্রান্ত, হতাশ, রিক্ত-নিঃস্ব বানিয়ে দিয়েছিল। তাদের অন্তরে ভীতি ও আশঙ্কা ছাড়া কিছুই ছিল না। তাদের জ্ঞান ও চিন্তায় ছিল কেবল শূন্যতা, অলিক জল্পনাকল্পনা। ইসলামি সভ্যতার পূর্বে এটাই ছিল বিশ্বের মানবমণ্ডলীর অবস্থা!

ইসলামপূর্ব বিশ্বে এটাই ছিল অবস্থা, বিশেষ করে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। বিশ্বসভ্যতাগুলো গুটিয়ে গিয়েছিল। সবকিছু ছিল অরাজকতার ধসোন্মুখ কিনারায়।

অধ্যাপক ডেনিসন এই অবস্থার চিত্রায়ণ করেছেন এভাবে,

> খ্রিষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সভ্য পৃথিবী ছিল অরাজকতার ধসোন্মুখ কিনারায়, কারণ যেসব বিশ্বাস সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সহায়ক ছিল সেগুলোর বিনাশ ঘটে। এসব বিশ্বাসের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো উপযোগী কিছুই ছিল না। চারহাজার বছরের চেষ্টার ফলে যে বৃহৎ নগর-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে পড়ার উপক্রম ছিল। মানবতা যে বর্বরতা ও অসভ্যতা থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেদিকেই ফিরে যেতে চাইছিল। গোত্রগুলো পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করছিল, রক্তপাত ঘটাচ্ছিল। কোনো আইন ছিল না, কোনো শৃঙ্খলা ছিল না। খ্রিষ্টীয় মতবাদের ফলে যেসব শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল সেগুলো ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার বদলে বিচ্ছিন্নতা ও ভাঙনের আগুনে ঘি ঢালছিল। ফলে যে সভ্যতা বিপুল ডালপালাসমৃদ্ধ বিশাল বৃক্ষের মতো ছিল, যার ছায়া ছড়িয়ে ছিল গোটা বিশ্বের ওপর তা শীর্ণকায় হয়ে হেলছিল। এতে তার দিকে ধেয়ে আসে ধ্বংস, এমনকি তার মজ্জাটুকুও শেষ হয়ে যায়।[৮৭]

ইসলামি সভ্যতার উষার উন্মেষ ও আলো ছড়িয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত এরূপ অবস্থাই বিরাজমান ছিল। ইসলামি সভ্যতা মানবতার একটি উপহার, মনুষ্যকুলের জন্য পথনির্দেশনা।

---

৮৭. জন হপকিন্স ডেনিসন, *Emotion as the Basis of Civilization*; আহমাদ শালবি, *মাওসুআতুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, খ. ৬, পৃ. ৩৬-৩৭।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতার মূলনীতি ও ভিত্তি

ইসলামের আবির্ভাব ছিল একটি আলোকবর্তিকাস্বরূপ। তা দূরীভূত করেছিল মুমূর্ষু পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করা রাতের তিমির এবং নতুন পৃথিবীর সূচনা। তা ছিল ইসলামি সভ্যতার পৃথিবী। এভাবেই শুরু হয়েছিল ইসলামের সূচনার দিনগুলো, যা গোটা পৃথিবীর জন্য আলোকিত করে তুলছিল জীবনের মাইলফলক। পরিবর্তন করছিল চিন্তা, রাজনীতি, আইন ও শাসন, সমাজ ও অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ। এই সভ্যতা ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয়ভাবে, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এবং বিকাশ ও উৎকর্ষে ইসলামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল ।

এটি কতিপয় অনন্য মূলনীতি থেকে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কতিপয় মৌলিক ভিত্তির ওপর, পরিপুষ্ট হয়েছে সমৃদ্ধ উৎসসমূহের সহায়তায়। এর প্রত্যেকটিরই এই সভ্যতার বিকাশ, অনন্যতা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে। অন্যান্য জাতির সভ্যতা থেকে ইসলামি সভ্যতাকে উপাদানের দিক থেকে ভিন্ন, স্পষ্ট বিপরীতধর্মী করে তোলার ক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব রয়েছে। গুস্তাভ লি বোঁ[৮৮] এই বক্তব্যের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন,

> আরবজাতি দ্রুততম সময়ে নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। পূর্বে যত সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল সেগুলোর সঙ্গে এই সভ্যতার অনেক বিপরীতধর্মিতা রয়েছে।[৮৯]

---

৮৮. গুস্তাভ লি বোঁ (Gustave Le Bon 1841-1931) : ফরাসি প্রাচ্যবিদ। মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ হলো : *The World of Islamic Civilization* (1974)।-অনুবাদক

৮৯. গুস্তাভ লি বোঁ, *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ., ১৫৩।

নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহে উপর্যুক্ত মূলনীতি ও ভিত্তি সম্পর্কে আমরা জানতে পারব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : আল-কুরআন ও সুন্নাহ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামি জাতি-গোষ্ঠী

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : অন্য জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি উদারপন্থা অবলম্বন

প্রথম অনুচ্ছেদ

আল-কুরআন ও সুন্নাহ

কুরআনুল কারিম এবং নবীর পবিত্র সুন্নাহকে সাধারণভাবে ইসলামি সভ্যতার দুটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বিবেচনা করা হয়। এ দুটি ইসলামি সভ্যতার ভিত্তিগত মূলনীতি।

আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার মহিমান্বিত কিতাব, যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ কিতাব সম্পর্কে বলেছেন,

﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾

> এই কিতাব প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞের পক্ষ থেকে, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত।[১০]

এই কিতাবের উদাহরণগুলো ও নির্দেশগুলো যে অনুধাবন করতে পারে তার জন্য শিক্ষাপূর্ণ ও পথপ্রদর্শকরূপে পর্যবসিত হয়। তাতে আল্লাহ তাআলা আবশ্যক বিধিবিধান বিবৃত করেছেন, হালাল ও হারামের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করে দিয়েছেন, অনুধাবনের জন্য উপদেশমালা ও ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাতে তিনি উদাহরণ পেশ করেছেন এবং অদৃশ্যের সংবাদ পরিবেশন করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾

কিতাবে (কুরআনে) আমি কোনোকিছুই বাদ দিইনি।[১১],[১২]

আল-কুরআন ইসলামি সমাজের সংবিধান। কুরআন প্রতিটি বড় ও ছোট বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে, মানবজাতির জন্য যা-কিছুতে কল্যাণ ও সৌভাগ্য

---

১০. সুরা হুদ : আয়াত ১।

১১. সুরা আনআম : আয়াত ৩৮।

১২. কুরতুবি, *আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১, পৃ. ১।

রয়েছে তা নিয়ে এসেছে। কুরআন মানবজাতির জন্য যা-কিছু বিধিবদ্ধ করেছে তা দ্ব্যর্থহীন ও ব্যাপক এবং প্রতিটি স্থান ও কালের জন্য উপযুক্ত।[১৩]

আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন তাঁর দিক-নির্দেশনা দ্বারা জীবন ও মানবতার পথচলাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। কুরআনেই ইসলামি সভ্যতার রহস্য ও তার বিশালতা নিহিত রয়েছে। তা আল্লাহর কিতাব যা ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (হেদায়েত করে সেই পথের দিকে যা সুদৃঢ়।)[১৪] অর্থাৎ, মানুষকে এমন পথে পরিচালিত করে যা অন্যসকল পথ থেকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও যথার্থ। তা আল্লাহর এমন কিতাব যা ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না—অগ্র থেকেও নয়, পশ্চাৎ থেকেও নয়। তা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ।)[১৫] তা মানবজাতির জন্য আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, জ্ঞানগত, চিন্তাগত, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর। কুরআনের শিক্ষাতেই রয়েছে মানুষের সৌভাগ্য।

আল-কুরআনের অন্তর্গত সামগ্রিক নীতি ও বিভিন্ন বিধিবিধান আত্মার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, প্রতিপালকের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে সমাজের ও অন্য মানুষের সম্পর্ককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে। কুরআন আহ্বান জানিয়েছে একত্ববাদের প্রতি, স্বাধীনতার প্রতি, ভ্রাতৃত্ব ও সমতার প্রতি। একইভাবে কুরআন পারস্পরিক লেনদেন ও আচার-আচরণ শৃঙ্খলিত করেছে, সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করেছে মজবুত ভিত্তিসমূহের ওপর যা সমাজের জন্য নিরাপত্তা, প্রাচুর্য ও সৌভাগ্য নিশ্চিত করে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশে কুরআনের যা-কিছু সংক্ষিপ্ত তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, যা-কিছু জটিল তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যা-কিছু সম্ভাবনাপূর্ণ তা সুনিশ্চিত

---

১৩. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ৩৭।
১৪. সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৯।
১৫. সুরা হা মিম আস-সাজদা : আয়াত ৪২।

করেছেন। তা এ কারণে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি যেন কুরআনের সঙ্গে বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় এবং তাঁর প্রতি দায়িত্বপ্রদানের মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

> এবং আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে।[১৬]

সুতরাং আল্লাহর কিতাব হলো মূল এবং রাসুলের সুন্নাহ হলো তার ব্যাখ্যা।[১৭]

ইসলামি সভ্যতার ভিত্তিসমূহ ও মূলনীতিসমূহের দ্বিতীয়টি হলো রাসুলের পবিত্র সুন্নাহ যা আল-কুরআনের পরে ইসলামের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন এমন সংবিধান যাতে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও আইনকানুন তথা ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস, আমল-ইবাদত, আখলাক ও শিষ্টাচার, লেনদেন এবং আদবকায়দা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুন্নাহ হলো এ সকল ক্ষেত্রে কুরআনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং কর্মে বাস্তবায়ন।

ইসলামি শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে এর বাস্তবায়ন ও উম্মাহকে এর ওপর পরিচালনার ক্ষেত্রে রাসুলের বিস্তারিত কর্মপদ্ধতিই হলো সুন্নাহ। তা মূর্ত হয়ে উঠেছে আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে,

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

> আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে

---

১৬. সুরা নাহল : আয়াত ৪৪।
১৭. কুরতুবি, *আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১, পৃ. ২।

> পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।[৯৮]

তা রূপ লাভ করেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায়, কাজে ও অনুমোদনে।[৯৯]

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সম্বোধন করে বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾

> রাসুল তোমাদের যা দেন (যা-কিছুর নির্দেশ দেন) তা তোমরা গ্রহণ করো (পালন করো) এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।[১০০]

সুতরাং সুন্নাহ হলো কুরআনের পরিপূরক ও কুরআনের ব্যাখ্যা। ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা রাসুলের হাদিস আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। একবার এক লোক বলল, এগুলো থেকে আমাদের মুক্তি দিন এবং আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব নিয়ে আসুন। তখন ইমরান ইবনে হুসাইন রা. তাকে বললেন, 'তুমি একটা নির্বোধ। তুমি কি আল্লাহর কিতাবে নামায বিস্তারিতরূপে পাবে? তুমি কি আল্লাহর কিতাবে রোযা বিস্তারিতরূপে পাবে? কুরআন এগুলো বিধিবদ্ধ করেছে এবং সুন্নাহ এগুলোর সবিস্তার ব্যাখ্যা দিয়েছে।'[১০১]

ঐশী প্রত্যাদেশ থেকে প্রাপ্ত এই দুটি উৎস একটি অভিজাত আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ করেছে। মানবজাতি এর কোনো নমুনা দেখেনি, যেমনটি আমরা দেখব এই কিতাবের যেকোনো এক অধ্যায়ে। আরবদের ইসলামপূর্ব অবস্থা ও ইসলাম-পরবর্তী অবস্থার প্রতি যিনি দৃষ্টিপাত করবেন এবং দুটি অবস্থাকে তুলনামূলকভাবে বিচার করবেন তিনি খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে যে দ্বীন নিয়ে এসেছিলেন তা-ই একমাত্র অভিনব বিষয় ছিল যা তাদের মহান করেছিল। এই দ্বীনই তাদের চরিত্রকে মেরামত করেছিল,

---

৯৮. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪।

৯৯. ড. ইউসুফ কারযাবি, *মাদখাল লি-মারিফাতিল ইসলাম*, অধ্যায় : القرآن والسنة مصدرا الإسلام।

১০০. সুরা হাশর : আয়াত ৭।

১০১. জালালুদ্দিন সুয়ুতি, *মিফতাহুল জান্নাহ*, পৃ. ৫৯; সামআনি, *আদাবুল ইমলা ওয়াল-ইসতিমলা*, পৃ. ১০।

তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছিল, তাদের একই কালিমাতলে একত্র করেছিল, তাদের সমাজ সংস্কার করেছিল, তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। এই দ্বীনের ফলে তারা একটি মূর্খ জাতি থেকে শিক্ষিত, বিভ্রান্ত জাতি থেকে সুপথপ্রাপ্ত এবং একটি অপরিচিত জাতি থেকে বিখ্যাত জাতিতে পরিণত হয়েছে।[১০২]

কুরআনুল কারিম ও নবীর পবিত্র সুন্নাহই যেহেতু জ্ঞান ও বিশ্বাস, আখলাক ও শিষ্টাচার, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং ইসলামি সভ্যতার অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও অনুশাসন জারি করে ইসলামের সভ্যতাকে বিনির্মাণ করেছে, সুতরাং এ দুটির মধ্য থেকেই মানুষের এবং সমগ্র মানবসমাজের সৌভাগ্য উৎসারিত হয়।

---

১০২. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ৬১।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ইসলামি জাতি-গোষ্ঠী

ইসলাম স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে সকল জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্ব মানবসংহতি ঘোষণা করেছে। তা সত্য, কল্যাণ ও সৌজন্যবোধের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

> হে মানুষ, তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকি।[১০৩]

এ কারণেই ইসলাম ইসলামি বিজয়গুলোর পর বিভিন্ন মুসলিম জাতির মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছে, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বংশধারার মধ্যে মিলন সৃষ্টি করেছে। প্রতিটি জাতি ও গোষ্ঠীর সভ্যতার ঐতিহ্য ছিল, জ্ঞানগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। আর এগুলো ছিল একটি অনন্য সভ্যতা নির্মাণের কার্যকারণ, যেখানে মানবিক ও স্বভাবগত শক্তি ও প্রতিভার বৈচিত্র্য ছিল। আর মুসলিম জাতি-গোষ্ঠী ও বংশের জ্ঞানগত সাংস্কৃতিক মানবিক শক্তি ও প্রতিভার বৈচিত্র্যের সমন্বিত রূপই হলো ইসলামি সভ্যতা।

শাস্ত্রীয়, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানগত যে বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা, যা উপভোগ করছিল ইসলামি বিশ্বের পারসিক ও তুর্কির মতো কিছু জাতি, তা ইসলামি সভ্যতা বিনির্মাণে যুগপৎ সাহায্য করেছে এবং এক উৎকর্ষপূর্ণ বিশাল

---

১০৩. সুরা হুজুরাত : আয়াত ১৩।

মানবসভ্যতা নির্মাণে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। এ কারণে ইসলামি বিশ্বের জাতি-গোষ্ঠীর বিচিত্রতা ও বহুরূপতা ইসলামি সভ্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি এবং সমৃদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিরূপে বিবেচিত হয়।

আমরা উদাহরণ হিসেবে পারস্যসাম্রাজ্যের কথা আলোচনা করতে পারি। আল্লাহ তাআলা যখন তা মুসলিমদের জন্য বিজিত করলেন, মুসলিমদের সঙ্গে পারস্যবাসীর সংমিশ্রণ ঘটল। তারা মুসলিমদের থেকে ইসলামধর্মের সৌন্দর্য, সৌজন্য ও মহানুভবতার অনেককিছু শিখল। তারা জানল যে ইসলাম হলো ভ্রাতৃত্ব, সমতা, ভালোবাসা, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহানুভূতি এবং একে অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার ধর্ম। ফলে তারা আল্লাহর দ্বীন ইসলামে দলে দলে প্রবেশ করল। আরবি ভাষা শিক্ষা ও এ ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠল। কারণ আরবি ভাষা তাদের ধর্মের ভাষা, যে ধর্মকে তারা ভালোবেসেছে, আলিঙ্গন করেছে। আরবি ভাষা তাদেরকে এই ধর্ম বুঝতে ও অনুধাবন করতে সাহায্য করেছে।[১০৪]

এই ধর্ম ও তার ভাষার প্রতি তাদের ভালোবাসা এই দুটির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে তাদেরকে উৎসাহিত করেছে। ফলে অনতিকাল পরেই তারা জ্ঞান-আন্দোলন ও গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে, বরং এ দুটির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে। ইসলামি সভ্যতা তা থেকে পর্যাপ্ত উপকার লাভ করেছে। যেমন :

এক. ইসলামি সভ্যতার কতিপয় দিক ব্যক্ত করার জন্য কিছু শব্দ রয়েছে। তার সমার্থক শব্দ আরবি ভাষায় ছিল না। তখন ওই শব্দগুলোকেই আরবি ভাষায় আত্তীকরণ করা হয়। ফলে শব্দগুলো আরবি ভাষার শরীরে প্রবেশ করে। এর মধ্যে রয়েছে দিওয়ান (ديوان) ও বিমারিস্তান (بيمارستان) তথা, দফতর ও হাসপাতাল।

দুই. আরবি ভাষাজ্ঞান ও ইসলামি জ্ঞানের ময়দানে পারস্য থেকে বহু ক্ষণজন্মা প্রতিভা ও মনীষার জন্ম হয়েছে। হাদিসশাস্ত্রে শিখরে পৌছেছেন হাসান বসরি রহ., মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন রহ., আবু আবদুল্লাহ বুখারি রহ. প্রমুখ। হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।

---

১০৪. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ৬৭।

ফিকহশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন দুই ইমাম, ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম লাইস ইবনে সাদ রহ.। তারা দুইজন এবং তাদের মতো আরও যারা রয়েছেন তাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। সাহিত্যে দক্ষতা ও উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন আবদুল হামিদ আল-কাতিব এবং ইবনুল মুকাফফা প্রমুখ। কবিতায় বাশশার ইবনে বুরদ ও আবু নুওয়াস প্রমুখ। এ সকল কবি ও সাহিত্যিক কাব্য ও গদ্যে নতুন আঙ্গিক ও শৈলী, অভিব্যক্তি এবং প্রভূত কল্পনা ও চিন্তার বিস্তার ঘটিয়েছেন। আব্বাসি যুগে ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞানচর্চা ও গ্রন্থরচনার বিপ্লব ঘটেছে। একইভাবে ভিনদেশি ভাষা থেকে অজস্র গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

পারসিক দেশগুলোর জাতি-গোষ্ঠীর অবদানের মতো প্রাচ্যীয় সভ্য জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে ভারতীয় ও অন্যদের অবদানও রয়েছে ইসলামি সভ্যতায়। তা-ও জ্ঞানগত বিপ্লবের পথ ধরেই এসেছে।[১০৫]

উল্লেখ্য যে, এ সকল নতুন ইসলামি জাতি-গোষ্ঠীর সন্তানদের বিকাশ, উৎকর্ষ ও অবদান কেবল ধর্মীয় জ্ঞান ও আরবি ভাষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তারা উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন এবং শিখর স্পর্শ করেছিলেন। যেমন চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বীজগণিত, প্রকৌশল ইত্যাদি। যা ইসলামি সভ্যতার বিনির্মাণ ও গঠনে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে এবং ইসলামি সভ্যতাকে অভাবিতরূপে সমৃদ্ধ করেছে। এ সকল জ্ঞানী মনীষীদের মধ্যে রয়েছেন আল-খাওয়ারিজমি, ইবনে সিনা ও আল-বিরুনি।

ইমাম যুহরি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিশাম ইবনে আবদুল মালিক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মক্কার নেতৃত্ব দেন কে? আমি বললাম, আতা ইবনে রাবাহ। তিনি বললেন, আর ইয়ামেনে কে? আমি বললাম, তাউস ইবনে কায়সান। তিনি বললেন, শামবাসীদের মধ্যে কে? আমি বললাম, মাকহুল। তিনি বললেন, আর মিশরবাসীদের মধ্যে কে? আমি বললাম, ইয়াযিদ ইবনে আবু হাবিব। তিনি বললেন, জাযিরাতুল আরবের বাসিন্দাদের মধ্যে কে? আমি বললাম, মাইমুন ইবনে মিহরান। তিনি বললেন, খুরাসানবাসীদের মধ্যে কে? আমি বললাম, দাহহাক ইবনে মুযাহিম। তিনি বললেন, আর বসরায় কে? আমি বললাম, হাসান ইবনে

---

১০৫. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ৬৭, ৬৮।

আবুল হাসান (হাসান বসরি)। তিনি বললেন, কুফায় কে নেতৃত্ব দেন? আমি বললাম, ইবরাহিম নাখয়ি।

ইমাম যুহরি উল্লেখ করেছেন যে, হিশাম ইবনে আবদুল মালিক প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞেস করেছেন, তিনি কি আরব না আযাদকৃত দাস? তিনি বলেছেন, তারা সবাই আযাদকৃত দাস। কথোপকথন শেষ হলে হিশাম বললেন, হে যুহরি, আল্লাহর কসম! আযাদকৃত দাসেরা আরবদের ওপর নেতৃত্ব দিচ্ছে। এমনকি তারা মিম্বরে বসে আরবদের উদ্দেশে বক্তৃতা করে, আর আরবরা নিচে বসে থাকে। ইমাম যুহরি বলেন, আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনিন! তা হলো আল্লাহর হুকুম ও তাঁর দ্বীন। যারা তাঁর হুকুম ও দ্বীনের হেফাজত করবে তারা নেতৃত্ব দেবে এবং যারা বিনষ্ট করবে তাদের পতন ঘটবে।

ইসলামি সভ্যতা হলো ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন জাতি অর্থাৎ পারসিক, রোমান, গ্রিক, ভারতীয়, তুর্কি, স্প্যানিশ জাতির সম্মিলিত ফসল। তারা ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল এবং তাদের ভূমিকা পালন করে এই বিশাল অবয়বের জন্য শক্তির উৎস নির্মাণ করেছিল। তারা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বিস্তার ঘটিয়েছিল, যা ছিলো মুসলিম উম্মাহ ও তার সভ্যতা এবং মুসলিম উম্মাহর বিপুল বিস্তৃত ইতিহাসের উত্তরাধিকার।

প্রত্যেক সভ্যতা একটিমাত্র জাতি ও একটিমাত্র মানবগোষ্ঠীর প্রতিভাবান সন্তানদের নিয়ে গর্ব করতে পেরেছে। ইসলামি সভ্যতার কথা ভিন্ন। যে-সকল জাতি ও গোষ্ঠীর ওপর ইসলামের পতাকা উড়েছে তাদের যে-সকল প্রতিভাবান ইসলামি সভ্যতার অট্টালিকাকে নির্মাণ করেছে তাদের সবাইকে নিয়ে মুসলিম উম্মাহ গর্ব করে। এখানে পারসিকদের পাশে আরবরা অবস্থান করেছে। একদিকে আমরা পাই ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালিক রহ., ইমাম শাফিয়ি রহ., ইমাম আহমাদ রহ. (চার ফিকহি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাগণ)-কে, অন্যদিকে পাই খলিল ও সিবওয়াইহ (ভাষার স্থপতিগণ) এবং আরও অনেককে, যাদের জাতিসত্তা ভিন্ন, দেশ ভিন্ন। তাদের পরিচয় একটাই, তারা মুসলিম মনীষী। তাদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই মানবজাতি পেয়েছে ইসলামি সভ্যতা, যা মানুষের বিশুদ্ধ চিন্তার শ্রেষ্ঠ ফসল।[১০৬]

---

১০৬. মুস্তফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৩৬, ৩৭ (কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে)।

এমনই ইসলামি সভ্যতার স্বভাব ও প্রকৃতি, যা এক অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। তা জ্ঞান ও মহানুভবতার দ্বারা পৃথিবী আলোকিত করেছে। ইসলামি সভ্যতার ছায়ায় যারা বসবাস করে তাদের সবাইকে তা আপন করে নিয়েছে, ফলে তাদের প্রত্যেকেই ইসলামি সভ্যতাকে নতুন নতুন দিক থেকে উপকৃত করেছে এবং তাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছে।
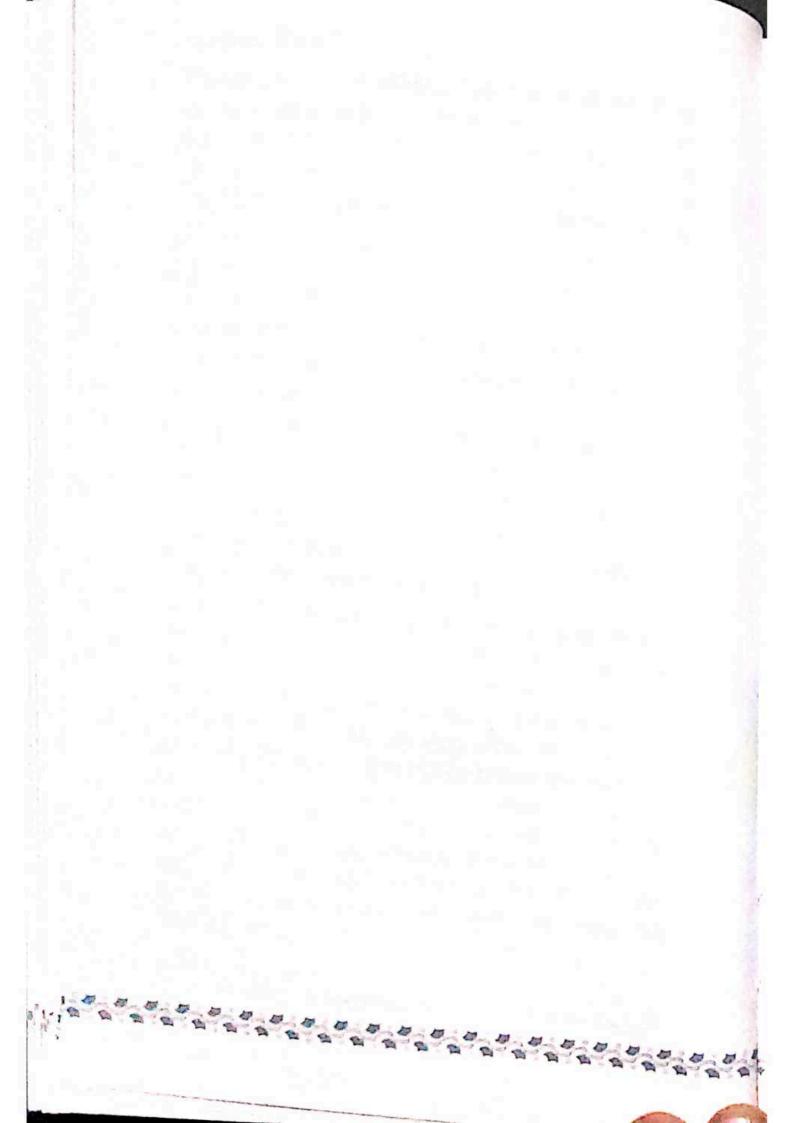
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

অন্য জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি উদারপন্থা অবলম্বন

বিশ্বের যে-সকল জাতি-গোষ্ঠী ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল তারা ছিল মানবসভ্যতার সমৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ও উপাদান। একইভাবে অতীত যুগের জাতিগুলোর নির্মিত সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তা থেকে উপকার লাভের ক্ষেত্রে মুসলিমদের উদারপন্থা গ্রহণও ছিল ইসলামি সভ্যতা ও তার বিপ্লবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ও সহায়ক।

মানবেতিহাসে প্রথমবারের মতো মুসলিমগণই অন্যান্য সভ্যতার প্রতি উদারপন্থা গ্রহণ এবং পূর্ববর্তী মানবমণ্ডলীর প্রচেষ্টাফল থেকে ঋণ গ্রহণের নীতিমালাগুলোর বাস্তবিক প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন এই উদারনীতির প্রবক্তা। এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংকীর্ণতামুক্ত, পক্ষপাতিত্বহীন। তিনি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-কে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য হারিস ইবনে কালাদাহ আস-সাকাফির কাছে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা ছিল কত চমৎকার! তিনি ছিলেন একজন মুশরিক ডাক্তার। এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো দোষ মনে করেননি। কারণ চিকিৎসা একটি জীবনমুখী জ্ঞান, যা গোটা মনুষ্যজাতির উত্তরাধিকার। সাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার শুশ্রূষার জন্য এলেন। তিনি আমার বুকের ওপর তাঁর হাত রাখলেন। এমনকি আমার হৃৎপিণ্ডে তাঁর হাতের শীতলতা অনুভব করলাম। তারপর তিনি বললেন,

«إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْئُودٌ ائْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ»

তুমি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত। তুমি সাকিফ গোত্রের হারিস ইবনে কালাদাহর কাছে যাও। সে একজন চিকিৎসক। (পরে আবার বললেন,) সে যেন মদিনার সাতটি আজওয়া খেজুর বিচিসহ পিষে তোমার মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়।[১০৭]

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়দ ইবনে সাবিত রা.-কে সুরয়ানি ভাষা (Syriac language) শেখার জন্য যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা কত চমৎকার! তিনি ষাট দিনে সুরয়ানি ভাষা শিখেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ফারসি ও রোমান (লাতিন) ভাষাও শিখেছিলেন।

এই ধারা পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের ইতিহাসে স্পষ্টভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের দায়িত্ব ছিল পৃথিবীর পূর্বে ও পশ্চিমে ইসলামের পয়গাম পৌঁছে দেওয়া। তাই তারা এই পয়গাম ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জাযিরাতুল আরব থেকে বেরিয়ে বিপুল বিশ্বের অভিমুখে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাদের সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটেছিল নতুন নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে। তারা সেসব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেননি বা বিলোপ ঘটাননি। বরং সেগুলোর পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং উপকারিতা লাভ করেছেন। যা কল্যাণকর ছিল এবং তাদের সত্য দ্বীনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল তা গ্রহণ করেছিলেন। একটা সময় ছিল যখন গ্রিক সভ্যতা তার সন্তানদের ছাড়া অন্যকাউকে কিছু শিক্ষা দেয়নি এবং গ্রিক জ্ঞানী-মনীষী ছাড়া অন্যকারও থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। পারসিক, ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতাও ছিল অনুরূপ। সম্ভবত কিছুকাল পর্যন্ত এসব সভ্যতার ক্ষেত্রে এই অবস্থা অবশিষ্ট ছিল। যেমন চৈনিক ও ভারতীয় সভ্যতা।

তবে মুসলিমগণ খুব দ্রুতই অন্যদের জ্ঞান ও চিন্তারাশি ভাষান্তরিত করার আন্দোলন সূচিত করেন। খালিদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়া আল-

---

[১০৭]. হাদিসটি থেকে প্রথমত এটা প্রমাণিত হয় যে, রোগের চিকিৎসা করা বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। যদিও সে অমুসলিম হয়। কারণ, হারিস ইবনে কালাদাহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কি না তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা নেই। দ্বিতীয়ত চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দান করে নিজেই তার ওষুধ নির্ণয় করেছেন। আর অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, এটাও এক প্রকারের মহৌষধ। তবে পদ্ধতিগতভাবে প্রস্তুত করা চিকিৎসকের কাজ।-অনুবাদক
সুনানে আবু দাউদ, কিতাব : চিকিৎসা, বাব : তামারাতুল আজওয়া : ৩৮৭৫। ইবনে হাজার আসকালানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। *হেদায়াতুর রুওয়াত*, খ. ৪, পৃ. ১৫৯। আবদুল হক আল-ইশবিলি *আল-আহকামুস সুগরা* গ্রন্থের ভূমিকাতে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, হাদিসটির সনদ সহিহ। *আল-আহকামুস সুগরা*, পৃ. ৮৩৭।

উমাবি[১০৮] ছিলেন এই আন্দোলনের অগ্রপথিক। তিনি গ্রিক জ্ঞান ও চিন্তা আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করার কাজ শুরু করেন। এ সকল জ্ঞান ও তাদের বিকশিত ধারা থেকে উপকৃত হন। বিশেষ করে ওষুধশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও রসায়নশাস্ত্র-সংক্রান্ত সমীকরণের জ্ঞান লাভ করেন।

উমাইয়া খেলাফত স্থায়িত্ব লাভ করল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করল। পারসিক ও রোমান রাজ্যগুলোর পতনের পর অনারবদের জ্ঞানের উত্তরাধিকার লাভ করল। তারপর মনোযোগ চিন্তার আন্দোলনের প্রতি নিবদ্ধ হলো। ফলে গ্রিক ও পারসিক সভ্যতাসহ পূর্ববর্তী সভ্যতাসমূহের বিপুল গ্রন্থ ও জ্ঞানভান্ডার আরবি ভাষায় রূপান্তরিত হলো। সভ্যতার প্রেক্ষিত বিবেচনায় তা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কারণ তা বিশাল বাতায়ন খুলে দিয়েছিল, যার মধ্য দিয়ে আরব ও মুসলিম জ্ঞানানুরাগীগণ প্রথমবারের মতো বাইরের জগতের জ্ঞানবিজ্ঞানের দিকে চোখ মেলে তাকান।

ভাষান্তরিত জ্ঞানরাশির মধ্যে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বিশেষ সমাদর লাভ করে। এগুলোর শীর্ষস্থানে ছিল চিকিৎসাশাস্ত্র। এই যুগবিভাজনের আগে ইসলামি চিকিৎসাশাস্ত্র নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা ও ভেষজ ওষুধের ওপর নির্ভরশীল ছিল। যেমন সেঁক দেওয়া, রক্তমোক্ষণ (bloodletting) করা, শিঙা লাগানো, খতনা করা ও ছোট-বড় অস্ত্রোপচার করা। মুসলিম ও আরব চিকিৎসকগণ আলেকজান্দ্রিয়া মাদরাসা ও জুনদাইসাপুর[১০৯] মাদরাসার পাঠ্যসূচির সাহায্যে গ্রিক চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং এর ফলে চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করার কাজে ব্রতী হলেন।[১১০] এই ক্ষেত্রে সে সময়ে তথা খলিফা মারওয়ান বিন হাকামের শাসনামলে (৬৪-৬৫ হিজরিতে) শ্রেষ্ঠ অনুবাদক ছিলেন মাসারজাওয়াইহ

---

১০৮. খালিদ ইবনে ইয়াযিদ : আবু হাশিম খালিদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান আল-উমাবি আল-কুরাশি। জ্ঞানশাস্ত্রের ক্ষেত্রে কুরাইশ বংশের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন। তার ওষুধ ও কিমিয়া প্রস্তুতপ্রণালি-সংক্রান্ত বক্তব্য ও মতামত গুরুত্ব বহন করে। তিনি ৯০ হিজরিতে (৭০৮ খ্রিষ্টাব্দে) দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত*, খ. ১৩, পৃ. ১৬৪-১৬৬।

১০৯. খুরাসানের একটি শহর।

১১০. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রুউওয়াদু ইলমিত তিব্ব ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাতি ওয়াল-ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৬৮।

(Masarjawaih)। তিনি ছিলেন ইহুদি ধর্মাবলম্বী এবং খলিফা মারওয়ান ইবনে হাকামের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। তিনি *আল-কুন্নাশ* (الكناش) নামে একটি গ্রিক চিকিৎসা বিশ্বকোষ আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন।[১১১]

আব্বাসি খিলাফতকালে, বিশেষ করে পঞ্চম খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে (১৭০-১৯৪ হিজরি) অনুবাদ-কর্মকাণ্ড বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তিনি বাইতুল হিকমাহ নামে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিকট প্রাচ্য ও কনস্টান্টিনোপল থেকে আরবি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থসমূহ দ্বারা তা সমৃদ্ধ করে তোলেন। সপ্তম আব্বাসি খলিফা মামুনও (১৯৮-২১৮ হিজরি) বাইতুল হিকমাহর ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বারোপ করেন এবং অনুবাদকদের ভাতা বাড়িয়ে দেন। তিনি বিভিন্ন শাখার জ্ঞানবিজ্ঞানের গ্রিক রচনাবলি যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করার জন্য কনস্টান্টিনোপলে প্রতিনিধিদল পাঠাতে শুরু করেন। মুসলিম খলিফাগণ অন্যান্য রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যেসব চুক্তি করতেন তার অধিকাংশের ক্ষেত্রে এই শর্তারোপ করা হতো যে, মুসলিম জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা গির্জায় ও বাইজান্টাইনীয় প্রাসাদসমূহে যে-সকল গ্রন্থাগার রয়েছে সেগুলোতে প্রবেশ করতে পারবেন এবং সেখানে সংরক্ষিত গ্রন্থরাশির অনুবাদ করতে পারবেন। এমনকি মাঝে মাঝে খলিফাগণ গ্রন্থের দ্বারা বন্দি বিনিময়ও করতেন।[১১২]

ইবনে নাদিম[১১৩][১১৪] তার *আল-ফিহরিসত* গ্রন্থে অনুবাদক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, প্রকৌশলী ও জ্যোতির্বিদদের জন্য প্রায় সত্তরটি ভুক্তি রচনা করেছেন। তাদের জীবৎকালের বিস্তৃতি ছিল হিজরি তৃতীয় ও চতুর্থ শতক। যাদের অধিকাংশ ছিলেন সুরয়ানি অথবা পারসিক ও ভারতীয়

---

[১১১] তিনি গ্রীক সুরয়ানি ভাষা থেকে রূপান্তরিত করেছিলেন। দেখুন, ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ১, পৃ. ১৬৩; শামসুদ্দিন আশ-শাহারযুরি, *তারিখুল হুকামা*, পৃ. ৮৩।

[১১২] নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ২৪৩; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ৫৯।

[১১৩] আবুল ফারাজ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-বাগদাদি, মৃ. ৪৩৮ হিজরি/১০৪৭ খ্রিষ্টাব্দ। তথ্য-সংগ্রাহক, ঐতিহাসিক, শিয়া ও মুতাজিলা মতাদর্শী। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *লিসানুল মিযান*, খ. ৫, পৃ. ৭২; খাইরুদ্দিন আয-যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ২৯।

[১১৪] কিছু গবেষকের মতে নাদিম তার উপাধি, তার পিতার নয়। তাই তাকে ইবনে নাদিম না বলে নাদিম বলাই সংগত। এ বিষয়ে জানতে দেখুন, শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর তাহকিককৃত *লিসানুল মিযান*, খ. ৯, পৃ. ৬১৪। -সম্পাদক

বংশোদ্ভূত মুসলিম। এটা এই উদ্যোগ ও তার প্রভাবের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে, তা হলো ইসলামি জ্ঞান-সভ্যতা বিনির্মাণ ও সমৃদ্ধিকরণে অমুসলিমদের ব্যাপারে এবং ইসলামপূর্ব যুগের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উদার ও উন্মুক্ত নীতি গ্রহণ।

এখানে উল্লেখ্য যে, অন্যদের প্রতি মুসলিমদের এই উদারনীতি অন্ধ বা অজ্ঞতাপূর্ণ ছিল না। সিংহভাগ ক্ষেত্রে তা ছিল মুসলিমদের মূল্যবোধ ও নীতিনৈতিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাদের সত্যধর্মের অনুকূল। গ্রিক সভ্যতার ক্ষেত্রে তারা উদারনীতি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তারা তাদের আইনকানুন গ্রহণ করেননি এবং গ্রিক মহাকাব্য ইলিয়াডের অনুবাদ করেননি। উচ্চাঙ্গের পৌত্তলিক গ্রিক সাহিত্যেরও অনুবাদ করেননি। বরং তারা তথ্য-পুস্তক নথিভুক্তকরণের জ্ঞানলাভ এবং পদার্থবিজ্ঞানের অনুবাদকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। তারা পারসিক সভ্যতার প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সযত্নে তাদের ধ্বংসাত্মক ধর্মাদর্শ এড়িয়ে গেছেন। তবে পারসিক সাহিত্য ও তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ঋণ করেছেন। তারা ভারতীয় সভ্যতার প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাদের দর্শন ও ধর্মাদর্শকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। তাদের গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা গ্রহণ করেছেন; তারা এ সকল জ্ঞানের সংরক্ষণ করেছেন, উন্নতি ও বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং অনেককিছু সংযুক্ত করেছেন।

তা ছাড়া মুসলিমগণ অন্য সভ্যতা থেকে যা গ্রহণ করেছেন তা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য বলে বিবেচিত হয়েছে। কেউ এটাকে দোষ বলে গণ্য করেনি। অর্থাৎ, এতে মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধিত হয়েছে এবং তাদের মন ও মগজ অন্যদের জ্ঞানবিজ্ঞান গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়েছে। মানবসভ্যতায় অবদানের বিষয়টি যাদের দ্বারা শুরু হয় তাদের দ্বারা শেষ হয় না; একজন শুরু করে, চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায় অন্যরা। তারপর নতুন নতুন জিনিসের উদ্ভাবন ঘটে এবং পূর্ববর্তী সভ্যতায় শুরু হওয়া অগ্রযাত্রা পূর্ণতা পায়। যা আমরা আগামী অধ্যায়গুলোতে দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ।
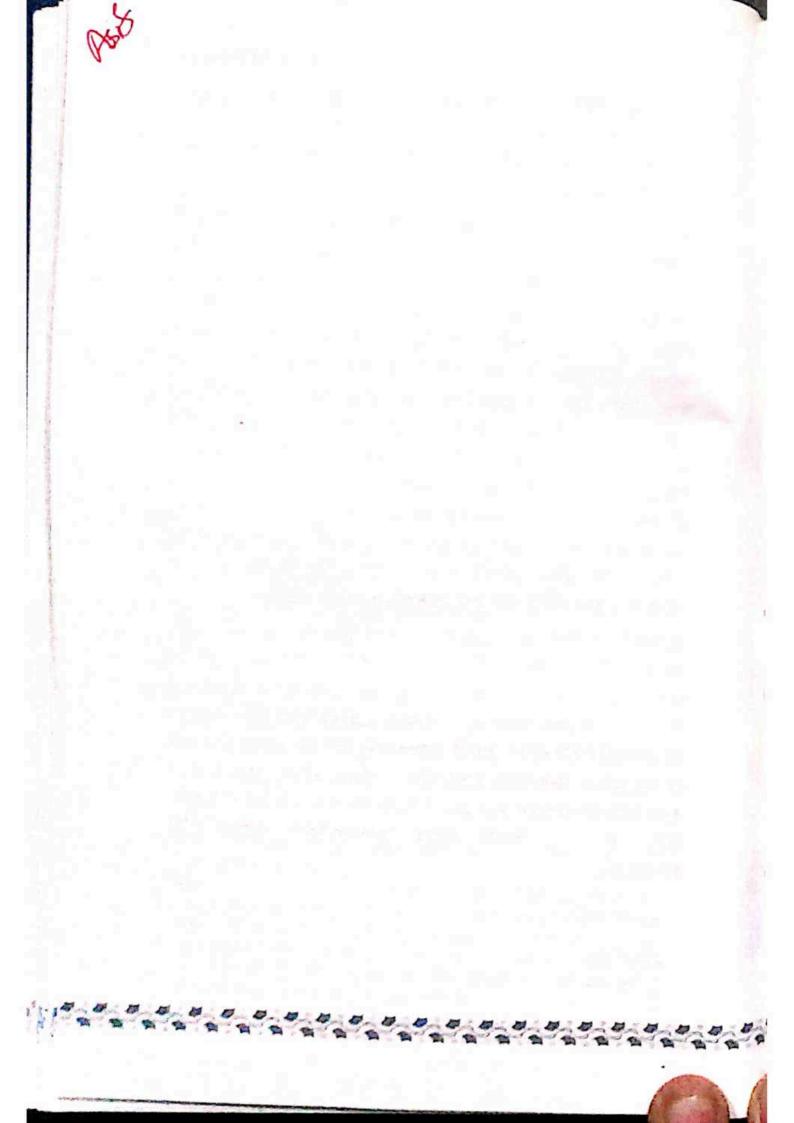
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রত্যেক সভ্যতার অনন্য, স্বতন্ত্র ও পার্থক্যসূচক কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে মহিমান্বিত করে তোলা গ্রিক সভ্যতার অনন্য বৈশিষ্ট্য। দোর্দণ্ড প্রতাপ ও ক্ষমতার বিস্তার রোমান সভ্যতার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। পারসিক সভ্যতার বিশেষ চরিত্র ছিল শারীরিক উপভোগ, সমরশক্তি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। ভারতীয় সভ্যতা আধ্যাত্মিক শক্তিতে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিল। ইসলামি সভ্যতারও রয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য, স্বকীয় চরিত্র ও স্বতন্ত্র গুণাবলি। যা একে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সভ্যতাগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট ও অসামান্য করে তুলেছে। ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি হলো আসমানি পয়গাম, অর্থাৎ ইসলামের মিশন। এই পয়গাম ও মিশন মানবিক, সর্বজনীন এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নির্ভেজাল একত্ববাদের অনুসারী। পরবর্তী আলোচনায় ইসলামি সভ্যতার অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিভাত হয়ে উঠবে। এই পরিচ্ছেদে চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছে :

প্রথম অনুচ্ছেদ : বিশ্বজনীনতা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : একত্ববাদ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : নৈতিকতা
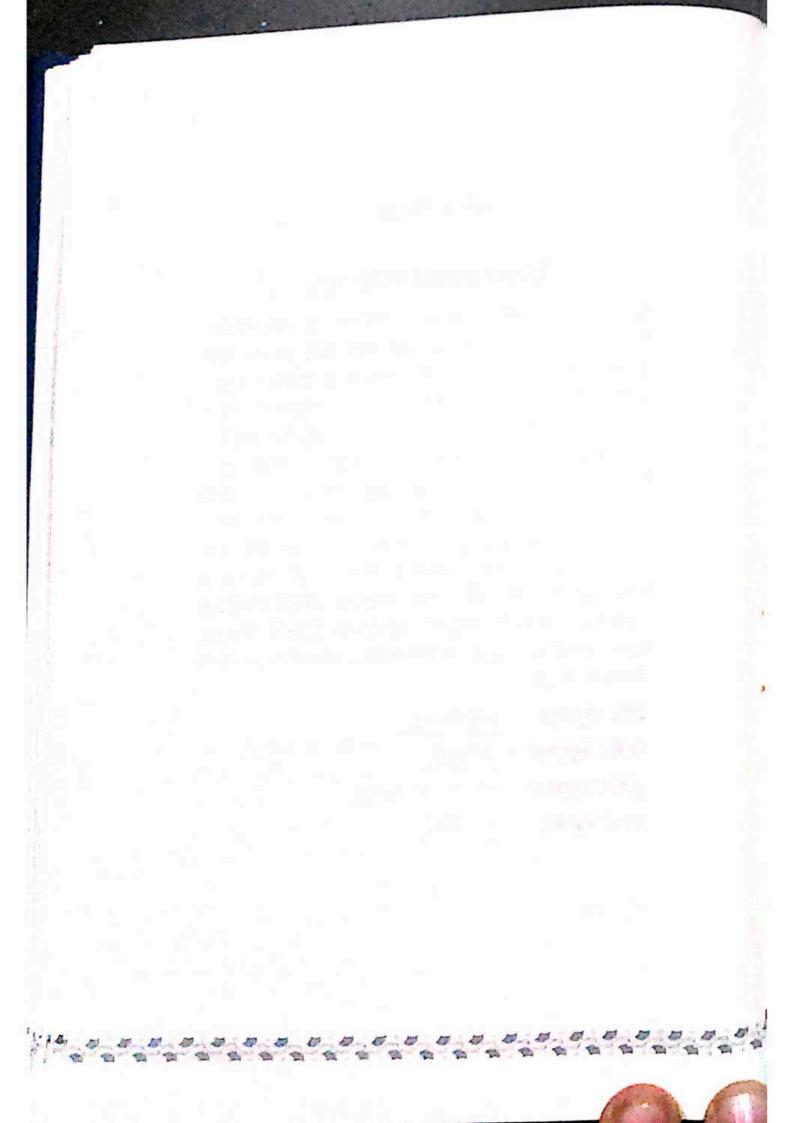
প্রথম অনুচ্ছেদ

বিশ্বজনীনতা

ইসলামি সভ্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তার ব্যাপক বিস্তৃতি ও মিশনের বিশ্বজনীনতা। মানুষের বংশ, জন্মস্থান ও আবাসস্থল ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র কুরআন কর্তৃক মানবশ্রেণির একত্ব ও ঐক্য ঘোষণার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

> হে লোকসকল, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে ভাগ করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে পরহেযগার সেই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত।[১১৫]

কুরআন ইসলামি সভ্যতাকে একটি মালারূপে পেশ করেছে, যেখানে জাতি ও গোষ্ঠীর–যাদের ওপর ইসলামি বিজয়ের পতাকা পতপত করে উড়েছে–সকল প্রতিভাবানেরা মুক্তোর মতো জ্বলজ্বল করছে।[১১৬]

ইসলামি সভ্যতা মানবিক কল্যাণপ্রবণ। বিস্তৃতি ও ব্যাপকতায় বিশ্বজনীন। কোনো ভৌগোলিক অঞ্চল, কোনো মানবগোষ্ঠী বা ইতিহাসের কোনো পর্যায়ের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামি সভ্যতা সকল জাতি ও মানবগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তার ফল ও প্রভাব সকল এলাকা ও সকল ভূখণ্ডে বিস্তৃত। এই সভ্যতার ছায়ায় সকল মানুষ প্রশান্তি পেয়েছে, যেখানেই এই সভ্যতার অবদান পৌঁছেছে সেখানকার মানুষ তার উষ্ণতা উপভোগ করেছে। তার কারণ, ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

---

১১৫. সুরা হুজুরাত : আয়াত ১৩।

১১৬. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৩৬।

এই নীতির ওপর যে, আল্লাহ তাআলার সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত, বিশ্বজগতে যা-কিছু আছে সবকিছু মানুষের বশীভূত, সকল মানবিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা তার সুখ, সৌভাগ্য ও স্বস্তি বিধানের জন্য। যে-সকল কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য এই পরিণতিকে নিশ্চিত করে তা-ই প্রথম পর্যায়ের মানবিক কাজ।

বিশ্বজনীনতার নীতি সকল মানুষের মধ্যে সত্য, কল্যাণ, ন্যায়পরায়ণতা ও সমতার মূল্যবোধ দৃঢ়মূল করে। তাদের বর্ণ, গোত্র, শ্রেণি, স্তর এখানে ধর্তব্য নয়। জাতিগত কৌলীন্য বা উপাদানগত আভিজাত্যের ধারণার প্রতি কোনো বিশ্বাসও নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রিসালাত পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য রহমত। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে সম্বোধন করে বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

আমি আপনাকে জগদ্‌বাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।[১১৭]

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

আমি আপনাকে সকল মানুষের উদ্দেশে প্রেরণ করেছি।[১১৮]

এ কারণে ইসলামি সভ্যতার মিশন হলো একটি বিশ্বজনীন মিশন, যার বাস্তবায়নে বংশ, বর্ণ ও ভাষাভেদে সকলে সমানভাবে অংশীদার।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহ ও তাঁর অবস্থান ছিল কুরআনের এই চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অনুকূল। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ...»

---

১১৭. সুরা আম্বিয়া : আয়াত ১০৭।

১১৮. সুরা সাবা : আয়াত ২৮।

আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কাউকে দেওয়া হয়নি। প্রত্যেক নবী এককভাবে তার কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছে আর আমি লাল ও কালো সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।[১১৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ও কর্মরাশি ছিল নবুয়ত ও রিসালাতের বিশ্বজনীনতার মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি তার সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বলেন,

«إِنَّ الرَّائِدَ لا يَكْذِبُ أَهْلَهُ. وَاللهِ لَوْ كَذَبْتُ النَّاسَ جَمِيعًا، مَا كَذَبْتُكُمْ، وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ، مَا غَرَرْتُكُمْ وَاللهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً»

নেতা কখনো তার পরিবারের সঙ্গে মিথ্যা বলেন না। আল্লাহর কসম! আমি যদি সকল মানুষের সঙ্গে মিথ্যা বলি, তারপরও তোমাদের সঙ্গে মিথ্যা বলব না। যদি আমি মানুষদের ধোঁকা দিই, তোমাদের ধোঁকা দেবো না। আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসুল, বিশেষভাবে তোমাদের প্রতি এবং সমগ্র মানবের প্রতি।[১২০]

রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন দাওয়াতের মিশন শুরু করেছিলেন সেদিনই তার বিশ্বজনীনতার মূলনীতি ঘোষণা করেছিলেন।

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমের কায়সার, পারস্যের কিসরা, মিশরের সম্রাট মুকাওকিস ও হাবশার বাদশা নাজাশির কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন। পারস্যসম্রাট কিসরার (খসরু পারভেজের) কাছে প্রেরিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি,

---

১১৯. *বুখারি*, কিতাব : আত-তায়াম্মুম, হাদিস নং ৩২৮; *মুসলিম*, কিতাব : আল-মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস সালাহ, হাদিস নং ৫২১।

১২০. আলি ইবনে বুরহানউদ্দিন হালবি, *আস-সিরাতুল হালাবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ১১৪; মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আস-সালেহি, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ*, ২য় খ., পৃ. ৩২২; ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, খ. ১, পৃ. ৫৮৫।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ،

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، إِلى كِسْرَى عَظِيمِ فَارِسٍ، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وآمَنَ باللهِ وَرَسُولِهِ، وشَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰه إلاَّ الله وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه ورَسُولُهُ، أَدْعُوكَ بِدِعَايَة اللهِ، فإِنى أنا رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ويَحِقَّ الْقَوْلُ عَلى الْكَافِرِينَ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ المَجُوسِ.

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে।

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে পারস্য-সম্রাট কিসরার (খসরু পারভেজের) প্রতি। সালাম তার ওপর যে সত্যের অনুসারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল। আমি তোমাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই। আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহর রাসুল, যারা জীবিত আছে তাদের সতর্ক করার জন্য। কাফেরদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করো, (সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে) নিরাপদ থাকবে। আর যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তোমাকে অগ্নিপূজক জাতির পাপ বহন করতে হবে।[১২১]

এটাই ইসলামি সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য ইসলামি সভ্যতাকে অন্যান্য সভ্যতার মাঝে স্বতন্ত্র অবস্থান ও বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। সত্যসত্যই তা হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন শ্রেষ্ঠ সভ্যতা।

---

[১২১]. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ১২৩; খতিবে বাগদাদি, *তারিখে বাগদাদ*, খ. ১, পৃ. ১৩২; মুত্তাকি আল-হিন্দি, *কানযুল উম্মাল*, হাদিস নং ১১৩০২।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

একত্ববাদ

ইসলামি সভ্যতার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো তা আসমান জমিনের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তাআলা একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত ইলাহ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কর্তৃত্বে কারও কোনো অংশীদারি নেই। তাঁর রাজত্ব ও সাম্রাজ্যে তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তিনিই সম্মানিত করেন, তিনি অপদস্থ করেন। যাকে ইচ্ছা অপরিসীম দান করেন। যাতে সৃষ্টিজীবের জন্য কল্যাণ ও উপযোগিতা রয়েছে তা-ই তিনি রীতিবদ্ধ করেছেন। সব মানুষ তাঁর দাস। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ও তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার ক্ষেত্রে সবাই সমান। এতে কোনো মানবিক বা পিরের ওসিলার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, তার আদেশ-নিষেধ মান্য করা এবং তাঁর নাযিলকৃত শরিয়া বাস্তবায়ন করা মানুষের জন্য আবশ্যক।

একত্ববাদের উপলব্ধির উচ্চমার্গীয়তা মানুষের ভেতর ব্যক্তিত্বের মর্যাদা এবং আল্লাহর সৃষ্টির কারও কাছে নতশির না হওয়ার চেতনা জাগ্রত রাখে। ফলে তার স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের পরিমণ্ডল প্রস্তুত হয়।

আল্লামা সাইয়িদ সুলাইমান নদবি রহ. লিখেছেন, আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একত্ববাদের বিশ্বাসের যে প্রবর্তন ঘটিয়েছেন তা মানুষকে তার চেতনা ও বোধের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী ভয়ভীতি থেকে মুক্তি দেয়। এ বিশ্বাসের কল্যাণে মানুষ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। কারণ ইতিপূর্বে যা-কিছুর উপাসনা করা হতো, সূর্য, পৃথিবী, নদী, সাগর, আগুন ইত্যাদি, তার সবকিছুকে আল্লাহ তাআলা মানুষের বশীভূত করে দিয়েছেন। মানুষের কাছে রাজাবাদশাদের প্রতাপ ও ভয়ভীতি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। ব্যাবিলন ও মিশরের দেবতারা, ইরান ও ভারতের দেবতারা মানুষের খেদমতগার, তাদের কল্যাণের রক্ষক এবং তাদের রাজ্যের পাহারাদার প্রমাণিত হয়।

দেবতারা রাজাবাদশাগণকে তাদের পদে আসীন করে না, বরং মানুষই রাজাবাদশাদের উপরের আসনে বসায় এবং টেনে নিচে নামায়। মনুষ্যসমাজ যে-সকল দেবতার কর্তৃত্বের অনুগত ছিল সেগুলো ছিল নষ্ট, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন স্তরে বিভাজিত। প্রচলিত কুসংস্কার মানুষকেও নানা স্তরে বিভাজিত করে রেখেছিল, মানুষের মধ্যে দুটি শ্রেণি নির্মাণ করেছিল, অভিজাত শ্রেণি ও নিম্নবর্গীয় শ্রেণি। প্রথম শ্রেণি অতি উঁচু স্তরের এবং দ্বিতীয় শ্রেণি অতি নিচু স্তরের। হিন্দু সম্প্রদায়েরর সবচেয়ে বড় দেবতা ব্রহ্ম। তার মাথা থেকে মানুষের এই শ্রেণিটাকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তারা অভিজাত ও মনিব; আর মানুষের ওই শ্রেণিটাকে তার পা থেকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তারা নীচ ও সেবাদাস। অবশিষ্ট সবাই বড় দেবতার হাতের সৃষ্টি, সুতরাং তারা মধ্যবর্তী স্তরের। স্বাভাবিকভাবেই এমন অপবিশ্বাসের পরিণতি ছিল মানুষের বংশ ও গোষ্ঠী অনুযায়ী নানা বর্ণে ও নানা স্তরে বিভক্ত সমাজ। মানুষের সমতার, মানবমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠত্বের এবং সমানাধিকারের মূলনীতির কোনো অর্থই এখানে প্রযোজ্য নয়। দুনিয়া তখন বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রের আভিজাত্য প্রদর্শনের কুরুক্ষেত্র ছিল।[১২২]

সাইয়িদ সুলাইমান নদবি রহ. তারপর ইসলামের মহত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটল, অন্ধকার কেটে গেল। মানুষ প্রথমবারের মতো তাওহিদের বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারল। মানবিক ভ্রাতৃত্বের অর্থ তাদের বোধগম্য হলো, এ ভ্রাতৃত্ব মানুষের মধ্যে কোনো বিভাজন রাখে না এবং কৃত্রিম মানদণ্ডের বিনাশ ঘটায়। এই বিশ্বাসের কল্যাণে মানুষ সমতার ক্ষেত্রে তার লুণ্ঠিত অধিকারের কথা বুঝতে পারল। এই বিশ্বাসের কী ইতিবাচক কার্যকরী ফলপ্রাচুর্য রয়েছে তার ব্যাপারে ইতিহাস শ্রেষ্ঠ সাক্ষী। যে-সকল জাতি-গোষ্ঠী স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই বিশ্বাসের কল্যাণ মেনে নিয়েছে তাদের চিন্তাধারায়ও এর প্রভাব রয়েছে। যদিও তারা এর যাবতীয় তাৎপর্য ও বিদ্যমান মান ও মানদণ্ডের পরিবর্তনে এর বাস্তবিক প্রয়োগের ব্যাপারে অজ্ঞ রয়েছে। অর্থাৎ, যে-সকল জাতি-গোষ্ঠী তাওহিদের মূলনীতিতে বিশ্বাসী নয় তারা আজও পর্যন্ত মানবসমাজে সমতাবিধানের জন্য উপযোগী এই মূলনীতির অভাবে রয়েছে। আপনি তাদের সমাজব্যবস্থা ও সংঘ-সমিতিতে এ অভাবের রূপ দেখতে পাবেন।

---

১২২. সুলাইমান নদবি, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৪, পৃ. ৫২৩; আবুল হাসান আলি নদবি, *আল-ইসলাম ওয়া আসারুহু ফিল হাদারাতি ওয়া ফাদলুহু আলাল ইনসানিয়্যাহ*, পৃ. ২৪-২৭।

এমনকি আপনি তাদের উপাসনালয়েও সমতা দেখতে পাবেন না, যেখানে তাদের নেতৃবৃন্দ মানুষকে তাদের অবস্থান অনুযায়ী মর্যাদা প্রদানের ভিত্তিগুলোর মুখোমুখি হয়ে থাকে। কোনো সন্দেহ নেই যে মুসলিমরা ভালো অবস্থায় রয়েছে। তেরো শতাব্দী ধরে তারা এই মূলনীতির সঙ্গে পরিচিত। সর্বোচ্চ ও সর্বশক্তিমান রবের একত্বের ওপর বিশ্বাসের কল্যাণ তাদের সঙ্গে রয়েছে। মানুষের মধ্যে স্তরবিন্যাসের কৃত্রিম মানদণ্ড ও মানবসৃষ্ট নীতি থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ চিরুনির দাঁতের মতোই সমান ও সমকক্ষ। বর্ণ বা ভূমি তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না। জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করতে পারে না। যখন তারা তাদের রবের সামনে থাকে তখন তারা সিজদাবনত, বিনীত, রিক্ত ও দীন-হীন। আবার যখনই তাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করে তখন তারা সবাই সম্মানিত, সবাই সমান। ঈমান ও বিশ্বাস বাদে তাদের মধ্যে পার্থক্যের আর কোনো কারণ থাকতে পারে না। আমল ছাড়া তাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্বও নেই। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকি।[১২৩], [১২৪]

এই একত্ববাদের দ্বারা মুসলিমগণ তাদের স্রষ্টা, বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও তার নিয়ন্ত্রকের কাছে একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ফলে তাদের সভ্যতা ও মানবীয় জীবনযাত্রায় তাদের অবদানের ক্ষেত্রে এই একত্ববাদের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়।

---

১২৩. সুরা হুজুরাত : আয়াত ১৩।

১২৪. সুলাইমান নদবি, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৪, পৃ. ৫২৩, ৫২৪; আবুল হাসান আলি নদবি, *আল-ইসলাম ওয়া আসারুহু ফিল হাদারাতি ওয়া ফাদলুহু আলাল ইনসানিয়্যাহ*, পৃ. ২৪-২৭ থেকে উদ্ধৃত।

নিম্নবর্ণিত মূলনীতিগুলোর মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

১. শাসককে দেবতার আসনে আসীন না করা

শাসককে দেবতার মর্যাদা দেওয়ার চিন্তা পূর্ববর্তী সময় ও সভ্যতার একটি প্রধান অনুষঙ্গ ছিল। এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, শাসকরা মানুষের সাধারণ গঠন-উপাদানের চেয়ে উৎকৃষ্ট গঠন উপাদানে তৈরি। এমন চিন্তা দূরীভূত হওয়ার ফলে মুসলিমদের জন্য শাসকদের ভুলভ্রান্তি ও অপরাধের কারণে তাদেরকে জবাবদিহির মুখোমুখি করার সম্ভাবনা তৈরি হলো। মানুষ শাসকশ্রেণির ভয়ভীতি থেকে মুক্তি পেল। আল্লাহভীতি ছাড়া আর সব ভীতি দূরীভূত হলো। তিনি নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, তিনি মানুষের জন্য শরিয়ত ও আইনকানুন বিধিবদ্ধ করেছেন। মানবজাতির জন্য আবশ্যক হলো আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলা এবং তাঁর নাযিলকৃত শরিয়া বাস্তবায়ন করা। এভাবে মানুষ তার ব্যক্তিত্বের মর্যাদা বোঝে এবং উপলব্ধি করে যে সে আল্লাহ ছাড়া তাঁর সৃষ্টির কারও কাছে নতশির নয়। সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে ও কাজ করে। তার চিন্তায় ও কর্মে উদ্দেশ্য থাকে প্রকৃত মনিবকে সন্তুষ্ট করা। ফলে সে কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত থাকে এবং অকল্যাণ ও অসৎকর্ম থেকে দূরে থাকে। কুরআনের প্রতিটি আয়াত এই তাওহিদ ও একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ
مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ﴾

হে মানুষ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো। আল্লাহ ব্যতীত কি কোনো স্রষ্টা আছে, যে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছ?[১২৫]

---

১২৫. সুরা ফাতির : আয়াত ৩।

২. মানুষের মধ্যে সমতা

সুতরাং মানুষের মধ্যে কেউ অভিজাত নয় এবং কেউ নিকৃষ্ট নয়। কেউ উচ্চস্তরের নয় এবং কেউ নিম্নস্তরের নয়। এখানে কোনো মানবিক বা পিরত্বের উসিলাও নেই। সবাইকে একজন স্রষ্টাই সৃষ্টি করেছেন এবং সবাই একই রবের ইবাদত করে। সব মানুষ চিরুনির দাঁতের মতো সমান ও সমকক্ষ। বর্ণ, দেশ, জাতীয়তা বা অন্যকিছু তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না। পার্থক্য নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো ঈমান ও তাকওয়া। এ কারণে মানুষের সমতার মানদণ্ড ও স্বাধীনতা তার মানুষ ভাইয়ের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা থেকে অনেক উর্ধ্বে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিদায়ি ভাষণে এই শ্রেষ্ঠ মূলনীতি ঘোষণা করেছেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى...»

হে লোকসকল, জেনে রাখো, তোমাদের প্রতিপালক এক এবং তোমাদের পিতাও একজন। জেনে রাখো, কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের এবং কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপর গৌরবর্ণের এবং গৌরবর্ণের ওপর কালোর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হবে কেবল তাকওয়ার দ্বারা...।[১২৬]

৩. প্রতিমা ও পৌত্তলিকতা থেকে মুক্তি

তাওহিদ বা একত্ববাদের বিশ্বাসের ফলে সব ধরনের পৌত্তলিকতা থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছে। পৌত্তলিকতার পুরোনো রূপ, অর্থাৎ মূর্তিপূজা ও প্রতিমাপূজা থেকে যেমন মুক্তি পেয়েছে তেমনই আধুনিক পৌত্তলিকতা, অর্থাৎ শোষক রাষ্ট্রকে পবিত্র ঘোষণা করা ও ব্যক্তিপূজা থেকেও মুক্তি পেয়েছে। এ কারণে ইসলামি সভ্যতার কোনো মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির

---

১২৬. আহমাদ, হাদিস নং ২৩৫৩৬; শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। *তাবারানি*, হাদিস নং ১৪৪৪৪; হাইসামি বলেছেন, এ হাদিসের বর্ণনাকারীরা সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারীদের শর্তে উত্তীর্ণ। *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, খ. ৩, পৃ. ২৬৬।

কারও কাছে নতশির নয়। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত পেয়ে থাকেন।

৪. সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিজগৎ ও পরকালীন হিসাবনিকাশের সঠিক ধারণা

এই প্রেক্ষিতেই দুনিয়ায় বসবাস হবে, পৃথিবী আবাদ হবে এবং চোখ থাকবে হিসাব ও পুরস্কারের স্থান আখিরাতের প্রতি।

এভাবেই একত্ববাদ ইসলামি সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তা মানুষের সমতার মানদণ্ডের উন্নতি এবং উৎপীড়ন-নিপীড়ন থেকে মানুষের মুক্তি সাধন করেছে। মানুষের দৃষ্টিকে এক আল্লাহ–বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালকের প্রতি নিবদ্ধ করেছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা

ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা ইসলামি সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের অর্থ হলো দুটি পরস্পর বিরোধী বা বৈপরীত্যপূর্ণ দিক বা পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। এমন নয় যে তার মধ্যে একটি প্রাধান্য পাবে, অপরটি বাদ যাবে। একপক্ষ তার সম্পূর্ণ অধিকার পাবে, অপরপক্ষ বৈষম্যের শিকার হবে ও তার অধিকার হারাবে। এরূপ ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা ইসলামের চিরস্থায়ী সর্বজনীন পয়গামেরই উপযুক্ত। এই পয়গাম সকল ভূখণ্ড ও সব যুগের জন্য প্রযোজ্য।

ইসলামি সভ্যতা আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছে। আত্মার চাহিদা ও বস্তুর চাহিদাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে। শরিয়তের জ্ঞান ও জীবনমুখী জ্ঞানের মধ্যে মিলন ঘটিয়েছে। দুনিয়ার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছে, যেমন আখিরাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। চিন্তা ও ধারণা এবং বাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে। তারপর, ইসলামি সভ্যতায় রয়েছে অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য। বৈপরীত্যপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার অর্থ হলো উভয় পক্ষকে পূর্ণ সুযোগ দেওয়া এবং ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে অধিকার প্রদান করা। সুতরাং কোনো বাড়াবাড়ি নয়, সংকীর্ণতা ও অবহেলাও নয়, সীমালঙ্ঘন নয়, কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করাও নয়। আল্লাহ তাআলার কিতাব এ দিকেই ইঙ্গিত করেছে,

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾

তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড, যাতে তোমরা সীমালঙ্ঘন না করো। ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত করো এবং ওজনে কম দিয়ো না।[১২৭]

আমরা ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা কী তা ব্যাখ্যা করতে চাই। পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর ইতিহাস থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, কেবল আধ্যাত্মিকতার দিকগুলো অথবা কেবল বস্তুগত দিকগুলো মানুষের সুখ-সৌভাগ্যের জন্য উপযুক্ত পন্থা নয়। আর এসব আধ্যাত্মিকতার পেছনে পড়ে নিজ ইচ্ছা, চিন্তা ও কর্মশক্তির বিনষ্টি ও সেকেলে মনোভাব ছাড়া আর কিছুই অর্জন হবে না। এতে মানুষের মনুষ্যত্বকে হত্যা করা হয় এবং বিশ্বজগতের উপকারিতা ও কল্যাণের বিনাশ ঘটানো হয়। একইভাবে কেবল বস্তুবাদিতার পথে সীমালঙ্ঘন, জুলুম, দাসত্ব ও অপদস্থতা ছাড়া কিছু নেই। এ পথ আত্মা, সম্পদ ও সম্ভ্রমের সঙ্গে উৎপীড়ক স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া কিছু নয়।

এ ক্ষেত্রে চিরন্তন ইসলামি সভ্যতা আত্মার দাবিসমূহ ও বস্তুগত দাবিসমূহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছে, বস্তুবাদ ও মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে ঐক্য সাধন করেছে। সুতরাং নির্ভেজাল অধ্যাত্মবাদ সুসভ্য বস্তুবাদের ভিত্তি রচনা করে। মানুষ ন্যায়পরায়ণতা, নিরাপত্তা, স্বস্তি, দয়া ও ভালোবাসার ওপর নির্মিত নৈতিকতা-শিষ্টাচার ও ঈমানের পরিমণ্ডলে আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা, চিন্তা এবং প্রচেষ্টা ও কর্মের ফল লাভ করে থাকে।

এরূপ ভারসাম্যের কাজ হলো মানুষের স্বভাব ও বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি ও সামঞ্জস্য বিধান করা, একইভাবে মানুষের চিন্তা ও ভাবনারাশি এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্রায়ের মধ্যে সংশ্লেষ ও প্রভাবপ্রবণতা সৃষ্টি করা।

শরিয়ার জ্ঞান ও জীবনমুখী জ্ঞানের মধ্যে মিলন ঘটানোর প্রেক্ষিতে বলতে পারি, ইসলাম তার উন্নত সভ্যতাকে জ্ঞান, শিক্ষা ও যুক্তি এবং অনুসন্ধান, উদ্‌ঘাটন, অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কারের ওপর নির্মাণ করেছে। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের ক্ষেত্রে জ্ঞানরাশির প্রাণশক্তিই প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই ক্ষেত্রে ইসলাম জ্ঞান ও জ্ঞানীদের সমৃদ্ধ করেছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে, যেখানে প্রতিটি প্রাপ্তি ও অর্জন মানবমণ্ডলীকে

---

[১২৭]. সুরা আর-রহমান : আয়াত ৭-৯।

জীবনে ইসলামের পয়গাম বাস্তবায়নে সহায়তা করে। তা হলো, পৃথিবীকে আবাদ করা এবং তার কল্যাণকর বস্তুরাশি ও ধনভান্ডার থেকে উপকৃত হওয়া।

'ইলম' বা 'জ্ঞান' শব্দটি আল্লাহ তাআলার কিতাবে ও রাসুলের সুন্নাহে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এর সঙ্গে কোনো শর্ত বা ক্ষেত্র নির্দেশ করা হয়নি। সুতরাং জমিনের আবাদ ও পৃথিবীর কল্যাণে নিয়োজিত প্রতিটি উপকারী জ্ঞানই এর অন্তর্ভুক্ত..। যেসব জ্ঞানের উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ এবং এই গ্রহে মানব-প্রতিনিধিত্বের দায়দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন তা অধিকাংশ সময় জ্ঞানের দুটি শাখাকে বুঝিয়ে থাকে—শরয়ি জ্ঞান ও জীবনমুখী জ্ঞান..। জ্ঞানীদের জন্য যা-কিছু প্রশংসা করা হয়েছে তা প্রত্যেক জ্ঞানীর জন্যই প্রযোজ্য, যিনি তার জ্ঞানের দ্বারা মানবজাতির উপকার করেছেন। চাই তা শরয়ি জ্ঞান হোক, অথবা জীবনমুখী জ্ঞান। ইসলামি সভ্যতার ইতিহাস এ ব্যাপারে যথার্থ বিবরণ পেশ করেছে। আমি এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়ে জীবনমুখী জ্ঞানবিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান ও উদ্ভাবন প্রসঙ্গে যা-কিছু বলব তা সম্ভবত এই ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সাক্ষী ও উত্তম পরিচায়ক হবে।

মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যের এই নীতি সেসব সভ্যতার জন্য এক বিরুদ্ধ ব্যাপার, যেখানে ধর্ম চিন্তাশক্তি ও কর্মসামর্থ্যের ওপর খড়্গ উঁচিয়ে রেখেছে এবং জ্ঞান, চিন্তা ও যুক্তির প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রেক্ষিতে সম্ভবত সবচেয়ে স্পষ্ট দলিল হলো কুরআনের জুমার নামায-সংক্রান্ত আয়াতগুলো। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ○ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে মুমিনগণ, জুমার দিনে যখন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি করো।

> নামায শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[১২৮]

দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে মিলন ঘটানোর ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার কাজ এটিই। উপর্যুক্ত আয়াত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে যে তা (দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে মিলন-সাধন) এমনকি জুমার দিনেও পরিপালিত হবে : নামাযের আগে বেচাকেনা ও দুনিয়াবি কাজ করা; তারপর কেনাবেচা ও অনুরূপ দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলো ত্যাগ করে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযের প্রতি ধাবিত হওয়া; তারপর নামায শেষে পুনরায় জমিনে ছড়িয়ে পড়া এবং রিযিক অন্বেষণ করা, সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল না হওয়া। এটাই সফলতা ও মুক্তির মূল ভিত্তি। এখানে আল্লাহর অনুগ্রহের অর্থ হলো রিযিক ও জীবিকা।

আরেকটি আয়াত দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ড ও আখিরাতের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। সেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾

> আল্লাহ তোমাদের যা দিয়েছেন তার দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।[১২৯]

ইসলাম কোনো মুসলিম থেকে এটা দাবি করে না যে সে কোনো আশ্রমে সন্ন্যাসী হোক অথবা একান্ত নির্জনতায় ইবাদত করুক, যে সারারাত নামায পড়বে এবং সারাদিন রোযা রাখবে; জীবনে তার কোনো অংশই থাকবে না এবং তার কাছে জীবনের কোনো অংশ থাকবে না। বরং ইসলাম মুসলিম থেকে দাবি করে যে সে হবে জীবনোপযোগী কর্মোদ্যগী, জীবনকে নির্মাণ করবে, পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াবে এবং গোপনীয় ভান্ডার থেকে রিযিক অন্বেষণ করবে। ইসলামি সভ্যতার সন্তানেরা এমনই হয়ে থাকে,

---

[১২৮]. সুরা জুমুআ : আয়াত ৯-১০।

[১২৯]. সুরা কাসাস : আয়াত ৭৭।

তারা আখিরাতের পাশাপাশি দুনিয়াও অন্বেষণ করে, উভয় জীবনে কল্যাণ আশা করে, উভয় জাহানে সৌভাগ্য প্রত্যাশা করে।

যে ভারসাম্য ইসলামি সভ্যতার বৈশিষ্ট্য তার আরেকটি দিক হলো উত্তম ও সংহত উপায়ে আদর্শবাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে মিলন সাধন করা। ইসলাম একইসঙ্গে আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী ধর্ম। ইসলাম তার অনুসারীদের সবসময় পূর্ণতা ও উন্নত আদর্শের সন্ধান দেয়, কিন্তু সে নিজের মতো করে তার উপায় ও উপকরণ অন্বেষণ করে এবং প্রচেষ্টা ব্যয় করে। ইসলাম কারও ওপর অন্যায়ভাবে কোনোকিছু চাপিয়ে দেয় না। এ কারণে ইসলামে চিন্তাকে বাস্তব থেকে এবং আদর্শবাদকে বাস্তববাদ থেকে পৃথক করা কঠিন। বরং এ দুটি মিলিয়ে মানুষের জন্য পরিপূর্ণ জীবনপদ্ধতি যা তাদের সামনে কল্যাণের পথকে আলোকিত করে তোলে এবং আচার-আচরণের নীতিমালা ও লেনদেনের আইনকানুনকে চিত্রিত করে তোলে।

আদর্শবাদের প্রেক্ষিতে ইসলামি সভ্যতা মানুষকে সহজতা ও স্বস্তি এবং সুখ ও প্রশান্তির সর্বোচ্চ মানদণ্ডের সম্ভবপর শিখরে পৌঁছে দিতে আকাঙ্ক্ষী। বাস্তববাদের প্রেক্ষিতে ইসলামি সভ্যতা মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তার স্বভাব ও গঠনপ্রকৃতি, তার শক্তি ও সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা এবং তার জীবনের বাস্তবিকতার প্রতি লক্ষ রাখে।

ইসলামি সভ্যতায় কল্পনাপ্রসূত আদর্শবাদের–স্বপ্নের জগৎ ছাড়া কোথাও যার অস্তিত্ব নেই–কোনো স্থান নেই। যেমন প্লেটো অভিজাত নগরের যে পরিকল্পনা প্রদান করেছেন, যা মানবীয় বাস্তবিকতা থেকে সহস্র মাইল দূরে, যা সহজাত প্রবৃত্তিপ্রসূত এবং যাতে রয়েছে ভ্রান্তি ও ক্রটি।

একইভাবে ইসলামি সভ্যতায় বাস্তববাদিতা এমন নয় যে, বাস্তবিক ব্যাপারগুলোর অবস্থা ও অবস্থান যা-ই হোক না কেন তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়। যেকোনোভাবে, যেকোনো রঙে-ঢঙে জীবনের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য বা বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাওয়ার জন্য ইসলামি সভ্যতা যে তার মূলনীতিগুলো সহনীয় ও নমনীয় করে নেবে তাও নয়। মানুষের প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও প্রথাগুলো লালন করার জন্য অথবা তাদের পশ্চাৎপদ বিশৃঙ্খল অবস্থা ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ অন্ধ অনুসরণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার জন্য ইসলামি সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেনি। জাহিলিয়াতের সমস্ত রূপ ও প্রথাকে নিরর্থক করা এবং নিজের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবস্থাকে প্রবর্তন করার জন্য

ইসলামি সভ্যতা বিনির্মিত হয়েছে। এ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ও গৌণ বিষয়গুলোতে মানুষের বাস্তবিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতেও পারে, নাও হতে পারে।

আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতা পূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতার যে সর্বনিম্ন স্তর বা মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে তার থেকে বেরিয়ে যাওয়া বৈধ নয়। কারণ, মুসলিমের ব্যক্তিত্বকে একটি বোধগম্য পদ্ধতি ও পন্থায় গড়ে তোলার জন্য এরূপ মানদণ্ড আবশ্যক এবং তা মুসলিমরূপে গণ্য হওয়ার জন্য কোনো মুসলিম থেকে গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন স্তর। এই মানদণ্ড যে পথ ও কর্মের নির্দেশ দেয়, কল্যাণকর কাজের জন্য সামান্য প্রস্তুতি যার আছে এবং যে অন্যায় থেকে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখেছে সেও ওই পথে পৌঁছতে পারবে এবং ওই কর্ম আঞ্জাম দিতে পারবে। ফরয ও ওয়াজিবের মতো আবশ্যক দায়িত্ব-কর্তব্য এবং নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়াবলির ওপর ভিত্তি করে এই মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব ফরয দায়িত্ব ও হারাম কাজগুলো এমনভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে যে যে-কেউ সেগুলোর দাবি ও চাহিদা পূর্ণ করতে পারে। প্রয়োজন ও জটিলতার সময়ে শরিয়ত ছাড় দিয়েছে এবং পরিমাণ ও পদ্ধতি বর্ণনা করে দিয়েছে।

এই যে বাধ্যতামূলক মানদণ্ড—যেখানে পৌঁছা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক—এর পাশাপাশি শরিয়ত আরেকটি মানদণ্ড (স্তর) স্থির করেছে, যা আগেরটির চেয়ে উঁচু পর্যায়ের ও ব্যাপক। শরিয়ত এই মানুষকে মানদণ্ডের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে এবং এতে উপনীত হওয়ার ব্যাপারটি তাদের কাছে শোভনীয় করে তুলেছে। সকল নফল, মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় ও সুন্নাত কাজসমূহ এই মানদণ্ডের (স্তরের) অন্তর্ভুক্ত। শরিয়ত মানুষকে এগুলো পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। একইভাবে মাকরুহ বা অপছন্দনীয় এবং সন্দেহযুক্ত কাজগুলোও এই মানদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে পরহেয করে চলা এবং এগুলো থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই উচিত।

কিন্তু উচ্চতর স্তরে ও মানদণ্ডে পৌঁছা প্রচণ্ড পরিশ্রম-সাপেক্ষ ব্যাপার, প্রতিটি মানুষের জন্য তা সহজ নয়। বরং তা বিশেষ যোগ্যতা ও বিশেষ প্রস্তুতির ওপর নির্ভরশীল, তা স্বল্প সংখ্যক মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। এ কারণে ইসলাম উচ্চতর স্তরটিকে সকল মানুষের ওপর চূড়ান্তরূপে ফরয করে

দেয়নি। বরং একে মানুষের সামনে চিত্রিত করে তুলে ধরেছে এবং শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সুযোগ দিয়েছে।

﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾—'আল্লাহ তাআলা কারও ওপর তার সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে দেন না।'[১৩০] প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী যা-কিছু ভালো কাজ করবে তা তার থেকে গৃহীত হবে।

﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾—'প্রত্যেকের স্তর নির্ধারিত হবে তার আমল অনুযায়ী।'[১৩১]

সবশেষে যে ভারসাম্যের কথা বলতে চাই তা হলো অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য। ইসলামি সভ্যতা মনে করে যে, কোনো ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর অধিকার অন্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছাড়া কিছু নয়। বিচারপ্রার্থীদের অধিকার মানে বিচারকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। শ্রমিকদের অধিকার মানে মালিকদের আবশ্যক কর্তব্যসমূহ। সন্তানসন্ততির অধিকার মানে মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। এইভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে অধিকার আদায় করা হয়।

ইসলাম ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মাঝে অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রতি মনোযোগী রয়েছে। এতে ব্যক্তিগত প্রবণতা ও সামাজিক কল্যাণকামিতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা হয়। একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সমাজের অন্যান্য সদস্যের জীবনের চেয়ে পৃথক বা স্বাধীন নয়। বরং সে সামাজিক পরিমণ্ডলে বসবাস করতে, কল্যাণ ও উপকার বিনিময়ে এবং সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য। এ সকল অনুষঙ্গের ফলে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং ইসলামি শরিয়া সেগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে।

এভাবেই ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা ইসলামি সভ্যতার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

---

[১৩০]. সুরা বাকারা : আয়াত ২৮৬।

[১৩১]. সুরা আনআম : আয়াত ১৩২ ও সুরা আহকাফ : আয়াত ১৯

চতুর্থ অনুচ্ছেদ
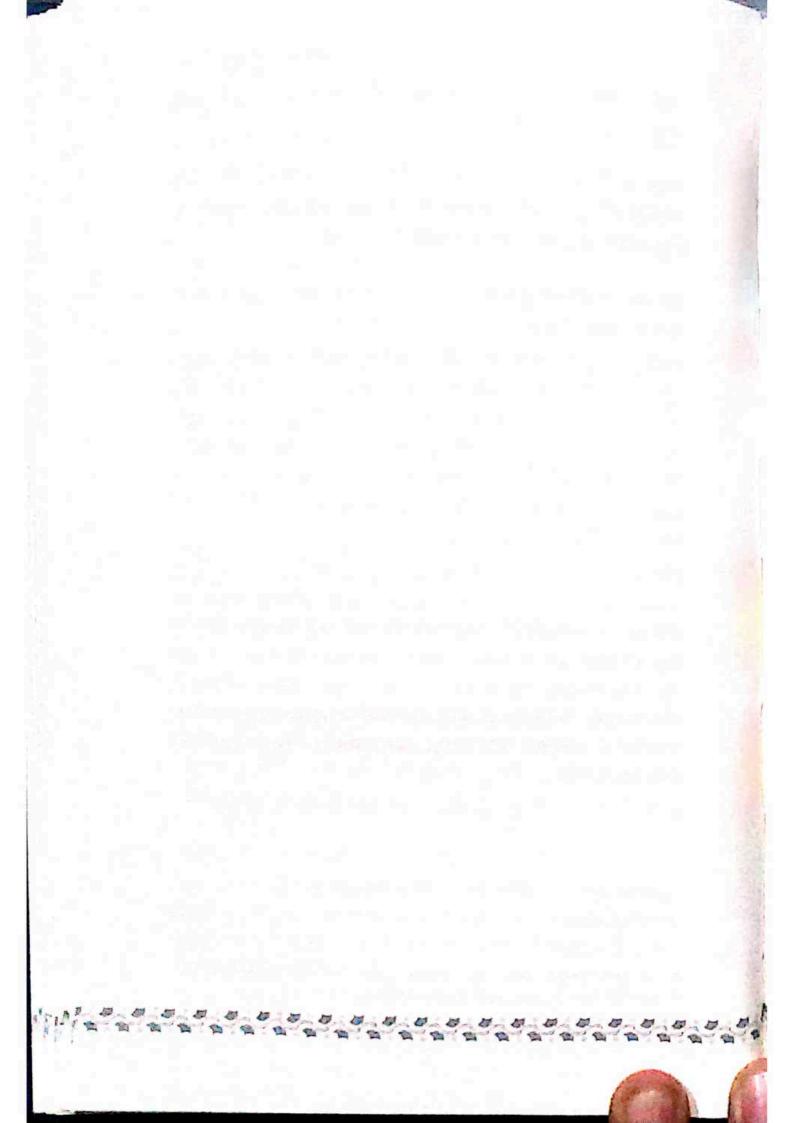
নৈতিকতা

বাস্তবিক অর্থেই নৈতিকতা ইসলামি সভ্যতার প্রাচীরস্বরূপ। নৈতিকতার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামি সভ্যতা। মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মূলনীতিগুলো জীবনের সব ধরনের ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্নমুখী তৎপরতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ব্যক্তির চালচলন, সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিষ্টাচার ও নৈতিকতার পূর্ণতাদানের জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ»

> সচ্চরিত্রতা ও নৈতিকতার পূর্ণতাদানের জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।[১৩২]

এই কয়েকটি শব্দ দ্বারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নবীরূপে প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল তাঁর উম্মত ও সকল মানুষের অন্তরে নৈতিকতার চেতনাকে বদ্ধমূল করে দেওয়া। তিনি চেয়েছিলেন মানবমণ্ডলী উত্তম চরিত্রের নীতির আলোকে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিক, কারণ, চারিত্রিক নীতির উর্ধ্বে আর কোনো নীতি নেই।

শাসন, জ্ঞান, বিধিবিধান, যুদ্ধ, শান্তি, অর্থনীতি, পরিবার.. অর্থাৎ ইসলামি সভ্যতার সব ক্ষেত্রে নৈতিক দিকগুলোকে আদর্শিক ও প্রায়োগিক দিক থেকে মান্য করা হয়। এই জায়গাটায় ইসলামি সভ্যতা এক অনন্য

---

১৩২. আল-হাকিম কর্তৃক আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, *মুসতাদরাক*, কিতাব : তাওয়ারিখুল মুতাকাদ্দিমিন মিনাল আম্বিয়া ওয়াল-মুরসালিন এবং কিতাব : আয়াতু রাসুলিল্লাহিল লাতি হিয়া দালাইলুন নুবুওয়া, হাদিস নং ৪২২১। আল-হাকিম বলেছেন, হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ, যদিও তিনি হাদিসটি সংকলন করেননি। যাহাবি তাকে সমর্থন করেছেন। বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ২০৫৭১।

উচ্চতায় পৌঁছেছে যা আগে ও পরে আর কোনো সভ্যতার ভাগ্যে জোটেনি। নৈতিকতার ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন রয়েছে। এসব নিদর্শন ইসলামি সভ্যতাকে মানবজাতির জন্য অনন্য ও অবিমিশ্র সৌভাগ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যদিও অন্যসব সভ্যতাও মানুষের সুখ-সৌভাগ্যের ঠিকাদারি নিয়েছে।[১৩৩]

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, ইসলামি সভ্যতায় নৈতিকতার উৎস হলো ওহি (আল্লাহর প্রেরিত বাণী)। এ কারণে তা প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ এবং স্থান ও কাল, লিঙ্গ ও গোত্র নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জন্য উপযোগী উন্নত আদর্শ। কিন্তু তাত্ত্বিক নৈতিকতার উৎস ভিন্ন। তা হলো মানুষের সীমাবদ্ধ বিবেক ও বুদ্ধি অথবা যার ওপর সমাজের মানুষ ঐকমত্য পোষণ করে। একে প্রথা বলা হয়। তাই তো এক সমাজের তাত্ত্বিক নৈতিকতা আরেক সমাজ থেকে ভিন্ন এবং একেকজন চিন্তাবিদের কাছে একেক রকম।

ইসলামি নৈতিকতার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার উৎস হলো আল্লাহর তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে মানুষের অনুভূতি ও উপলব্ধি। তাত্ত্বিক নৈতিকতার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার উৎস হলো কেবল বিবেক অথবা করণীয় সম্পর্কে উপলব্ধি অথবা রাষ্ট্রের অবশ্যপালনীয় আইন। এ নৈতিকতাই সভ্যতার চলমানতা ও স্থায়িত্বের রক্ষাকবচ বলে বিবেচিত হয় এবং একইসঙ্গে তা সভ্যতাকে বিকৃতি, হোঁচট ও অধঃপতন থেকে রক্ষা করে।

ইসলামি সভ্যতার ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রধান দিক হলো এর মানবিকতা। মানুষই ইসলামি সভ্যতায় মূল কেন্দ্রবিন্দু এবং মানবিক কল্যাণ ও সম্মান সুরক্ষায় দৃঢ় খুঁটি। কারণ, জীবন ও সভ্যতা বিনির্মাণের প্রেক্ষিতে মানুষকেই দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হয়। পবিত্র কুরআনে মানুষের মর্যাদা ও সম্মানের ওপর গুরুত্বারোপ করে একের-পর-এক আয়াত এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

---

১৩৩. মুস্তফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৩৭।

আর নিঃসন্দেহে আমি আদমসন্তানদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদের আমি উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের সবার ওপর আমি মানুষকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।[১০৪]

আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে সমানভাবে মর্যাদা দিয়েছেন। কারণ, সৃষ্টির পর থেকে নিয়ে এখনো পর্যন্ত মানুষের গঠন-উপাদান একই এবং মানুষের অন্যান্য পার্থক্য তার গঠন-উপাদানের কোনোকিছুকে পরিবর্তন করে না। প্রতিটি মানুষকে একই 'মূল' থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে এই মর্যাদার ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা দান করেছেন। এই বিশিষ্টতা ও মর্যাদা অন্য সৃষ্টিকুলের নেই। এই মর্যাদা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য বিশেষ সুরক্ষা। এভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা, অভিপ্রায় ও স্বাধীনতার সুরক্ষা দিয়েছেন এবং ব্যক্তিসত্তা, সম্পদ ও সন্তানসন্ততির ক্ষেত্রে তার অধিকারেরও সুরক্ষা দিয়েছেন।

এ সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামি সভ্যতা অনন্য ও অসাধারণ। ইসলামি সভ্যতা বিশ্বজনীন এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার নিরঙ্কুশ একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা অবলম্বনও ইসলামি সভ্যতার অনন্যতাকে ফুটিয়ে তোলে। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিবেচনায়ও ইসলামি সভ্যতা তুলনারহিত। এ সকল কারণে ইসলামি সভ্যতা কোনো জাতীয়তাবাদী সভ্যতা নয়, কোনো বর্ণবাদী সভ্যতা নয় এবং মানব-প্রকৃতির বিরুদ্ধও নয়।

যে-সকল বৈশিষ্ট্যে ইসলামি সভ্যতা বিশিষ্ট ও অনন্য তা সত্য-সরল দ্বীনে ইসলামের মূলনীতি থেকে স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার চরিত্র লাভ করেছে। কারণ, ইসলামি সভ্যতা ইসলামের মূলনীতি থেকে উৎসারিত এবং তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে ইসলামি সভ্যতা এক স্বকীয় ও অনন্য মৌলবস্তুর রূপ পরিগ্রহ করেছে, যার পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে না, যদিও কালের বিবর্তন সাধিত হয় এবং নতুন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

---

১০৪. সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৭০।
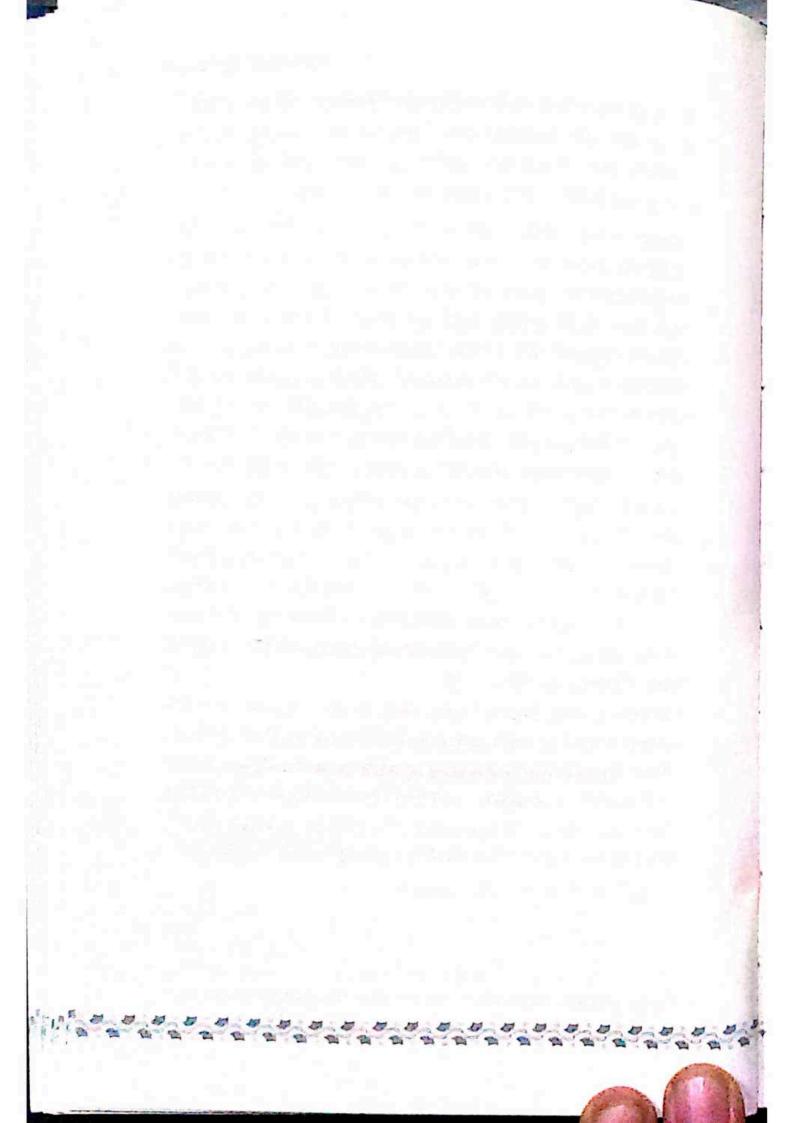
দ্বিতীয় অধ্যায়

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান

মানবসভ্যতায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক দিক বিবেচনা করা হয় এবং একইভাবে প্রতিটি সভ্যতার মৌলবস্তু ও ভিত্তি গণ্য করা হয়। ইতিহাস ও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটি সভ্যতার স্থায়িত্ব ও টিকে থাকার রহস্য নিহিত থাকে তার নৈতিকতা ও মূল্যবোধে। এই দিকটি যদি কোনোদিন অন্তর্হিত হয়ে যায় তাহলে মানুষ তার অন্তর্নিহিত উত্তাপ ও চৈতন্য হারিয়ে ফেলবে, যা জীবন ও অস্তিত্বের আত্মা। একইসঙ্গে তার চিত্ত থেকে প্রেম ও দয়া মুছে যাবে, তার অস্তিত্ব ও মানস দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য আঞ্জাম দিতে পারবে না। শুধু তাই নয়, মানুষ তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম হয়ে পড়বে, আত্মার তাৎপর্য তো বটেই। বস্তুগত শেকলজালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাবে, কোনোভাবেই তা থেকে মুক্তির পথ পাবে না।

আফসোসের ব্যাপার হলো, পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলো—ইতিপূর্বে যেগুলোর কথা বর্ণনা করেছি—এবং সামসময়িক সভ্যতা নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বড় কোনো অবদান রাখেনি এবং স্পষ্ট ভূমিকা পালন করেনি। পশ্চিমাবিশ্বের পণ্ডিতবর্গ ও চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন। ব্রিটিশ দার্শনিক জোড[১০৫] বলেছেন,

---

১০৫. সিরিল এডউইন মিচিসন জোড (Cyril Edwin Mitchinson Joad, সংক্ষেপে : C. E. M. Joad) : জন্ম ১২ আগস্ট ১৮৯১ এবং মৃত্যু ৯ এপ্রিল ১৯৫৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিবিসি রেডিয়োতে 'দা ব্রেইন ট্রাস্ট' নামের একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি দর্শনকে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং মানুষের কাছে তারকারূপে বরিত হন। তিনি একশরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বই রচনা করেছেন। কয়েকটি হলো : ১. *The Story of Civilization* (1931) ২. *The Story of Indian Civilization* (1936), ৩. *Essays in Common-Sense Philosophy* (1919) ৪. *Guide to the Philosophy of Morals and Politics* (1938), ৫. *Philosophy For Our Times* (1940)।-অনুবাদক

আধুনিক সভ্যতায় শক্তি ও নৈতিকতায় ভারসাম্য নেই। জ্ঞান থেকে নৈতিকতা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞান (প্রকৃতিবিজ্ঞান) আমাদের ভয়ংকর শক্তি দিয়েছে; কিন্তু আমরা এই শক্তিকে বালকসুলভ চিন্তাভাবনা ও পাশবিক অবিবেচনার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছি। কেন এই অধঃপতন? কারণ, মানুষ বিশ্বজগতে তার অবস্থানের বাস্তবতা বুঝতে ভ্রান্তির শিকার হয়েছে এবং মূল্যবোধের জগৎ অর্থাৎ কল্যাণকামিতা, সততা, অধিকারচেতনা ও সৌন্দর্যবোধকে অস্বীকার করেছে।[১৩৬]

অ্যালেক্সিস ক্যারেল[১৩৭] বলেছেন,

আমরা আধুনিক নগরীতে এমন মানুষ খুব কম দেখি যারা নৈতিক আদর্শকে অনুসরণ করেন। অথচ সচ্চরিত্রতা ও নৈতিকতার সৌন্দর্য জ্ঞান ও শাস্ত্র থেকে অনেক উর্ধ্বে এবং তা সভ্যতার ভিত্তি।[১৩৮]

সত্য এটাই যে, মুসলিমদের সভ্যতা ছাড়া অন্য কোনো সভ্যতায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দিকটি তার অধিকার পায়নি। ইসলামি সভ্যতা মৌলিকভাবেই নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের নবীকে বিশেষভাবে সচ্চরিত্রতা ও নৈতিক গুণাবলির পূর্ণতা বিধানের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। অথচ অন্যান্য জাতি ও সভ্যতায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ছিল খণ্ডিতরূপে, বিচ্ছিন্ন ও অবহেলিত।

---

১৩৬. আনওয়ার আল-জুনদি, *মুকাদ্দিমাতুল উলুমি ওয়াল মানাহিজ*, খ. ৪, পৃ. ৭৭০।

১৩৭. অ্যালেক্সিস ক্যারেল (Alexis Carrel) : অ্যালেক্সিস ক্যারেল ছিলেন একজন খ্যাতনামা ফরাসি চিকিৎসাবিদ। ফ্রান্সের লিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শারিরতত্ত্ববিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেন এবং পরবর্তীকালে নিউইয়র্কের রকফেলার ইনস্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চের সদস্য মনোনীত হন। রক্তপ্রবাহ-সংক্রান্ত গবেষণায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য ১৯১২ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি *Man, The Unknown* (মূল ফরাসি : *L'Homme, cet inconnu*) নামে একটি যুগান্তরকারী গ্রন্থ রচনা করেন। অ্যালেক্সিস ক্যারেল ১৮৭৩ সালের ২৮ জুন জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৪ সালের ৫ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।-অনুবাদক

১৩৮. অ্যালেক্সিস ক্যারেল, *Man, The Unknown*, আরবি অনুবাদ, الإنسان ذلك المجهول, অনুবাদক আদিল শাফি, অনুবাদগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১৫৩।

এই নৈতিকতা ও মূল্যবোধ কখনো কালের ধারাবাহিকতায় চিন্তার যে বিকাশ ঘটেছিল তার ফল ও পরিণতি ছিল না, বরং তা ছিল আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যাদেশ এবং ইসলামের রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত শরিয়ত। সুতরাং গত পনেরোশ বছর ধরে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উৎস ছিল ইসলামি শরিয়ত।

এই অধ্যায়ে আমরা নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মুসলিমগণ যে অবদান রেখেছেন তার কিছু দিক সীমিতরূপে পেশ করব। এ বিষয়গুলো মানবসভ্যতার মৌলবস্তুকে ফুটিয়ে তুলবে। এই অধ্যায়ে বিষয়গুলোর পরীক্ষানিরীক্ষা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা কেবল প্রারম্ভিক বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করব, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে যাব না। নিম্নবর্ণিত পরিচ্ছেদগুলো রয়েছে এই অধ্যায়ে—

প্রথম পরিচ্ছেদ : অধিকার
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্বাধীনতা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পরিবার
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সমাজ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মুসলিম এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
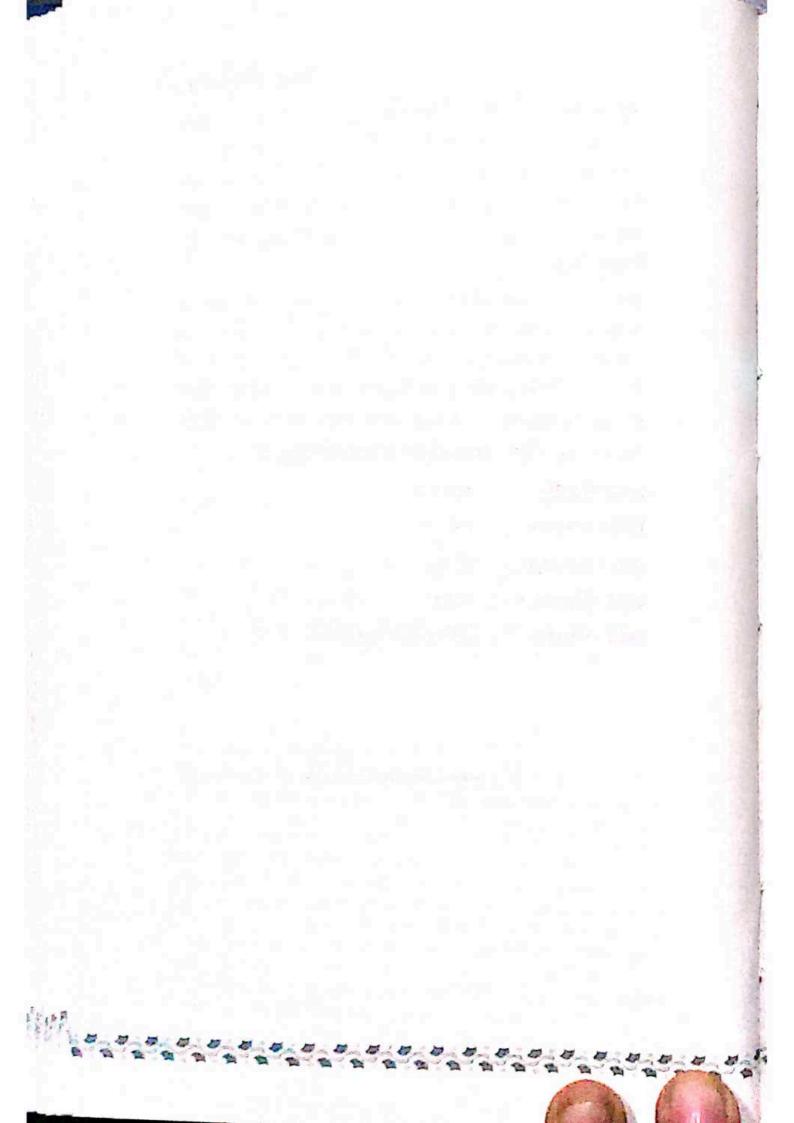
প্রথম পরিচ্ছেদ

অধিকার

পাশ্চাত্য দার্শনিক নিৎশে বলেছেন, অক্ষম দুর্বলদের ধ্বংস হয়ে যাওয়াই অনিবার্য! মনুষ্যত্বের প্রতি আমাদের যে প্রেম তার প্রথম ও প্রধান মূলনীতিই এটি। এভাবে ধ্বংস হওয়ার জন্য দুর্বলদের সহায়তা করাও উচিত।[১০৯]

কিন্তু ইসলামের দর্শন ও শরিয়ত কখনোই মূল্যবোধ ও নৈতিকতা থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হয়নি। সকল মানবসন্তানের জন্য একগুচ্ছ অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্ণ, ভাষা ও জাতের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে পার্থক্য করেনি। যে বলয়ে মানবসন্তানের ক্রিয়াকলাপ সচল থাকে তাও ইসলামি দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম শরিয়তের কর্তৃত্বের মাধ্যমে অধিকারগুলোর সুরক্ষা প্রদান করবে, সেগুলো বাস্তবায়িত করবে এবং এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারীদের শাস্তি বিধান করবে—এগুলোও ইসলামের দর্শনের মৌলিক কথা। নিম্নবর্তী অনুচ্ছেদসমূহের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ : মানবাধিকার
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : নারীর অধিকার
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : কর্মজীবী ও শ্রমিকদের অধিকার
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : এতিম, নিঃস্ব ও বিধবার অধিকার
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : সংখ্যালঘুদের অধিকার
সপ্তম অনুচ্ছেদ : জীবজন্তুর অধিকার
অষ্টম অনুচ্ছেদ : পরিবেশের অধিকার

১০৯. মুহাম্মাদ আল-গাযালি, *রাকায়িযুল ঈমান বাইনাল আকলি ওয়াল-কলব*, পৃ. ৩১৮।
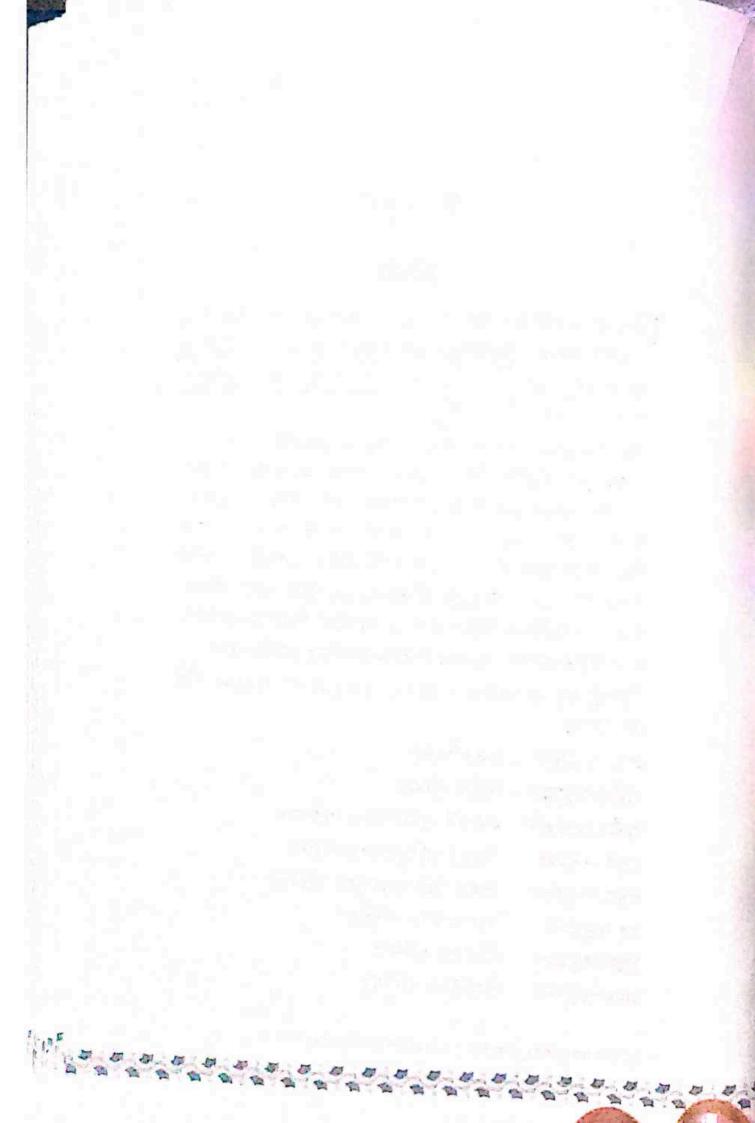
প্রথম অনুচ্ছেদ

৯. মানবাধিকার

ইসলাম মানুষের প্রতি সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا﴾

> আর নিঃসন্দেহে আমি আদমসন্তানদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে আমি উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।[১৪০]

এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামে মানবাধিকারকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে। গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই অধিকারগুলোর সামগ্রিকতা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও চিন্তাগত সব ধরনের অধিকার ইসলামে মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে এ সকল অধিকার বর্ণ, ভাষা ও জাত নির্বিশেষে মুসলিম ও অমুসলিম সকল মানুষের জন্য ব্যাপৃত। এ অধিকারগুলোকে বাতিল করার বা পরিবর্তন করার কোনো অবকাশ নেই। কারণ এগুলো বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রত্যাদেশ ও শিক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে এসব অধিকারের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই ভাষণ ছিল মানবাধিকারের সামগ্রিক স্বীকৃতি। তিনি বলেন,

---

১৪০. সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৭০।

«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ»

তোমাদের জীবন, সম্পদ (ও সম্মান) তোমাদের জন্য পবিত্র, যেমন, তোমাদের এই মাসে এই শহরে এই দিন পবিত্র। এই বিধান আল্লাহর সঙ্গে তোমাদের মিলিত হওয়া পর্যন্ত।[১৪১]

নবীজির এই ভাষণ সামগ্রিক মানবাধিকারের ওপর জোর দিয়েছে, বিশেষ করে রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত-আবরুর পবিত্রতা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণভাবে সকল মানবাত্মাকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন এবং মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকারের সুরক্ষার কথা বলেছেন, তা হলো জীবনের বা বেঁচে থাকার অধিকার। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বড় বড় পাপাচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে বললেন, 'আল্লাহর সঙ্গে শরিক সাব্যস্ত করা... কোনো মানুষকে হত্যা করা..।'[১৪২] হাদিসে নফস বা মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে সাধারণভাবে, অন্যায় হত্যাকাণ্ডের শিকার যেকেউ তা হতে পারে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়েও বেশিকিছুর অধিকার দিয়েছেন, যেহেতু তিনি মানুষকে আত্মরক্ষার অপরিহার্য বিধান প্রদান করেছেন। তা এই যে, তিনি আত্মহত্যা নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»

---

১৪১. *বুখারি*, আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস। কিতাব : আল-হাজ্জ, বাব : আল-খুতবাহ আইয়ামা মিনা, হাদিস নং ১৬৫৪; *মুসলিম*, কিতাব : আল-কাসামাহ ওয়াল-মুহারিবিন ওয়াল-কিসাস ওয়াদ-দিয়াত, বাব : তাগলিযু তাহরিমিদ-দিমা ওয়াল-আরাদ ওয়াল-আমওয়াল, হাদিস নং ১৬৭৯।

১৪২. *বুখারি*, কিতাব : আশ-শাহাদাত, বাব : মা কিলা ফি শাহাদাতিয-যুর, হাদিস নং ২৫১০; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ৪০০৯; *আহমাদ*, হাদিস নং ৬৮৮৪।

> যে লোক নিজেকে পাহাড়ের ওপর থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করেছে, সে জাহান্নামে সবসময় ওইভাবে নিজেকে নিক্ষেপ করতে থাকবে। আর যে লোক বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে সেও জাহান্নামের মধ্যে সর্বদা ওইভাবে নিজ হাতে বিষপান করতে থাকবে। আর যে লোক কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করেছে, জাহান্নামে তার হাতে ওই অস্ত্র থাকবে, তার দ্বারা সে তার পেট চিরতে থাকবে।[১৪৩]

ইসলাম একইভাবে জীবনের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে এমন সব কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করেছে। ভয় দেখানোর জন্য বা অপমান করার জন্য অথবা আঘাত দেওয়ার জন্য, যেকোনো কারণেই এমন কাণ্ড ঘটানো হোক না কেন তা ইসলামে নিষিদ্ধ ও হারাম। হিশাম ইবনে হাকিম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا»

> আল্লাহ তাআলা ওইসব লোকদের শাস্তি দেবেন যারা দুনিয়াতে মানুষকে শাস্তি দেয়।[১৪৪]

সাধারণভাবে সকল মানুষকে সম্মানিত এবং সবার রক্ত, সম্ভ্রম ও সম্পদ হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সবাইকে জীবনের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তারপর সকল মানুষের মধ্যে সমতার অধিকারের ওপর তাকিদ দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি ও দল, জাতি ও গোষ্ঠী, শাসক ও প্রজা, মনিব ও চাকর, নেতা ও নেতৃত্বাধীন মানুষ সকলের মধ্যে সমতার অধিকার সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। সমতার অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো

---

১৪৩. *বুখারি*, কিতাব : আত-তিব্ব, বাব : শুরবুস সাম্মি ওয়াদ-দাওয়ায়ি বিহি ওয়া বিমা ইয়ুখাফু মিনহু ওয়াল-খবিস, হাদিস নং ৫৪৪২; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : গিলযু তাহরিমি কাতলিল ইনসান নাফসাহু.., হাদিস নং ১০৯।

ব্যাখ্যা : আত্মহত্যাকারী স্থায়ী জাহান্নামি নয়। যদি সে ঈমানের সঙ্গে আত্মহত্যা করে, তাহলে পরে একসময় জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। তবে এই হাদিসে خالدا مخلدا-এর অর্থ হলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে। যেমন আমরা দোয়া করার সময় বলে থাকি خلد الله ملكه, অর্থাৎ, আল্লাহ তার রাজত্বকে চিরস্থায়ী করুন। অথবা, এখানে ওই ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে আত্মহত্যার পূর্বে তার ঈমানকেও ত্যাগ করে ফেলেছে।-অনুবাদক

১৪৪. *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাতু ওয়াল-আদাব, বাব : আল-ওয়ায়িদুশ শাদিদু লিমান আযযাবান নাসা বিগাইরি হাক্ক, হাদিস নং ২৬১৩; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩০৪৫; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৫৩৬৬।

শর্ত নেই, কোনো ব্যতিক্রম নেই। বিধিবিধান আরোপের ক্ষেত্রে আরব ও অনারবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, সাদা ও কালো এবং শাসক ও প্রজার মধ্যেও কোনো ব্যবধান নেই। মানুষের সম্মান ও মর্যাদার মানদণ্ড কেবল তাকওয়া ও খোদাভীরুতা। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى...»

হে লোকসকল, জেনে রাখো, তোমাদের প্রতিপালক এক এবং তোমাদের পিতাও একজন। জেনে রাখো, কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপর গৌরবর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং গৌরবর্ণের ওপর কালোর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হবে কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে...।[১৪৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে সমতার মূলনীতিকে বাস্তবিক রূপ দিয়েছেন তা আমরা দেখতে পারি এবং তাঁর মহত্ত্ব অনুধাবন করতে পারি। আবু উমামা বাহিলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু যর রা. বিলাল রা.-কে তার মায়ের নাম ধরে কটু কথা বললেন। বললেন, হে কৃষ্ণাঙ্গ মায়ের বেটা! বিলাল রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং তাঁকে ঘটনাটা জানালেন। শুনে তিনি খুব রাগান্বিত হলেন। কিছুক্ষণ পর আবু যর রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। আর তিনি অভিযোগ সম্পর্কে জানতেন না। তাকে দেখতে পেয়ে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন আবু যর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, নিশ্চয় আপনার কাছে আমার ব্যাপারে কোনো সংবাদ পৌঁছেছে, এ কারণে আপনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

---

[১৪৫]. আহমাদ, হাদিস নং ২৩৫৩৬; শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। *তাবারানি*, হাদিস নং ১৪৪৪৪; হাইসামি বলেছেন, এ হাদিসের বর্ণনাকারীরা সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারীদের শর্তে উত্তীর্ণ। *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, ৩ খ. পৃ. ৩৬৬।

«أَنْتَ الَّذِي تُعَيِّرُ بِلَالًا بِأُمِّهِ وقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَحْلِفَ مَا لِأَحَدٍ عَلَيَّ فَضْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَطَفِّ الصَّاعِ»

তুমি বিলালকে তার মায়ের নাম তুলে কটু কথা বলেছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যিনি মুহাম্মাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন তাঁর কসম, (বা আল্লাহ যেমন চান তেমন কসম খেয়ে বললেন,) আমল ব্যতীত আমার কাছে কারও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আর তোমরা হলে সমপর্যায়ের ভাই ভাই।[১৪৬]

সমতার অধিকারের সঙ্গে আরও একটি অধিকার যুক্ত রয়েছে, তা হলো ইনসাফ ও ন্যায়বিচার। এ ব্যাপারে একটি অনুপম দৃষ্টান্ত রয়েছে। মাখযুমি গোত্রের একজন নারীকে চুরি করার অভিযোগ সাব্যস্ত হওয়ায় হাত কাটার দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। উসামা ইবনে যায়দ রা. তার জন্য সুপারিশ করতে চেয়েছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন,

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, আমি অবশ্যই তার হাত কেটে ফেলতাম।[১৪৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

«فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا»

নিশ্চয় পাওনাদার বা যার প্রাপ্য অধিকার রয়েছে সে তার বক্তব্য প্রদান করবে (চাইলে কড়া কথা বলবে)...।[১৪৮]

---

১৪৬. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, পৃ. ৫১৩৫।

১৪৭. বুখারি, আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আম্বিয়া, বাব : 'তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকিমের অধিবাসীরা...(সুরা কাহফ : আয়াত ৯), হাদিস নং ৩২৮৮; মুসলিম, কিতাব : হুদুদ বা শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন অপরাধের দণ্ড, বাব : কাতউস সারিকিশ-শারিফ..., হাদিস নং ১৬৮৮।

মানুষের মাঝে বিচারের দায়িত্বভার যার ওপর রয়েছে বা যিনি বিচারক মনোনীত হয়েছেন তার উদ্দেশে বলেছেন,

«فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ»

যখন তোমার সামনে বাদী ও বিবাদী উভয়ে বসবে, তাদের একজনের কথা শুনে কোনো রায় দেবে না, বরং প্রথমজনের বক্তব্য যেভাবে শুনেছ, অনুরূপ অপরজনের বক্তব্যও শুনবে। তোমার কাছে মোকদ্দমার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতে (ও সঠিক রায় প্রদানে) তা অধিকতর সমীচীন।[১৪৯]

একটি বিশেষ মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়া অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মানবরচিত কোনো বিধান এবং মানবাধিকারের কোনো ধারা সেদিকে দৃষ্টিপাত করেনি। তা হলো 'পর্যাপ্ততার অধিকার'। এর অর্থ এই যে, ইসলামি রাষ্ট্রের আশ্রয় ও তত্ত্বাবধানে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের পর্যাপ্ত জীবনোপাদান অর্জিত থাকবে। যাতে সে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে এবং তার জন্য জীবনধারণের উপযুক্ত সমতা নিশ্চিত হয়। এটা মানবরচিত বিধানগুলো জীবিকার যে ন্যূনতম সীমা নিয়ে আলোচনা করেছে এবং যা মানবজীবনের সর্বনিম্ন স্তর বোঝায় তা থেকে ভিন্ন।[১৫০]

পর্যাপ্ততার অধিকার কর্মের দ্বারা অর্জিত হয়। ব্যক্তি কর্মে অক্ষম হলে যাকাত প্রদান করা হবে। মুখাপেক্ষীদের পর্যাপ্ততা পূরণ যাকাতে না কুলালে রাষ্ট্রীয় বাজেট তাদের জীবিকার এ পর্যাপ্ততা পূর্ণ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাই বলেছেন যখন তিনি ঘোষণা করেছেন,

«مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ»

---

[১৪৮]. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ওয়াকালাহ, বাব : আল-ওয়াকালাহ ফি কাইদ-দুয়ুন, হাদিস নং ২১৮৩; *মুসলিম*, কিতাব : বাগান ও ফসলি জমির বর্গাচাষ, বাব : কোনো বস্তু ধার নিয়ে তার চেয়ে উত্তম বস্তু ফেরত দেওয়া, হাদিস নং ১৬০১।

[১৪৯]. *সুনানে আবু দাউদ*, আলি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আকদিয়া, বাব : কাইফাল কাদা, হাদিস নং ৩৫৮২; *সুনানে তিরমিযি*, হাদিস নং ১৩৩১; *আহমাদ*, হাদিস নং ৮৮২। শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি 'হাসান লি-গাইরিহি'।

[১৫০]. খাদিজা আন-নাবরাবি, *মাউসুআতু হুকুকিল ইনসান ফিল ইসলাম*, পৃ. ৫০৫-৫০৯।

কেউ সম্পদ রেখে মারা গেলে তা তার পরিবার-পরিজনের জন্য এবং কেউ ঋণ অথবা পরিবার-পরিজন ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু না রেখে মারা গেলে ওই ঋণের (ঋণ পরিশোধের) এবং পরিবার-পরিজন ও ছেলেমেয়েদের (খোরপোশের) দায়দায়িত্ব আমার ওপর।[১৫১]

এ অধিকারের ওপর জোর দিয়ে আরও বলেন,

«مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ»

ওই লোক আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি যে পেট ভরে খেয়ে রাত যাপন করল, অথচ তার পাশে প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত এবং সে তা জানে।[১৫২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশংসা করে বলেন,

«إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ»

আশআরি গোত্রের লোকজন যখন যুদ্ধের ময়দানে অনটনগ্রস্ত হয় অথবা মদিনাতে তাদের পরিবার-পরিজনের যখন খাদ্যসংকট দেখা দেয় তখন তাদের কাছে যা-কিছু থাকে তা এক কাপড়ে জড়ো করে নেয়। তারপর তা নিজেদের একটি পাত্র দ্বারা সমানভাবে বণ্টন করে দেয়। সুতরাং তারা আমার থেকে এবং আমি তাদের

---

১৫১. *বুখারি*, কিতাব : আত-তাফসির, সুরা আহযাব, হাদিস নং ৪৫০৩; *মুসলিম*, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-জুমুআ, বাব : নামায ও খুতবা সংক্ষিপ্তকরণ, হাদিস নং ৮৬৭। উদ্ধৃত বাক্য *মুসলিম*-এর।

১৫২. *মুসতাদরাকে হাকেম*, কিতাব : সদাচার ও সম্পর্ক বজায় রাখা, হাদিস নং ৭৩০৭। তিনি বলেছেন, এই হাদিসের সনদগুলো সহিহ, যদিও *বুখারি* ও *মুসলিমে* তা সংকলিত হয়নি। তাকে ইমাম যাহাবি সমর্থন করেছেন। তাবারানি, *মুজামুল কাবির*, আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, হাদিস নং ৭৫০, উদ্ধৃত বাক্য এই কিতাবের। বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৩২৩৮।

থেকে (আমিও তাদের একজন এবং আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট)।[১৫৩]

ইসলামের কল্যাণে মানবাধিকার তার মহত্ত্বের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে তা নাগরিকদের ও যুদ্ধবন্দিদের যুদ্ধকালীন অধিকারের কথা বলে। কারণ যুদ্ধের সময়ে মানুষের প্রতিশোধস্পৃহা ও যুদ্ধংদেহি মনোভাব উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং সেখানে কোনো মানবিকতা ও দয়া-মমতা থাকে না। কিন্তু ইসলামের মানবিক জীবনবিধানের ভিত্তি হলো দয়া-মায়া-মমতা। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا إِمْرَأَةً وَلَا شَيْخًا»

তোমরা কোনো শিশু, নারী ও বৃদ্ধকেও হত্যা করো না ।[১৫৪]

ইসলাম যা-কিছু মানবাধিকাররূপে স্থির করেছে ও আইন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে তার কিছু উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হলো। তা সংক্ষিপ্তভাবে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে–যা মুসলিম সভ্যতার আত্মা–প্রতিফলিত করছে।

---

১৫৩. *বুখারি*, আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : অংশীদারি, বাব : খাদ্য, পাথেয় ও দ্রব্যসামগ্রীতে অংশীদারি, হাদিস নং ২৩৫৪; *মুসলিম*, কিতাব : সাহাবাগণের মর্যাদা, বাব : আশআরিগণের মর্যাদা, হাদিস নং ২৫০০।

১৫৪. *মুসলিম*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : খলিফা কর্তৃক সেনাদলের আমির নির্বাচন এবং যুদ্ধের পদ্ধতি ও আচরণ সম্পর্কে তাদের উদ্দেশে উপদেশ, হাদিস নং ১৭৩১; তাবারানি, *আল-মুজামুল আওসাত*, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ৪৩১৩, উদ্ধৃতি এই গ্রন্থ থেকে।

২. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

নারীর অধিকার

ইসলাম নারীকে পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার বেষ্টনে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। নারীকে উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছে এবং কন্যা, স্ত্রী, বোন ও মা হিসেবে সম্মান ও সদাচারের অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম প্রথমেই এই স্বীকৃতি দিয়েছে যে নারী ও পুরুষকে একই 'মূল' থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণে মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾

> হে মানবসকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দুইজন থেকে বহু নরনারী ছড়িয়ে দেন।[১৫৫]

আরও অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো যৌথ মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের মূলনীতির ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনাকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

এসব মূলনীতির আলোকে ও নারীদের অবস্থার ব্যাপারে জাহিলি যুগের ও পূর্ববর্তী জাতিগুলোর রীতিনীতিকে অস্বীকার করে ইসলাম নারীকে যথাযথ সুরক্ষা প্রদান করেছে এবং তাকে সংহত অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো জাতির সভ্যতায় নারীজাতি এই সৌভাগ্য লাভ করেনি। ইসলাম চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বে মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে নারীর

---

১৫৫. সুরা নিসা : আয়াত ১।

অধিকার ঘোষণা ও বিধিবদ্ধ করেছে। এখন পশ্চিমা বিশ্বের নারীরা এসব অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। কিন্তু তা সুদূরপরাহত!

ইসলাম শুরুতেই ঘোষণা করেছে যে, নারী মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ। তারা নারী হওয়ার কারণে তাদের মর্যাদা বিন্দুমাত্রও হ্রাস পাবে না। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি বলেন,

«إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»

নারীরাও পুরুষের অনুরূপ।[১৫৬]

এটাও প্রমাণিত আছে যে তিনি সবসময় নারীদের ব্যাপারে উপদেশ দিতেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলতেন,

«اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»

> তোমরা আমার থেকে নারীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ করো।[১৫৭]

বিদায়হজের ভাষণেও এই উপদেশের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সেখানে তাঁর উম্মতের হাজার হাজার সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

নারীর মর্যাদা ও উঁচু অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যেসব স্তম্ভ নির্মাণ করেছে তা আমরা ব্যাখ্যা করতে চাই। তার আগে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে প্রাচীন জাহিলিয়াতের সময় নারীর অবস্থা কেমন ছিল এবং আধুনিক জাহিলিয়াতের যুগে কেমন আছে। যাতে আমরা নারী যে অন্ধকার যাপন করেছে এবং বর্তমান সময়ে করে চলেছে তার স্বরূপ দেখতে পাই। এতে আমাদের সামনে ইসলামের শিক্ষা ও ইসলামি সভ্যতার ছায়ায় নারীর যে মর্যাদা ও অবস্থান রয়েছে তার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

---

[১৫৬]. *সুনানে তিরমিযি*, আবওয়াবুত তাহারাত (পবিত্রতা), বাব : কেউ ঘুম থেকে উঠে পরনের কাপড়ে বীর্যপাতের আর্দ্রতা দেখতে পেল, হাদিস নং ১১৩; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৩৬; *আহমাদ*, হাদিস নং ২৬২৩৮; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ৪৬৯৪।

[১৫৭]. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : নারীদের ব্যাপারে উপদেশ, হাদিস নং ৪৮৯০; *মুসলিম*, কিতাব : স্তন্যপান, বাব : নারীদের ব্যাপারে উপদেশ, হাদিস নং ১৪৬৮।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি যে, আরবরা তাদের কন্যাসন্তানদের জীবন্ত পুঁতে ফেলত এবং তাদেরকে জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করত। এমন কাজকে পাপাচার ও নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়ে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হলো। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ○ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾

যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কী কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?[১৫৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানহত্যাকে সবচেয়ে ভয়ংকর পাপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম,

«أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»

আল্লাহর নিকট সর্বাধিক বড় গুনাহ কোনটা? তিনি বললেন, আল্লাহর কোনো সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। বললাম, সেটা অবশ্যই জঘন্য। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটা? তিনি বললেন, তোমার সন্তান তোমার সঙ্গে খাবে এই ভয়ে সন্তান হত্যা করা। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, তারপর কোনটা? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।[১৫৯]

নারীদের জীবনের অধিকারকে সুরক্ষা দানে ইসলামের নির্দেশ সীমাবদ্ধ নয়, বরং কন্যাদের লালনপালন ও ভরণপোষণের ব্যাপারে ইসলাম উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

১৫৮. সুরা তাকবির : আয়াত ৮-৯।

১৫৯. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : নিজের সঙ্গে খাবে এই ভয়ে সন্তান হত্যা করা, হাদিস নং ৫৬৫৫; *সুনানে তিরমিযি*, হাদিস নং ৩১৮২; *আহমাদ*, হাদিস নং ৪১৩১।

«مَنْ بَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»

> যে এ সকল কন্যাসন্তানের কারণে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, এরপর সে তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে, এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড়ালস্বরূপ হবে।[১৬০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদের শিক্ষাদানের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

«أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ»

> যে ব্যক্তির কাছে একজন ক্রীতদাসী আছে এবং সে তাকে উত্তমরূপে (দ্বীনের হুকুম-আহকাম) শিক্ষা দিয়েছে এবং সুন্দরভাবে আদবকায়দা শিখিয়েছে, তারপর তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করেছে, তবে তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে।[১৬১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দিন নির্দিষ্ট করে তাতে নারীদের উদ্দেশে ওয়াজ করতেন, উপদেশ দিতেন এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের নির্দেশ দিতেন।[১৬২]

মেয়েরা শিশু অবস্থা থেকে পূর্ণবয়স্কা হলে ইসলাম তাদের ইচ্ছাস্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে। কারও জন্য বিয়ের প্রস্তাব এলে তাতে সমর্থন দেওয়ার অথবা তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রয়েছে প্রতিটি পূর্ণবয়স্কা মেয়ের।

---

[১৬০]. *বুখারি*, আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আদাব, বাব : সন্তানের প্রতি মমতা প্রদর্শন, তাকে চুমু খাওয়া ও জড়িয়ে ধরা, হাদিস নং ৫৬৪৯; *মুসলিম*, কিতাব : সদাচার, সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, বাব : কন্যাদের প্রতি সদাচারের প্রতিদান, হাদিস নং ২৬২৯।

[১৬১]. *বুখারি*, আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : দাসী গ্রহণ এবং নিজ দাসীকে মুক্ত করে বিয়ে করা, হাদিস নং ৪৭৯৫।

[১৬২]. আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নারীরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, পুরুষেরা আপনার কাছে আমাদের চেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। সুতরাং আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন ধার্য করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেদিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তাদের উদ্দেশে ওয়াজ-নসিহত করলেন এবং তাদের নির্দেশ দিলেন।' *বুখারি*, কিতাব : আল-ইলম, বাব : ইলম শিক্ষায় নারীদের জন্য কি আলাদা দিন ধার্য করা যায়?, হাদিস নং ১০১; *মুসলিম*, কিতাব : সদাচার, সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, বাব : কারও সন্তান মারা গেলে সে ধৈর্য ধারণ করে প্রতিদানের প্রত্যাশা করল, হাদিস নং ২৬৩৩।

তাকে এমন পুরুষের কাছে গছিয়ে দেওয়া কিছুতেই বৈধ হবে না যাকে সে চায় না। এ ব্যাপারে জবরদস্তি কারও জন্য বৈধ নয়। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

বালেগা বিবাহিতা নারী নিজের ব্যাপারে তার ওলি বা অভিভাবকের চেয়ে অধিক হকদার। আর বালেগা কুমারী থেকে তার ব্যাপারে তার নিজের মত গ্রহণ করা আবশ্যক। তার মত দেওয়া হলো চুপ থাকা।[১৬৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

«لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ»

বালেগা বিবাহিতা নারীকে তার স্পষ্ট অনুমতি না নিয়ে বিবাহ দেওয়া যাবে না। একইভাবে বালেগা কুমারীকেও তার অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত বিবাহ দেওয়া যাবে না। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তার অনুমতি কীভাবে বোঝা যাবে? (সে তো কথা বলবে না।) তিনি বললেন, চুপ থাকাই তার অনুমতি।[১৬৪]

মেয়েরা যখন স্ত্রীরূপে বরিত হবে তখন ইসলাম তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করার এবং তাদেরকে নিয়ে সুন্দরভাবে বসবাস করার নির্দেশ দিয়েছে। স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, নারীর সঙ্গে সদাচরণ হলো পুরুষের আত্মসম্মান, মহত্ত্ব ও সৌজন্যবোধের দলিল। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের উৎসাহিত করে বলেন,

«إِذَا سَقَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْمَاءَ أُجِرَ»

---

১৬৩. *মুসলিম*, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : বিবাহে বিবাহিত নারী থেকে কথার দ্বারা এবং কুমারী থেকে মৌনতার দ্বারা সম্মতি গ্রহণ, হাদিস নং ১৪২১।

১৬৪. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : পিতা বা অন্য কেউ বিবাহিতা নারী ও কুমারীকে তাদের সম্মতি ছাড়া বিয়ে দিতে পারবে না, হাদিস নং ৪৮৪৩।

স্বামী যদি তার স্ত্রীকে পানি পান করায়, সে প্রতিদান পাবে।[১৬৫]

আবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করে বলেন,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ : الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ»

হে আল্লাহ, আমি দুই প্রকার দুর্বলের অধিকার (নষ্ট করা) নিষিদ্ধ করেছি, তারা হলো এতিম ও নারী।[১৬৬]

এই ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন বাস্তবিক আদর্শ। তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে চূড়ান্ত কোমল ও সহৃদয় আচরণ করতেন। এ বিষয়ে আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ আন-নাখয়ি একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আয়িশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে কী কাজ করতেন? তিনি জবাব দিলেন,

«كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»

রাসুলুল্লাহ পারিবারিক কাজ করতেন। অর্থাৎ পরিবারকে সেবা দিতেন। আর যখন নামাযের সময় হতো তখন নামাযের জন্য বেরিয়ে যেতেন।[১৬৭]

স্ত্রী যদি তার স্বামীকে অপছন্দ করতে শুরু করে এবং তাদের মধ্যে বনিবনা না হয় এবং স্বামীর সঙ্গে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে ইসলাম তাকে স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করার অধিকার দিয়েছে। এটাকে 'খুলআ' বিচ্ছেদ বলা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত,

---

১৬৫. *আহমাদ*, ইরবায ইবনে সারিয়া থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ১৭১৯৫। শুআইব আরনাউত বলেছেন, সহিহ।

১৬৬. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ৩৬৭৮; *আহমাদ*, হাদিস নং ৯৬৬৪। শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ শক্তিশালী। *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ২১১, তিনি বলেছেন, ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটি সহিহ, যদিও তিনি তা সংকলন করেননি। ইমাম যাহাবি '*তালখিস*'-এ বলেছেন, হাদিসটির সনদ ইমাম মুসলিমের শর্ত পূরণ করেছে। *বাইহাকি*, হাদিস নং ২০২৩৯।

১৬৭. *বুখারি*, কিতাব : আল-জামাআত ওয়াল-ইমামাত, বাব : মান কানা ফি হাজাতি আহলিহি ফা উকিমাতিস-সালাহ ফাখারাজ, হাদিস নং ৬৪৪; *আহমাদ*, হাদিস নং ২৪২৭২; *সুনানে তিরমিযি*, হাদিস নং ২৪৮৯।

তিনি বলেন, সাবিত ইবনে কায়সের স্ত্রী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি দ্বীন ও চরিত্রের কারণে সাবিতের ওপর ঘৃণা পোষণ করি না, বরং আমি কুফরির ভয় করি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কি তার বাগান তাকে ফিরিয়ে দেবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ফিরিয়ে দেবো। সাবিত ইবনে কায়সের স্ত্রী তার বাগান ফিরিয়ে দিলেন এবং তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে তার স্ত্রীকে তালাক দিলেন।[১৬৮]

ইসলাম পুরুষের মতোই নারীদের সম্পদের স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও একচ্ছত্র মালিকানার অধিকার দিয়েছে। তার ক্রয় ও বিক্রয়ের অধিকার রয়েছে, ভাড়া দেওয়ার ও ভাড়ায় গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে, উকিল নিযুক্ত করার ও হেবা করার অধিকার রয়েছে। তার বুদ্ধিমত্তা ঠিক থাকলে এসব ব্যাপারে তার ওপর কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা বা বাধা আরোপ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

> এবং তাদের মধ্যে ভালো-মন্দের বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদেরকে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেবে।[১৬৯]

নারীদের মালিকানার স্বাধীনতাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব রা. একজন মুশরিককে আশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্তু তার ভাই আলি রা. তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এই ঘটনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত ছিল এরূপ,

﴿قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ﴾

> হে উম্মে হানি, তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।[১৭০]

---

১৬৮. *বুখারি*, কিতাব : আত-তালাক, বাব : খুলআ তালাক ও এর পদ্ধতি, হাদিস নং ৪৯৭৩; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৬১৩৯।

১৬৯. সুরা নিসা : আয়াত ৬।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হানিকে শান্তির অবস্থায় ও যুদ্ধাবস্থায় অমুসলিমদের নিরাপত্তা ও আশ্রয় দেওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন।

ইসলামের শিক্ষা ও ইসলামি সভ্যতার ছায়াতলে মুসলিম নারীরা এভাবেই সম্মানিত, মর্যাদাপূর্ণ, নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করে।

---

[১৮৩]. *বুখারি*, উম্মে হানি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, আবওয়াবুল জিযয়া ওয়াল-মুওয়াদাআ, বাব : নারী কর্তৃক নিরাপত্তা ও আশ্রয় দান, হাদিস নং ৩০০০; *মুসলিম*, কিতাব : সালাতুল মুসাফিরিন ওয়া কাসরুহা, বাব : ইসতিহবাবু সালাতিদ-দুহা, হাদিস নং ৩৩৬।

৩. তৃতীয় অনুচ্ছেদ

কর্মজীবী ও শ্রমিকদের অধিকার

ইসলাম গৃহকর্মী ও শ্রমিকদের মর্যাদা প্রদান করেছে, তাদের অবস্থান বিবেচনা করেছে, তাদের সম্মানিত করেছে এবং ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। পূর্ববর্তী কোনো কোনো সমাজব্যবস্থায় কাজ ও শ্রমের অর্থ ছিল দাসত্ব ও গোলামি। কোনো কোনো সমাজব্যবস্থায় কাজের অর্থ ছিল হীনতা ও অপদস্থতা। কিন্তু ইসলাম সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাদের সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা দিয়েছে। ইসলামি সভ্যতা কর্মজীবী ও শ্রমিক শ্রেণিকে যে মহৎ দৃষ্টিতে বিবেচনা করেছে সে ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন। তাঁর জীবনচরিতই ছিল শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শ্রমিকদের প্রতি মানবিক সৌজন্যমূলক আচরণ করতে, তাদের প্রতি দয়া ও সদাচার করতে এবং তাদের ওপর সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপিয়ে না দিতে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»

জেনে রাখো, চাকরবাকরেরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাআলা তাদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। এ কারণে যার ভাই তার অধীন থাকবে, সে নিজে যা খায় তাকে যেন তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরিধান করে তাকে যেন তা-ই পরিধান করায়। তোমরা তাদের ওপর এমন কাজ চাপিয়ে দিয়ো না যা তাদের জন্য খুব

কষ্টকর। যদি তাদের কষ্টকর কাজ করতে দাও, তবে তোমরা নিজেরাও তাদের কাজে সাহায্য করবে।[১৭১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন যে, «إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ»—অর্থাৎ, 'চাকরবাকরেরাও তোমাদের ভাই।' এ কথা বলে তিনি শ্রমিক, গৃহকর্মীকে আপন ভাইয়ের মর্যাদা দিয়েছেন। পূর্ববর্তী কোনো সভ্যতা এ ধরনের মহানুভবতা প্রত্যক্ষ করেনি।

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মালিকের ওপর আবশ্যক করে দিয়েছেন যে শ্রমিক ও কাজের লোকদের তাদের শ্রমের যথার্থ পারিশ্রমিক প্রদান করবে। তাদের প্রতি কোনো জুলুম করবে না, কোনো ধরনের টালবাহানার আশ্রয় নেবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»

তোমরা শ্রমিকদের শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করো।[১৭২]

ইসলাম শ্রমিকদের প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত থাকতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে কুদসিতে বলেন,

«قَالَ اللهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ»

আল্লাহ তাআলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ধরনের লোকের প্রতিপক্ষ হব : ... এবং যে লোক কোনো শ্রমিককে কাজে

---

[১৭১]. *বুখারি*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : জাহিলি যুগের যেসব কাজ পাপ এবং কেউ শিরক ব্যতীত অন্য কোনো পাপে লিপ্ত হলে তাকে কাফের বলা যাবে না, হাদিস নং ৩০; *মুসলিম*, কিতাব : শপথ ও মানত, বাব : মালিক যা খায় চাকরবাকরকে তা-ই খাওয়ানো, হাদিস নং ১৬৬১।

[১৭২]. ইবনে মাজাহ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, হাদিস নং ২৪৪৩, *মিশকাতুল মাসাবিহ*, হাদিস নং ২৯৮৭।

খাটিয়েছে এবং তার থেকে পূর্ণ শ্রম ও কাজ নিয়েছে, কিন্তু তাকে যথার্থ পারিশ্রমিক প্রদান করেনি।[১৭৩]

যে লোক চাকরবাকর ও শ্রমিকদের প্রতি জুলুম করে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং কিয়ামতের দিন তিনি তার প্রতিপক্ষ হবেন।

মালিকের উচিত নয় শ্রমিকের ওপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, যা তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে এবং কাজের ক্ষেত্রে তাকে অসমর্থ বানিয়ে দিতে পারে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ، كَانَ لَكَ أَجْرًا فِي مَوَازِينِكَ»

তুমি তোমার গৃহপরিচারক থেকে যতটুকু কাজের ভার লাঘব করে দেবে তা কিয়ামতের দিন তোমার আমলের পাল্লায় প্রতিদান হিসেবে যুক্ত হবে।[১৭৪]

যে-সকল অধিকারকে ইসলামি শরিয়ায় উজ্জ্বল নিদর্শন মনে করা হয় তার অন্যতম হলো পরিচারক ও চাপরাশিদের নম্রতা প্রাপ্তির অধিকার। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করে বলেন,

«مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا»

যার সঙ্গে তার গৃহকর্মী আহার গ্রহণ করে, যে লোক গাধার পিঠে চড়ে বাজারে যায় এবং যে লোক ছাগী ধরে নিয়ে এসে দুধ দোহন করে তারা অহংকারী হতে পারে না।[১৭৫]

---

১৭৩. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, কিতাব : ক্রয়-বিক্রয়, বাব : স্বাধীন মানুষকে বিক্রয়কারীর পাপ, হাদিস নং ২১১৪; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২৪৪২; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ৬৪৩৬।

১৭৪. *ইবনে হিব্বান*, আমর ইবনে হারিস থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ৪৩১৪; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ১৪৭২; হুসাইন সালিম আসাদ বলেছেন, এ হাদিসের রাবিগণ বিশ্বস্ত।

১৭৫. ইমাম বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, খ. ২, পৃ. ৩২১, হাদিস নং ৫৬৮; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৮১৮৮।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ছিল তাঁর কথার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি যা বলতেন তা করতেন। সাইয়িদা আয়িশা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,

«مَا ضَرَبَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - شَيْئاً قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِماً»

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে কখনো কোনো প্রাণীকে, কোনো স্ত্রীর গায়ে এবং কোনো চাকরকেও প্রহার করেননি।[১৭৬]

আবু মাসউদ আনসারি রা. তার এক গোলামকে প্রহার করছিলেন। এই কাণ্ড দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যা বলেছিলেন তা এখানে স্মরণযোগ্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، اَللهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ»

হে আবু মাসউদ, জেনে রাখো, তুমি তার ওপর যতটুকু ক্ষমতাবান, আল্লাহ তোমার ওপর তার চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী।

আবু মাসউদ রা. বলেন, এ কথা শুনে তাকিয়ে দেখি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বললাম, আল্লাহর ওয়াস্তে আমি তাকে আজাদ করে দিলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ»

তুমি যদি তা না করতে তবে জাহান্নামের আগুন তোমাকে গ্রাস করত।[১৭৭]

---

১৭৬. মুসলিম, কিতাব : আল-ফাযায়িল, বাব : পাপকাজ থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু দূরে থাকা ..., হাদিস নং ২৩২৮; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৭৮৬; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৯৮৪।

১৭৭. মুসলিম, কিতাব : আল-আইমান, বাব : ক্রীতদাসের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা এবং দাসকে চপেটাঘাত করার কাফফারা..., হাদিস নং ১৬৫৯; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৫১৫৯;

প্রহার করা বা চড় দেওয়া বা কিল-ঘুষি দেওয়া বা লাথি মারা—এসব দুর্ব্যবহার কাজের লোকদের জন্য চরম অপমানজনক। যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপছন্দ করেন। এ কারণে কঠিন-হৃদয় মনিব বা মালিকের উত্তম শাস্তি হলো তাকে তৎক্ষণাৎ তার মালিকানা থেকে বঞ্চিত করা। এটাই ইসলামের মহত্ত্ব এবং ইসলামি সভ্যতার মাহাত্ম্য।

এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম ও গৃহকর্মী আনাস ইবনে মালিক রা. সত্য ও যথার্থ সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ। একদিন তিনি আমাকে কোনো কাজের জন্য পাঠাতে চাইলেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি কিছুতেই যাব না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে ছিল যে আল্লাহর নবী আমাকে যে কাজের জন্য যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আমি অবশ্যই সে কাজে যাব। আমি বেরিয়ে পড়লাম এবং কয়েকটি বালকের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। তারা বাজারে খেলাধুলা করছিল। হঠাৎ টের পেলাম কেউ একজন পেছন থেকে এসে আমার দুই কাঁধের ওপর হাত রেখেছেন। তাকিয়ে দেখি তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি মুচকি হাসছেন। আমাকে স্নেহময় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, «يَا أُنَيْسُ اِذْهَبْ حَيْثُ أَمَرْتُكَ»—'হে প্রিয় আনাস, আমি তোমাকে যে কাজে যেতে বলেছি সেখানে যাও।' আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি এখনই যাচ্ছি, হে আল্লাহর রাসুল। আনাস রা. বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি সাত বছর (অথবা বলেছেন, নয় বছর) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করেছি। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনো তিনি আমার কোনো কাজের ফলে বলেননি ওই কাজটি তুমি কেন করলে এবং কোনো কাজ না করার কারণেও বলেননি যে ওই কাজ তুমি কেন করলে না।[১৭৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহকর্মী ও পরিচারকদের ভালো-মন্দ এতটা খেয়াল করতেন যে তারা নিজেদের বিয়ের চেয়েও

সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং ১৯৪৮; আহমাদ, হাদিস নং ২২৪০৪; আল-আদাবুল মুফরাদ, খ. ১, পৃ. ২৬৪, হাদিস নং ১৭৩; তাবারানি, মুজামুল কাবির, হাদিস নং ৬৮৩।

১৭৮. মুসলিম, কিতাব : আল-ফাযায়িল, বাব : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী, হাদিস নং ২৩১০; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৭৭৩।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য ও খেদমতকে প্রাধান্য দিতেন। রবিয়া ইবনে কাব আল-আসলামি রা. থেকে এ ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'হে রবিয়া, তুমি বিয়ে করবে না?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কসম! আমি বিয়ে করতে চাই না। স্ত্রীকে ভরণপোষণের সামর্থ্যও আমার নেই। তা ছাড়া আমি চাই না কোনোকিছু আমাকে আপনার থেকে দূরে সরিয়ে দিক।' তিনি আমাকে আর কিছু বললেন না। আমি তার খেদমত করে যেতে থাকলাম। পরে আবারও একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'হে রবিয়া, তুমি বিয়ে করবে না?' আমি বললাম, 'আমি বিয়ে করতে চাই না। স্ত্রীকে লালনপালনের সামর্থ্যও আমার নেই। তা ছাড়া আমি চাই না কোনোকিছু আমাকে আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিক।' তিনি আমাকে আর কিছু বললেন না। এবার আমি মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করলাম এবং বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, দুনিয়া ও আখিরাতে যা-কিছু আমার জন্য কল্যাণকর সে ব্যাপারে আপনিই সবচেয়ে ভালো জানেন।' মনে মনে বললাম, যদি তিনি তৃতীয়বার আমাকে বিয়ে করতে বলেন, আমি অবশ্যই 'হ্যাঁ' বলব। তখন তৃতীয়বারের মতো তিনি আমাকে বললেন, 'হে রবিয়া, তুমি কি বিয়ে করবে না?' আমি বললাম, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল। আপনি আমাকে যা চান বা যা পছন্দ করেন তার আদেশ দিন।' তিনি বললেন যে, তুমি অমুক গোত্রে চলে যাও। অর্থাৎ, তিনি আনসারদের একটি গোত্রে চলে যেতে বললেন।[১৭৬]

শ্রমিক ও গৃহকর্মীদের প্রতি সদাচারের ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার মহত্ত্ব ও উদারতা সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল মুসলিম গৃহকর্মীদের প্রতিই নয়, বরং অমুসলিম গৃহকর্মীদের প্রতিও ছিলেন একইরকম স্নেহপরায়ণ ও মমতাবান। যে ইহুদি বালকটি তাঁর খেদমত করত তার সঙ্গে তিনি যে মমতাময় ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করেছেন তা আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে

---

[১৭৬]. *আহমাদ*, হাদিস নং ১৬৬২৭; *হাকিম*, হাদিস নং ২৭১৮; হাকিম বলেছেন, হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ, যদিও তিনি হাদিসটি সংকলন করেননি। *তায়ালিসি*, হাদিস নং ১১৭৩।

আছে। বালকটি একবার প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে যেতেন, তার শুশ্রূষা করতেন। ধীরে ধীরে সে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলো এবং মৃত্যুর উপক্রম হলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন এবং তার শিয়রে বসলেন। তারপর তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ছেলেটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার বাবার দিকে তাকাল। তার বাবা বলল, আবুল কাসিম যা বলছেন তা শোনো। বাবার সম্মতিতে ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করল। কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যু হলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন,

«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنقَذَهُ مِنَ النَّارِ»

> সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন।[১৮০]

সত্য দ্বীন ইসলাম শ্রমিক ও গৃহকর্মীদের এসব অধিকারের শেকড় প্রোথিত করে দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথায় ও কাজের মাধ্যমে এসব অধিকার বাস্তবায়িত করেছেন। তা ছিল এমন এক যুগে যখন মানুষ শ্রমিক, গৃহকর্মী ও ভৃত্যদের প্রতি দুর্ব্যবহার, জুলুম ও অত্যাচার করা ছাড়া আর কিছু জানত না। ইসলাম ও মুসলিমদের সভ্যতা কতটা মানবিক, কতটা মহৎ ও উৎকর্ষমণ্ডিত তা এ আলোচনা থেকে যথার্থ উপলব্ধ হয়।

---

১৮০. *বুখারি*, আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : জানাযা, বাব : 'যখন কোনো শিশু ইসলাম গ্রহণের পর মৃত্যুবরণ করে...', হাদিস নং ১২৯০।

৪. চতুর্থ অনুচ্ছেদ

অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার

অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের গুরুত্ব প্রদানে ইসলাম ও ইসলামি সভ্যতার বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে। এ কারণে তাদের প্রতি কতিপয় শরয়ি বিধান লাঘব করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ...﴾

অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোঁড়াদের জন্য দোষ নেই এবং রুগ্ণের জন্যও দোষ নেই...।[১৮১]

এই আয়াত দ্বারা তাদের অন্তরে আশা সঞ্চার করা হয়েছে এবং তাদের দৈহিক ও আত্মিক অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই জানতে পারতেন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তাকে দেখার জন্য তার বাড়িতে ছুটে যেতেন। এতে কোনো ধরনের লৌকিকতা ছিল না, কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ব পালনের জন্যই তিনি অসুস্থ ও রোগীর কাছে ছুটে যেতেন। কেন তা হবে না? কারণ তিনি অসুস্থকে দেখতে যাওয়া ও তার শুশ্রূষা করা তার একটি অধিকার বলে ঘোষণা করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ ... وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ...»

এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের পাঁচটি অধিকার রয়েছে : ...এবং অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া...।[১৮২]

---

১৮১. সুরা নুর : আয়াত ৬১; সুরা ফাতাহ : আয়াত ১৭।

১৮২. বুখারি, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাবুল জানায়িয, বাব : জানাযায় অংশগ্রহণের নির্দেশ, হাদিস নং ১১৮৩; মুসলিম, কিতাব : আস-সালাম, বাব : এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের অধিকার হলো সালামের জবাব দেওয়া, হাদিস নং ২১৬২।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সকলের অভিভাবক এবং সবার আদর্শ। তিনি অসুস্থ ও রোগীর কাছে গিয়ে তার অসুস্থতা ও জটিলতাকে সহজ করে দিতেন। কোনো ধরনের ভণিতা ও লৌকিকতা ছাড়াই তার প্রতি সহানুভূতি, আগ্রহ ও ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। এতে রোগী ও তার পরিবার নিজেদের সুখী ও সৌভাগ্যবান মনে করত। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, সাদ ইবনে উবাদা রা. অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে এলেন। তার সঙ্গে ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে তাকে পরিবারের সেবা-শুশ্রূষাকারীদের মধ্যে দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কি মারা গেছে?' ঘরের লোকেরা জবাব দিলো, 'না, হে আল্লাহর রাসুল।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে ফেললেন। তার কান্না দেখে যারা উপস্থিত ছিলেন তারাও কেঁদে ফেললেন। তখন তিনি বললেন,

«أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ»

তোমরা শুনে রেখো, চোখের অশ্রু ঝরানোর কারণে এবং হৃদয়ের বেদনার কারণে আল্লাহ তাআলা কাউকে শাস্তি দেন না, বরং তিনি শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন এর কারণে।—এ কথা বলে তিনি জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন।[১৮৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগাক্রান্তদের জন্য দোয়া করতেন এবং তারা রোগের কারণে যে সওয়াব ও প্রতিদান পাবে তার সুসংবাদ দিতেন। এতে রোগীদের কাছে রোগের ব্যাপারটা হালকা হয়ে যেত এবং তারা এই অবস্থায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করত। এ ব্যাপারে উম্মুল আলা রা.[১৮৪] থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ

---

১৮৩. *বুখারি*, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : অসুস্থের পাশে কান্না করা, হাদিস নং ১২৪২; *মুসলিম*, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না, হাদিস নং ৯২৪।

১৮৪. হাকিম ইবনে হিযাম রা.-এর ফুফু। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ এবং বাইআত করেছিলেন। ইবনুল আসির, *উসদুল গাবাহ*, খ. ৭, পৃ. ৪০৫; ইবনে হাজার আসকালানি, *আল-ইসাবাহ*, খ. ৭, পৃ. ২৬৫।

ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে এসে বললেন,

«أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلَاءِ! فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»

হে উম্মুল আলা, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। কোনো মুসলিম রোগাক্রান্ত হলে আল্লাহ তাআলা তার রোগের কারণে তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন, যেভাবে আগুন স্বর্ণ ও রুপার ভেজাল দূর করে দেয়।[১৮৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থের ওপর হুকুম-আহকাম সহজ করা এবং কোনো কষ্টকর বিষয় চাপিয়ে না দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ছিলেন। এ ব্যাপারে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার আমরা এক সফরে বের হলাম। আমাদের একজন সদস্যের মাথায় পাথরের আঘাত লাগল এবং যখম হয়ে গেল। তারপর তার স্বপ্নদোষ হলো। সে তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি আমার এ অবস্থায় তায়াম্মুমের অনুমতি আছে বলে মনে করো? তারা বলল, তোমার জন্য অনুমতি আছে বলে মনে করি না। কারণ তুমি তো পানি পাচ্ছ। ফলে সে গোসল করল এবং গোসলের কারণে মারা গেল। তারপর আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম। তাঁকে সংবাদটি জানানো হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ (أَوْ يَعْصِبَ. شَكَّ مُوسَى) عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»

তারা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদের সমুচিত শাস্তি দিন। তারা যখন নিজেরা জানে না তখন কেন অন্যদের থেকে জেনে নিলো না। নিশ্চয় অজ্ঞতার নিরাময় হলো জিজ্ঞাসা। তার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, সে তায়াম্মুম করে নিত এবং তার মাথার যখমে

---

১৮৫. সুনানে আবু দাউদ, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : নারীদের শুশ্রূষা, হাদিস নং ৩০৯২।

> একটি পট্টি বেঁধে নিত, তারপর পট্টির ওপর মাসাহ করত এবং বাকি শরীর ধুয়ে নিত।[১৮৬]

বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থের প্রয়োজনে তার ডাকে সাড়া দিতেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একবার তাঁর কাছে এক মহিলা এলো। তার মস্তিষ্কে কিছু ত্রুটি ছিল। সে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার সঙ্গে আমার প্রয়োজন রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«يَا أُمَّ فُلاَنٍ، انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ»

> হে অমুকের মা, তুমি যেকোনো গলি দেখে নাও, (তুমি ডাক দিলে সেখানে) আমি তোমার কাজ করে দেবো।

তারপর তিনি কোনো পথের মধ্যে মহিলার সঙ্গে দেখা করলে[১৮৭] সে তার প্রয়োজন সেরে নিলো।[১৮৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য চিকিৎসা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। কারণ শরীরের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুস্থতা ইসলামের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ কারণে গ্রাম্য ব্যক্তিরা চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বলেন,

«تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً إِلاَّ الْهَرَمُ»

---

১৮৬. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : আত-তাহারাত, বাব : আহত ব্যক্তি তায়াম্মুম করবে, হাদিস নং ৩৩৬, *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৫৭২; *আহমাদ*, হাদিস নং ৩০৫৭; *দারেমি*, হাদিস নং ৭৫২; *দারাকুতনি*, হাদিস নং ৩; বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১০১৬।

১৮৭. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাটির সঙ্গে লোক চলাচলের রাস্তায় একপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলেছিলেন এবং একান্তে মহিলার প্রয়োজনের কথা শুনেছিলেন। সবার চোখের অন্তরালে মহিলার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তা নয়। কারণ, লোকেরা তাদের দুইজনকেই দেখতে পাচ্ছিল, যদিও তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিল না। কারণ মহিলার জিজ্ঞাসার ব্যাপারটি ছিল গোপনীয়। ইমাম নববি, *আল-মিনহাজ ফি শারহি সহিহি মুসলিম*, খ. ১৫, পৃ. ৮৩।

১৮৮. *মুসলিম*, আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ফাযায়িল, বাব : নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া এবং তাঁর থেকে তাদের বরকত নেওয়া, হাদিস নং ২৩২৬; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৪০৭৮; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪৫২৭।

হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা রোগ-ব্যাধিতে ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করো, কারণ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক সৃষ্টি করেছেন, কেবল বার্ধক্য ব্যতীত।[১৮৯] (জরা বা বার্ধক্য দূর করার কোনো ওষুধ নেই।)

একইভাবে মুসলিম নারী কর্তৃক মুসলিম পুরুষের চিকিৎসা করায় নিষেধাজ্ঞা ছিল না। রুফাইদা[১৯০] রা. আসলাম গোত্রের নারী ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে সাদ ইবনে মুআয রা. তিরের আঘাতে আহত হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুফাইদাকে তার চিকিৎসায় নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি আহতদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করতেন। আর্ত মুসলিমদের সেবাযত্ন করাকে তিনি সওয়াবের উসিলা মনে করতেন।[১৯১]

বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবনুল জামুহ রা.-এর সঙ্গে অধিকতর শিষ্টাচারপূর্ণ ও কোমল আচরণ করেছিলেন। আমর ইবনুল জামুহ রা. শারীরিক প্রতিবন্ধী ছিলেন। তিনি খঞ্জ বা খোঁড়া ছিলেন। তার খঞ্জত্ব ছিল প্রচণ্ড। তার সিংহের মতো চারজন পুত্র ছিলেন। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। ওহুদ যুদ্ধের দিন তারা পিতাকে আটকে রাখতে চাইলেন। তাকে বললেন, বাবা, আল্লাহ তাআলা আপনাকে অপারগ বানিয়েছেন। (সুতরাং আপনি বাড়িতেই থাকুন।) আমর ইবনুল জামুহ রা. তার পুত্রদের কথা শুনলেন

---

১৮৯. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : চিকিৎসা, বাব : পুরুষের চিকিৎসা গ্রহণ, হাদিস নং ৩৮৫৫; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২০৩৮; তিনি বলেছেন, এটি হাসান সহিহ। *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩৪৩৬; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৮৪৭৭। শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ, এর বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত এবং তাদের থেকে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম হাদিস বর্ণনা করেছেন। *গায়াতুল মারাম*, হাদিস নং ২৯২।

১৯০. রুফাইদাহ আল-আসলামিয়্যাহ : ইসলামে প্রথম মুসলিম মহিলা নার্স ও চিকিৎসক হিসেবে স্বীকৃত। তিনি ছিলেন শল্য চিকিৎসক। খন্দক ও খাইবারের যুদ্ধে তিনি আহতদের চিকিৎসা ও সেবা দিয়েছেন। মসজিদে নববির পাশেই ছিল তার মেডিক্যেল ক্যাম্প। তার সেবা ও চিকিৎসার স্বীকৃতিস্বরূপ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুজাহিদদের সঙ্গে তাকেও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ দেন।

১৯১. ইমাম বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, খ. ১, পৃ. ৩৮৫, হাদিস নং ১১২৯; ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ২৩৯; ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৩, পৃ. ২৩৩।

না। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। বললেন, আমার ছেলেরা আমাকে আটকে রাখতে চায়। কারণ আমি খোঁড়া। অথচ আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করতে চাই। আল্লাহর কসম! আমি এই খঞ্জত্ব নিয়ে জান্নাতে পদচারণ করতে চাই। তার কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, «أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ عَذَرَكَ اللهُ فَلَا جِهَادَ عَلَيْكَ»–'আল্লাহ তাআলা আপনাকে অপারগ (মাযুর) বানিয়েছেন। সুতরাং আপনার ওপর কোনো জিহাদ নেই (জিহাদ ফরয নয়)।' তারপর তার সন্তানদের উদ্দেশে বললেন, «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَمْنَعُوهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةَ»–'তাকে আটকে না রাখাই তোমাদের জন্য সংগত। আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা তাকে শাহাদাত দান করবেন।' ফলে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন এবং শহিদ হলেন। পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে বললেন,

«وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوْحِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَطَأُ فِي الْجَنَّةِ بِعَرْجَتِهِ»

> যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, সে যদি আল্লাহর নামে কসম খায়, আল্লাহ সেই কসম পূর্ণ করেন। তাদের একজন হলো আমর ইবনুল জামুহ। আমি তাকে দেখেছি যে, সে জান্নাতে তার খঞ্জত্ব নিয়েই বিচরণ করছে।[১৯২]

ইসলামে ও ইসলামি সভ্যতার ছায়াতলে এমনই ছিল অসুস্থ, রোগী ও প্রতিবন্ধীদের অবস্থা।

---

১৯২. *ইবনে হিব্বান*, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : সাহাবিগণের মর্যাদা সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, হাদিস নং ৭০২৪; শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ 'জাইয়্যিদ' (উত্তম মানসম্পন্ন)। ইবনে সাইয়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, খ. ১, পৃ. ৪২৩; মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আস-সালেহি আশ-শামি, *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ফি সিরাতি খাইরিল ইবাদ*, খ. ৪, পৃ. ২১৪।

৫. পঞ্চম অনুচ্ছেদ

এতিম, নিঃস্ব ও বিধবাদের অধিকার

ইসলামি শরিয়ার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তা এতিম, নিঃস্ব ও বিধবাদের অধিকার সুরক্ষিত করেছে এবং বস্তুগত ও আদর্শিক সুরক্ষাদানের মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজে তাদের নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করেছে। আল্লাহ তাআলা এতিমদের প্রতি স্নেহ ও মমতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾

সুতরাং তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না।[১১৩]

একইভাবে মিসকিন ও অভাবগ্রস্তদের আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত প্রাপ্য প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾

আত্মীয়স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দেবে এবং অভাবগ্রস্ত[১১৪] ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না।[১১৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসকিন, নিঃস্ব ও বিধবাদের অধিকার অধিকতর সংহতকরণে তাঁর উম্মাহর সকল সদস্যকে তাদের প্রয়োজন পূরণে প্রচেষ্টা ব্যয় করার জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং যারা বিধবা ও অভাবগ্রস্তদের খোঁজখবর রাখে ও দেখাশোনা করে তাদের অকল্পনীয় মর্যাদার ঘোষণা দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ»

---

১১৩. সুরা দুহা : আয়াত ৯।

১১৪. মিসকিন বা অভাবগ্রস্ত : নিজের আবশ্যক প্রয়োজন পূরণ করার মতো অর্থ যার কাছে নেই। দেখুন, ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, ভুক্তি : 'সিন', খ. ১৩, পৃ. ২১১।

১১৫. সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ২৬।

বিধবা ও নিঃস্বদের সহযোগিতাকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মতো, অথবা (তিনি বলেছেন,) রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিবসে রোযা পালনকারীর মতো।[১৯৬]

সুতরাং এর চেয়ে বড় প্রতিদান, এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতিমদের প্রতি অনুগ্রহ করা, মমতা দেখানো ও স্নেহপরায়ণ হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এর জন্য মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এভাবে তিনি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুরক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে এতিমদের অধিকারের শেকড় প্রোথিত করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ»—'আমি ও এতিমের লালনপালনকারী জান্নাতে এরূপ থাকব।'[১৯৭]

এ কথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

এতিমদের প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের দয়া, মমতা ও স্নেহ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাহর সদস্যদের এতিমদেরকে তাদের সন্তানদের সঙ্গে যুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ»

যে ব্যক্তি কোনো এতিমকে দুজন মুসলিম মাতাপিতার পানাহারের সাথে যুক্ত করবে, যাতে তার সব প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে।[১৯৮]

---

১৯৬. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : ভরণপোষণ, বাব : পরিবারের জন্য খরচের ফজিলত, হাদিস নং ৫০৩৮; *মুসলিম*, কিতাব : আয-যুহদ ওয়ার-রাকায়িক, বাব : বিধবা, মিসকিন ও এতিমের প্রতি অনুগ্রহ ও সদাচার, হাদিস নং ২৯৮২।

১৯৭. *বুখারি*, সাহল ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আদাব, বাব : এতিমকে লালনপালনের ফজিলত, হাদিস নং ৫৬৫৯; *মুসলিম*, কিতাব : আয-যুহদ ওয়ার-রাকায়িক, বাব : বিধবা, মিসকিন ও এতিমের প্রতি অনুগ্রহ ও সদাচার, হাদিস নং ২৯৮৩।

১৯৮. *আহমাদ*, হাদিস নং ১৯০৪৭, শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি সহিহ লি-গাইরিহি...। *আল-আদাবুল মুফরাদ*, খ. ১, পৃ. ৪১, হাদিস নং ৭৮; তাবারানি, *মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ৮৭০; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ৯২৬।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ইসলামি ব্যবস্থা এতিম, মিসকিন ও বিধবাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে না যে তাদের কেবল বস্তুগত চাহিদাগুলো পূরণ করা প্রয়োজন, বরং তাদের এভাবে মূল্যায়ন করে যে, তারা মানবমণ্ডলীর সদস্য কিন্তু ভালোবাসা ও মায়া-মমতা থেকে বঞ্চিত। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অনুসারীদেরকে মিসকিন ও এতিমদের প্রতি কোমলহৃদয় ও মমতাময় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের কষ্ট ও দুঃখভার লাঘব করার আদেশ দিয়েছেন। এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তার হৃদয়ের কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগ করেছিল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন,

«أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ وتُدْرِكَ حَاجَتَكَ اِرْحَمِ الْيَتِيمَ وامْسَحْ رَأْسَهُ وأَطْعِمْهُ مِنْ طَعامِكَ يَلِنْ قَلْبُكَ وتُدْرِكْ حاجَتَكَ»

তুমি কি চাও তোমার অন্তর কোমল হোক এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হোক? তাহলে এতিমের প্রতি স্নেহশীল হও, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও এবং তোমার খাবার থেকে তাকে খাওয়াও। তাহলে তোমার অন্তর কোমল হবে এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে।[১৯৯]

অন্যদিকে ইসলামি শরিয়ত এতিমদের সম্পদ আত্মসাৎ ও তাদের প্রতি জুলুম করার ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ... وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ»

সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে দূরে থাকো ... এতিমের মাল আত্মসাৎ করা।[২০০]

শুধু তাই নয়, ইসলাম মিসকিন ও এতিমদের জন্য সম্পদ ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

১৯৯. *আহমাদ*, হাদিস নং ৭৫৬৬; বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ৬৮৮৬; আবদ ইবনে হুমাইদ, হাদিস নং ১৪২৬।

২০০. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ওয়াসায়া, বাব : আল্লাহর বাণী : 'যারা অন্যায়ভাবে এতিমের মাল গ্রাস করে...' (সুরা নিসা : আয়াত ১০), হাদিস নং ২৬১৫; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : কবিরা গুনাহ এবং এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ, হাদিস নং ৮৯।

«وَإِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ»

এই সম্পদ হলো চিত্তমোহিনী ও সুস্বাদু[২০১]। সুতরাং সে-ই ভাগ্যবান মুসলিম যে এই সম্পদ থেকে মিসকিন, এতিম ও মুসাফিরকে দান করে।[২০২]

নৈতিক দিক থেকে ইসলাম এর চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছে। দেখা যাচ্ছে যে, যে ওলিমার ভোজে কেবল ধনীরা উপস্থিত হয়, গরিব ও এতিম-মিসকিনদের দাওয়াত দেওয়া হয় না, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিন্দা করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُولَهُ»

যে ওলিমার ভোজে ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং গরিবদের দাওয়াত দেওয়া হয় না তা কত নিকৃষ্ট ভোজ! আর কেউ যদি দাওয়াত গ্রহণ না করে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নাফরমানি করল।[২০৩]

এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, আমরা দেখি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে এতিম, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের ভরণপোষণের দায়িত্বভার নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

২০১. সতেজ-সবুজ ও সুস্বাদু : সম্পদের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা, লোভ ও লালসা থাকার কারণে একে সতেজ-সবুজ-সুস্বাদু ফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শুকনো ও শক্ত জিনিসের চেয়ে সবুজ ও সতেজ জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি। একইভাবে তিক্ত বস্তুর চেয়ে সুস্বাদু বস্তু বেশি লোভনীয়। দুটির তুলনা একসঙ্গে উপস্থিত করলে অধিকতর বিস্ময় ও অভিভূতি বোঝানো হয়। ইবনে হাজার আসকালানি, *ফাতহুল বারি*, খ. ৩, পৃ. ৩৩৬।

২০২. *বুখারি*, আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আয-যাকাত, বাব : এতিমদের জন্য সদকা, হাদিস নং ১৩৯৬; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ২৫৮১; *আহমাদ*, হাদিস নং ১১১৭৩।

২০৩. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করল না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হলো, হাদিস নং ৪৮৮২; *মুসলিম*, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : দাওয়াত প্রদানকারীর দাওয়াতে যাওয়ার নির্দেশ, হাদিস নং ১৪৩২।

«أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي، فَأَنَا وَلِيُّهُ»

মহা মহীয়ান আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমি অন্যসব লোক অপেক্ষা মুমিনদের অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ঋণ অথবা নিঃসম্বল পরিজন রেখে গেলে তোমরা আমাকে ডাকবে, আমি তার অভিভাবক।[২০৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলতেন তা দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«كَانَ لَا يَأْنَفُ وَلَا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُمَا حَاجَتَهُمَا»

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিধবা ও মিসকিনদের সঙ্গে হাঁটতে তুচ্ছতা বোধ করতেন না এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন।[২০৫]

এইভাবে ইসলাম এতিম, বিধবা ও মিসকিনদের যাবতীয় নৈতিক ও বস্তুগত অধিকারের সুরক্ষা প্রদান করেছে এবং মানবসভ্যতায় তাদের অবস্থান সংহত করেছে।

---

২০৪. *বুখারি*, কিতাব : আল-ফারায়িয, বাব : কোনো মেয়েলোকের দুজন চাচাতো ভাই, তাদের একজন যদি মা-শরিক ভাই হয় এবং অপরজন যদি স্বামী হয়, হাদিস নং ৬৩৬৪; *মুসলিম*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ফারায়িয, বাব : কেউ সম্পদ রেখে গেলে তা তার উত্তরাধিকারীদের, হাদিস নং ১৬১৯।

২০৫. *নাসায়ি*, কিতাব : আল-জুমুআ, বাব : খুতবা সংক্ষিপ্ত করা মুস্তাহাব, হাদিস নং ১৪১৪; *দারেমি*, হাদিস নং ৭৪; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৬৪২৩। শুআইব আরনাউত বলেছেন, ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটির সনদ সহিহ। তাবারানি, *আল-মুজামুস সগির*, হাদিস নং ৪০৫। *মিশকাতুল মাসাবিহ*, হাদিস নং ৫৮৩৩।
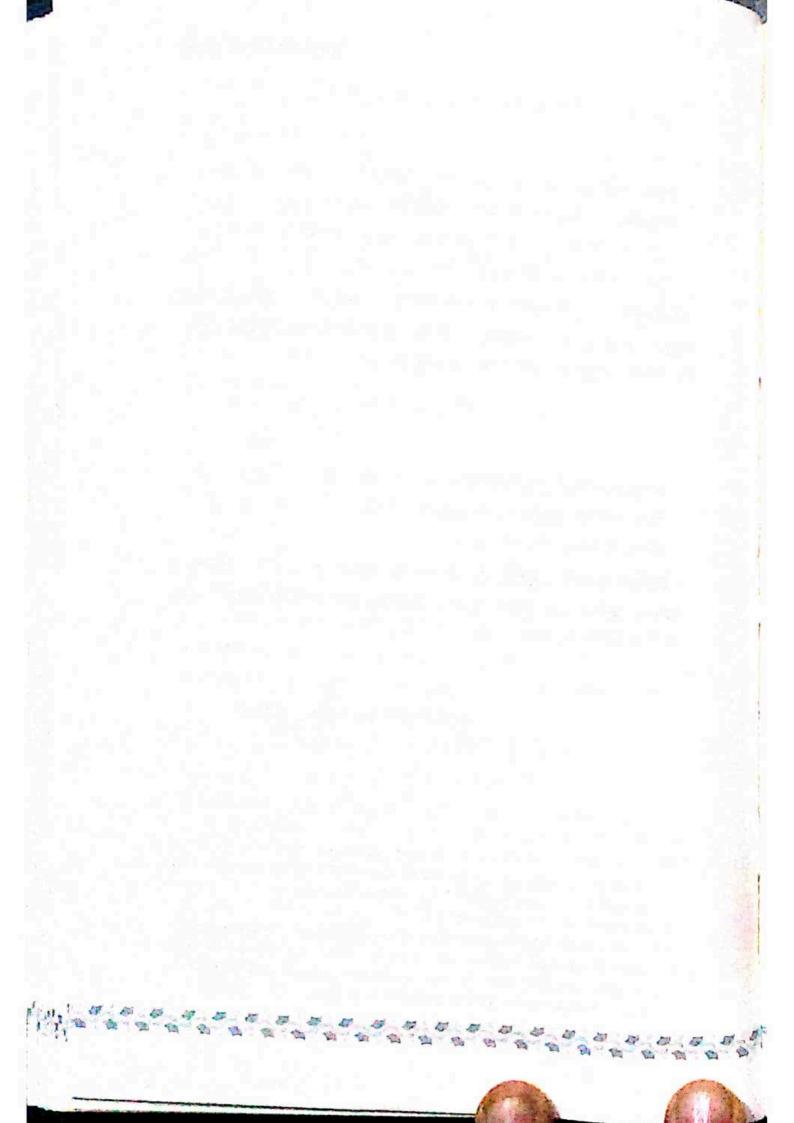
৬. ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

সংখ্যালঘুদের অধিকার

মুসলিম সমাজে ইসলামি শরিয়ার ছায়াতলে অমুসলিম সংখ্যালঘুরা যে অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে, পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো সংবিধানে অন্য সংখ্যালঘুরা এত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করেনি। তার কারণ এই যে, মুসলিম সমাজ ও অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সম্পর্কের ভিত্তি ও নীতিমালা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

> দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।[২০৬]

মুসলিমরা অমুসলিমদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে তার নৈতিক ও আইনগত ভিত্তি নির্দেশিত হয়েছে উল্লিখিত আয়াতে। অর্থাৎ, যারা শত্রুতা পোষণ করে না তাদের জন্য রয়েছে মহানুভবতা, সদাচার ও ন্যায়বিচার। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মানবজাতি এমন মৌলিক নীতির কথা শোনেনি। তারপর বহু শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, কিন্তু মানবজাতি এই মূলনীতির অভাবের ফলে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছে। আজও আধুনিক সমাজগুলোতে এমন মূলনীতি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, কিন্তু তাতে সফল হওয়া যায়নি। কারণ কী? কারণ হলো পক্ষপাত, স্বজনপ্রীতি ও বর্ণবাদ।

---

২০৬. সুরা মুমতাহিনা : আয়াত ৮।

উল্লিখিত মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামি শরিয়া অমুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য যে-সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিশ্বাস ও মতাদর্শের স্বাধীনতা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ﴾

> দ্বীনের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি নেই, সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে।[২০৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামেনের আহলে কিতাব (ইহুদি ও নাসারা)-এর উদ্দেশে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন, তাতে বিশ্বাস ও মতাদর্শের স্বাধীনতার ব্যাপারটি চমৎকারভাবে প্রতিভাত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> «وَإِنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ إِسْلَامًا خَالِصًا مِنْ نَفْسِهِ فَدَانَ دِينَ الإِسْلَامِ فَإِنَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ وَمَنْ كَانَ عَلَى نَصْرَانِيَّتِهِ أَوْ يَهُودِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ عَنْهَا»
>
> কোনো ইহুদি বা খ্রিষ্টান যদি একনিষ্ঠভাবে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের ওপর জীবনযাপন করে তবে; সে মুমিন ও মুসলিম গণ্য হবে। মুসলিমদের যেসব অধিকার রয়েছে তারও একই অধিকার থাকবে এবং মুসলিমদের যে দায়বদ্ধতা রয়েছে তারও একই দায়বদ্ধতা থাকবে। আর যারা তাদের খ্রিষ্টধর্ম ও ইহুদিধর্মের ওপর থেকে যাবে তাদেরকে ধর্মত্যাগের জন্য জোর করা হবে না।[২০৮]

---

[২০৭]. সুরা বাকারা : আয়াত ২৫৬।

[২০৮]. আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সালাম, *আল-আমওয়াল*, পৃ. ২৮; ইবনে যানজুইয়াহ, *আল-আমওয়াল*, খ. ১, পৃ. ১০৪; ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৫৮৮; ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৫, পৃ. ১৪৬। ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেছেন, ইবনে যানজুইয়াহ *আল-আমওয়াল* গ্রন্থে নসর ইবনে আসিম, আওফ, হাসান বসরি রহ. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্র লিখলেন...। এভাবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এই মুরসাল হাদিসদুটি পরস্পরকে শক্তিশালী করেছে। ইবনে হাজার আসকালানি, *আত-তালখিসুল হাবির*, খ. ৪, পৃ. ৩১৫।

ইসলামি শরিয়া অমুসলিমদেরকে কেবল বিশ্বাস ও মতাদর্শের স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ দিয়েছে, এর বিপরীতে তাদের জীবন-সুরক্ষার বিধান দেয়নি তা কিন্তু নয়। মানুষ হিসেবে তাদের অস্তিত্বরক্ষা ও সুন্দর জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। এ ব্যাপারে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»

যে ব্যক্তি এমন লোককে হত্যা করবে, যার সঙ্গে তার সন্ধি[২০৯] রয়েছে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।[২১০]

যারা ইসলামি রাষ্ট্রে কর দিয়ে থাকে অথবা যাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি রয়েছে তাদের প্রতি জুলুম ও তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন না করতে সতর্ক করেছেন এবং নিজেকে তাদের প্রতি সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করেছেন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

যে ব্যক্তি এমন কোনো লোকের ওপর জুলুম করে, যার সঙ্গে তার সন্ধি হয়েছে, অথবা তার কোনোপ্রকার ক্ষতি সাধন করে অথবা সাধ্যের অতিরিক্ত তাকে কষ্ট দেয় কিংবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তার কাছ থেকে কোনো জিনিস আদায় করে, কিয়ামতের দিন আমি (এমন মাজলুমের পক্ষ থেকে) প্রতিবাদ করব।[২১১]

---

২০৯. আরবি 'মুআহিদ' শব্দটি 'জিম্মি' শব্দ থেকে ব্যাপকার্থক। কাফেরদের মধ্যে যারা যুদ্ধত্যাগের ইচ্ছা করবে অর্থাৎ শান্তিচুক্তি করবে তাদের জন্যও শব্দটি প্রযোজ্য। ইবনুল আসির, *আন-নিহায়া ফি গারিবিল হাদিস ওয়াল-আসার*, খ. ৩, পৃ. ৬১৩।

২১০. *বুখারি*, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, আবওয়াবুল জিযয়া ওয়াল-মুওয়াদাআহ, বাব : যার সঙ্গে চুক্তি রয়েছে বিনা অপরাধে তাকে হত্যা করার পাপ, হাদিস নং ২৯৯৫; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৭৬০; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ৪৭৪৭।

২১১. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : আল-খারাজ, বাব : তা'শির আহলিয যিম্মাতি ইযা ইখতালাফু বিততিজারাতি, হাদিস নং ৩০৫২; বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১৮৫১১।

খাইবারে আনসারদের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছিল তাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন, তা এই ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। খাইবারে আবদুল্লাহ ইবনে সাহল আনসারি রা. নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ড ইহুদিদের ভূমিতে সংঘটিত হয়। স্বাভাবিক কারণেই অধিকতর সম্ভাবনা ছিল যে হত্যাকারী একজন ইহুদি। তা সত্ত্বেও এখানে এই ধারণার পক্ষে দলিল-প্রমাণ নেই। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের কাউকে কোনোরূপ শাস্তি দেননি। বরং শুধু নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন হলফ করে বলে যে, তারা হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি বা হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল না। সাহল ইবনে আবু হাসমা রা. বর্ণনা করেন যে, তার গোত্রের একদল লোক খাইবার গমন করল এবং সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেল এবং যাদের কাছে তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল তাদেরকে তারা বলল, তোমরা আমাদের সঙ্গীকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আমরা তাকে হত্যা করিনি, তার হত্যাকারী সম্পর্কে জানিও না। এরপর তারা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গেল এবং বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা খাইবারে গিয়েছিলাম। তখন সেখানে আমাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেলাম।' নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, «اَلْكُبْرَ اَلْكُبْرَ»—'তোমাদের বয়োবৃদ্ধকে বলতে দাও, তোমাদের বয়োবৃদ্ধকে বলতে দাও।' তারপর তাদের বললেন, «تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ»—'তোমাদেরকে তার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে হবে।' তারা বলল, 'আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই।' তিনি বললেন, «فَيَحْلِفُونَ»—'তাহলে ওরা হলফ করে নেবে।' তারা বলল, 'ইহুদিদের কসমে আমাদের আস্থা নেই।' এই নিহতের রক্ত মূল্যহীন হয়ে যাক তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দ করলেন না। তাই সাদাকার একশ উট প্রদান করে তার রক্তপণ আদায় করলেন।[illegible]

এই ঘটনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন যা কেউ কল্পনাও করেনি। মুসলিমদের সম্পদ থেকে

[illegible]. বুখারি, কিতাব : রক্তপণ, বাব : শপথ, হাদিস নং ৬৫০২; মুসলিম, কিতাব : আল-কাসামা ওয়াল-মুহারিবিন ওয়াল-কিসাস ওয়াদ দিয়াত, বাব : আল-কাসামা, হাদিস নং ১৬৬৯।

রক্তপণ আদায়ের জন্য তিনি নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এতে আনসারদের ক্রোধ প্রশমিত হলো এবং ইহুদিদের প্রতিও কোনো জুলুম করা হলো না। সন্দেহের তির ইহুদিদের দিকে থাকা সত্ত্বেও দণ্ডবিধি কার্যকর না করে ইসলামি রাষ্ট্র নিজের কাঁধে বোঝা তুলে নিয়েছে!

একইভাবে ইসলামি শরিয়া অমুসলিমদের সম্পদ সুরক্ষার অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং যথাযথ হেতু ব্যতীত তাদের সম্পদ হস্তগত করা, কেড়ে নেওয়া বা আত্মসাৎ করা হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যেমন চুরি করা, ছিনতাই করা বা ধ্বংস করে দেওয়া ইত্যাদি যেকোনো অনাচারমূলক পন্থা অবলম্বন করা। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে নাজরানের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত ঘোষণার বাস্তবিক রূপ আমরা দেখতে পাই। বলা হয়েছে,

«وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا جِوَارُ اللهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَبِيَعِهِمْ، وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيْهِمْ مِنْ قَلِيْلٍ أَوْ كَثِيْرٍ»

নাজরান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তা ও আল্লাহর রাসুল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিম্মাদারি রয়েছে। এই নিরাপত্তা ও জিম্মাদারি তাদের সম্পদ, তাদের মতাদর্শ, তাদের উপাসনালয় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে যা কিছু রয়েছে তা কম বা বেশি হোক সবকিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[২১৩]

এর চেয়েও চমৎকার ব্যাপার হলো ইসলামি রাষ্ট্র অমুসলিম সংখ্যালঘুদের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। দরিদ্রতা, অপারগতা, বার্ধক্য ইত্যাদি যেকোনো মানবিক সমস্যার ক্ষেত্রে ইসলামি রাজকোষ বা বাইতুল মাল থেকে তাদের খোরপোশ প্রদান করা হবে। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّ رَاعٍ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

২১৩. বাইহাকি, *দালাইলুন নুবুওয়া*, বাব : নাজরানের প্রতিনিধি, খ. ৫, পৃ. ৪৮৫; আবু ইউসুফ, খারাজ, পৃ. ৭২; ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ২৮৮।

> তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার অধীন লোকদের (প্রজাদের) ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।[২১৪]

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমরাও মুসলিমদের মতোই সম্পূর্ণরূপে প্রজা। আল্লাহ তাআলার সামনে ইসলামি রাষ্ট্রকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

এ ব্যাপারে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। আবু উবাইদ[২১৫] তার *আল-আমওয়াল* গ্রন্থে বর্ণনা করেন, সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব[২১৬] রহ. বলেছেন,

«تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَهِيَ تُجْرَى عَلَيْهِمْ»

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদি বাসিন্দাদের সদকা দিতেন। তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।[২১৭]

এ ব্যাপারে ইসলামের মহত্ত্ব ও ইসলামি সভ্যতার মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো সুন্নতে নববির গ্রন্থসমূহে বর্ণিত একটি ঘটনা। একবার নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে একটি জানাযা গেল। তিনি জানাযার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। তাঁকে বলা হলো, লোকটা তো ইহুদি। তখন তিনি বললেন, «أَلَيْسَتْ نَفْسًا»—'সে কি মানুষ নয়?'[২১৮]

ইসলাম ও ইসলামি সভ্যতায় এমনই ছিল অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার। মূলনীতি হলো এই, প্রত্যেক মানবিক সত্তার প্রতি সম্মান বজায় রাখতে হবে, যতক্ষণ না সে জুলুম করে অথবা সীমালঙ্ঘন করে।

---

[২১৪]. *বুখারি*, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : দাসমুক্তি, বাব : গোলামের ওপর নির্যাতন করা এবং 'আমার গোলাম', 'আমার বাঁদি' বলা অপছন্দনীয়, হাদিস নং ২৪১৬; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ইমারাহ, বাব : ন্যায়পরায়ণ শাসকের মর্যাদা এবং অপরাধীর শাস্তি, হাদিস নং ১৮২৯।

[২১৫]. আবু উবাইদ : আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সালাম আল-হারাবি (১৫৭-২২৪ হি./৭৭৪-৮৩৮ খ্রি.)। বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকিহ ও সাহিত্যিক। হেরাতে জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদ ও মিশরে ভ্রমণ করেন। মৃত্যুবরণ করেন মক্কায়। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১০, পৃ. ৪৯০-৪৯২।

[২১৬]. সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব : আবু মুহাম্মাদ সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব ইবনে হুযন আল-কুরাশি (১৩-৯৪ হি./৬৩৪-৭১৩ খ্রি.)। সায়্যিদুত তাবিয়িন। মদিনার সাতজন ফকিহর অন্যতম। যেমন ছিলেন হাদিসশাস্ত্রবিদ ও বিদগ্ধ ফকিহ, তেমনই ছিলেন আল্লাহওয়ালা ও দুনিয়াবিমুখ। দেখুন, ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৫, পৃ. ১১৯-১৪৩।

[২১৭]. আবু উবাইদ, *আল-আমওয়াল*, পৃ. ৬১৩।

[২১৮]. *মুসলিম*, কায়স ইবনে সাদ ও সাহল ইবনে হানিফ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : জানাযার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো, হাদিস নং ৯৬১; *আহমাদ*, হাদিস নং ২৩৮৯৩।

৭. সপ্তম অনুচ্ছেদ

জীবজন্তুর অধিকার

ইসলাম জীবজন্তু ও প্রাণিকুলের প্রতি বাস্তবিক ও সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়েছে। মানবজীবনে প্রাণিকুলের গুরুত্ব, মানুষের জন্য তাদের উপকার, জগৎ নির্মাণ ও জীবনের ধারাবাহিকতায় মানুষের সঙ্গে তাদের সহযোগিতার ওপর এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি স্থাপিত রয়েছে। ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে সবচেয়ে বড় দলিল এই যে, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের অনেকগুলোর সুরার নামকরণ করেছেন জীবজন্তুর নামে। যেমন সুরা বাকারা, সুরা আনআম, সুরা নাহল ইত্যাদি।

জীবজন্তুর প্রতি যত্নশীল হওয়া ও সমাজে তাদের ভূমিকা এবং মানুষের পাশাপাশি তাদের অবস্থান কী সে ব্যাপারে কুরআন মাজিদে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ○ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

আল্লাহ চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে শীত নিবারক উপাদান এবং বহু উপকার। এবং তা থেকে তোমরা আহার করে থাকো। তোমরা যখন গোধূলিলগ্নে সেগুলোকে চারণভূমি থেকে নিয়ে আসো এবং সকালে যখন সেগুলোকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা সেগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করো। তারা তোমাদের বোঝা বহন করে নিয়ে যায় এমন দেশে

> যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌছতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।[২১৯]

ইসলামি শরিয়া প্রাণিকুলের অধিকারের ব্যাপারে যে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি প্রণয়ন করে দিয়েছে তা হলো তাদের কষ্ট ও যন্ত্রণা না দেওয়া। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাধার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গাধাটির মুখে (পুড়িয়ে) দাগ দেওয়া ছিল। তিনি বললেন, «لَعَنَ اللهُ الَّذِى وَسَمَهُ»–'যে লোক গাধাটির মুখে দাগ দিয়েছে তাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করুন।'[২২০] আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ»

> যে লোক পশুর অঙ্গহানি ঘটায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অভিসম্পাত করেছেন।[২২১]

হাদিসের মর্ম এই যে, জীবজন্তু ও পশুপাখিকে কষ্ট ও শাস্তি দেওয়া এবং তাদের প্রতি দয়া-মতা না দেখানো ইসলামি শরিয়ার দৃষ্টিতে অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

একইভাবে ইসলাম প্রাণিকুলের আরেকটি মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ করেছে, অর্থাৎ, প্রাণীদের আটকে রাখা ও তাদের ক্ষুৎপিপাসায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ»

---

২১৯. সুরা নাহল : আয়াত ৫-৭।

২২০. মুসলিম, কিতাব : পোশাক ও সাজসজ্জা, বাব : জীবজন্তুর চেহারায় প্রহার করা ও ছ্যাঁকা দিয়ে দাগ লাগানো নিষিদ্ধ, হাদিস নং ২১১৭।

২২১. বুখারি, কিতাব : জবাই করা ও শিকার করা, বাব : পশুর অঙ্গহানি করা, বেঁধে তির দ্বারা হত্যা করা এবং চাঁদমারি করা নিন্দনীয়, হাদিস নং ৫১৯৬; সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং ৪৪৪২; সুনানে দারেমি, হাদিস নং ১৯৭৩।

একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। কেননা, সে বিড়ালটিকে পানাহার করায়নি, এমনকি ছেড়েও দেয়নি যাতে সে জমিনের ঘাস-লতাপাতা খেয়ে বাঁচতে পারে।[২২২]

সাহল ইবনে হানযালিয়্যাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি উটের পাশ দিয়ে গেলেন। দেখলেন যে, ক্ষুৎপিপাসায় উটটির পেট পিঠের সঙ্গে মিশে গেছে। তখন তিনি বললেন,

«اتَّقُوا اللهَ فِي هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً»

তোমরা এসব বোবা জীবজন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। পরিশ্রান্ত না করে তাদের পিঠে আরোহণ করো এবং সুস্থ রেখে তাদের গোশত আহার করো।[২২৩]

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক প্রাণীকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে ওই কাজে ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। চতুষ্পদ জন্তুকে কাজে লাগানোর প্রধান উদ্দেশ্য কী তা তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বলেছেন,

«إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ»

তোমরা তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর পৃষ্ঠদেশকে মিম্বরে পরিণত করা থেকে দূরে থাকো। আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এ কারণে যে, তারা তোমাদের এমন জায়গায়

---

২২২. *বুখারি*, কিতাব : পানি সিঞ্চন, বাব : পানি পান করানোর ফজিলত, হাদিস নং ২২৩৬; *মুসলিম*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আস-সালাম, বাব : বিড়াল হত্যা নিষিদ্ধ, হাদিস নং ২২৪২, হাদিসটির বাক্য *মুসলিম* থেকে চয়ন করা হয়েছে।

২২৩. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : জিহাদ, বাব : পশুপাখিদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে যে-সকল নির্দেশনা রয়েছে, হাদিস নং ২৫৪৮; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৭৬৬২; শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ এবং রাবিগণ বিশ্বস্ত ও সহিহ হাদিসের রাবিদের মানে উত্তীর্ণ। *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫৪৬।

পৌঁছে দেবে যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর ক্লেশ ব্যতীত পৌঁছতে পারতে না।[২২৪]

ইসলামি শরিয়া জীবজন্তু ও প্রাণিকুলের যেসব অধিকারের শেকড় প্রোথিত করে দিয়েছে তারমধ্যে আরেকটি এই যে, ইসলামি শরিয়া কোনো প্রাণীকে তির নিক্ষেপের লক্ষ্য (চাঁদমারি) বানাতে নিষেধ করেছে। একবার আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কিছু তরুণকে দেখলেন, একটি পাখি বেঁধে রেখে সেটিকে তির নিক্ষেপের লক্ষ্য বানিয়েছে। তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, যারা এমন কাজ করে আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করুন।

«إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا»

নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন, যে ব্যক্তি প্রাণবিশিষ্ট কোনোকিছুকে (তির ছোড়ার) লক্ষ্যবস্তু বানায়।[২২৫]

ইসলামি শরিয়া প্রাণিকুলের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। তা হলো তাদের প্রতি দয়া ও মমতা দেখানোর আবশ্যকতা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নবর্ণিত বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,

«بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا مِثْلَ

---

২২৪. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : আল-জিহাদ, বাব : বাহনজন্তুর ওপর অবস্থান করা, হাদিস নং ২৫৬৭; বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১০১১৫।
ব্যাখ্যা : 'তোমরা তোমাদের বহনকারী জীবজন্তুকে দাঁড় করিয়ে তাদের পিঠের ওপর বসে থেকে কেনা-বেচা ও আলাপ-আলোচনা করো না। বরং তাদের পিঠ থেকে নামো, তোমাদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করো, তারপর আরোহণ করো।' জীবজন্তুর পৃষ্ঠদেশকে বিনা প্রয়োজনে আসন হিসেবে ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। তবে কদাচিৎ কোনো প্রয়োজনে তা করা জায়েয আছে। দলিল : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উটনীর উপরে বসে ভাষণ দিয়েছিলেন, তখন উটনীটি দাঁড়িয়ে ছিল। দেখুন, আজিমাবাদি, *আউনুল মাবুদ*, খ. ৭, পৃ. ১৬৯; মুনাবি, *ফাইজুল কাদির*, খ. ৩, পৃ. ১৭৪।

২২৫. *বুখারি*, কিতাব : জবাই করা ও শিকার করা, বাব : পশুর অঙ্গহানি করা, বেঁধে তির দ্বারা হত্যা করা এবং চাঁদমারি করা নিন্দনীয়, হাদিস নং ৫১৯৬; *মুসলিম*, কিতাব : শিকার করা ও জবাই করা এবং যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, বাব : কোনো প্রাণীকে বেঁধে তাকে তিরের লক্ষ্যস্থল বানানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, হাদিস নং ১৯৫৮।

الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»

পথে চলতে চলতে একজন লোকের ভীষণ পিপাসা লাগল। সে কূপে নেমে পানি পান করল। কূপ থেকে বের হয়ে সে দেখতে পেল যে একটি কুকুর ভীষণ হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে (ভেজা) মাটি চাটছে। সে ভাবল, আমার মতো কুকুরটারও পিপাসা লেগেছে। সে কূপের মধ্যে নামল এবং তার মোজা ভরে পানি তুলল। মোজাটিকে মুখ দিয়ে ধরে[২২৬] উপরে উঠে এলো। এই পানি কুকুরটাকে পান করালো। আল্লাহ তাআলা তার আমল কবুল করলেন এবং তার পাপ মাফ করে দিলেন। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের সওয়াব হবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যেকোনো প্রাণীর উপকার করাতে সওয়াব রয়েছে।[২২৭]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি সফরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি তাঁর প্রয়োজনে (ইস্তিঞ্জার জন্য) দূরে সরে গেলেন। আমরা একটি 'হুম্মারা' (চড়ুই জাতীয় ছোট পাখি) দেখতে পেলাম। তার সঙ্গে দুটি ছানা রয়েছে। আমরা ছানাদুটিকে ধরে নিয়ে এলাম। একটু পরেই হুম্মারা পাখিটি এসে ডানা ঝাপটাতে লাগল। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। তিনি পাখিটির অবস্থা দেখে বললেন,

«مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا»

---

২২৬. যেহেতু দুই হাত দিয়ে কূপের পার ধরে উঠতে হচ্ছিল।

২২৭. বুখারি, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আদাব, বাব : মানুষ এবং জন্তুজানোয়ারের প্রতি দয়া, হাদিস নং ৫৬৬৩; মুসলিম, কিতাব : আস-সালাম, বাব : অবোধ পশুপাখিকে পানি পান করানো ও খাবার দেওয়ার ফজিলত, হাদিস নং ২২৪৪।

কে ছানাদুটি ধরে এনে পাখিটিকে ব্যথিত করেছে? ছানাদুটি তার কাছে ফিরিয়ে দাও।[২২৮]

প্রাণিকুলের অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে ইসলামি শরিয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রদর্শন করেছে। এ কারণে গবাদি পশুর জন্য উর্বর এবং পানি ও ঘাসযুক্ত চারণভূমি নির্বাচন করতে বলা হয়েছে। যদি কাছাকাছি এমন চারণভূমি না পাওয়া যায় তাহলে গবাদি পশুপালকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيَرْضَى بِهِ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ هٰذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ، فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا، فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا»

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোমল, তিনি কোমলতা পছন্দ করেন এবং কোমলতায় আনন্দিত হন। তিনি কোমলতায় সাহায্য করেন, যা কঠোরতায় করেন না। সুতরাং তোমরা যখন এসব বাকশক্তিহীন জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করবে, তাদেরকে উপযুক্ত স্থানে (যেখানে তাদের বিশ্রাম ও পর্যাপ্ত ঘাস-পানির ব্যবস্থা আছে) থামাবে (স্বাভাবিক দূরত্বের বেশি চালিয়ে তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না)। যেখানে অবস্থান করবে সেখানকার জায়গা ঘাসশূন্য পরিষ্কার হলে শীঘ্রই তাদেরকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে যাও, অন্যথায় তাদের হাড় শুকিয়ে যাবে। (অর্থাৎ, ঘাসশূন্য ও লতাপাতাহীন জায়গায় অবস্থান করলে এ প্রাণীগুলো না খেতে পেয়ে শুকিয়ে যাবে এবং পরে আর হাঁটতে পারবে না।)[২২৯]

প্রাণিকুলের প্রতি দয়া দেখানোর চেয়েও উচ্চ ও মূল্যবান আরেকটি স্তর রয়েছে। ইসলামি শরিয়া প্রাণীদের সঙ্গে আচার-আচরণের ক্ষেত্রে তা

---

২২৮. সুনানে আবু দাউদ, কিতাব : আল-আদাব, বাব : পিপীলিকা হত্যা করা, হাদিস নং ৫২৬৮; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৭৫৯৯। তিনি বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ, যদিও ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম তা সংকলন করেননি। ইমাম যাহাবি তার বক্তব্য সমর্থন করেছেন।

২২৯. ইমাম মালিক, মুআত্তা, ইয়াহইয়া আল-লাইস খালিদ ইবনে মা'দান থেকে মারফুরূপে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিতাব : অনুমতি প্রার্থনা, বাব : সফরে যেসব কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, হাদিস নং ১৭৬৭।

আবশ্যক করে দিয়েছে। তা হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা এবং তাদের অনুভূতিকে সম্মান দেখানো। এই নীতির সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন তখনই ঘটেছে যখন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোশত খাওয়ার জন্য প্রাণীদের জবাইয়ের সময় তাদের কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। চাই এ কষ্টদান জবাইয়ের নিকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন অথবা জবাইয়ের অস্ত্রের নিকৃষ্টতার কারণে শারীরিকভাবে হোক অথবা ছুরি-চাকু প্রদর্শন করে মানসিকভাবে হোক। এসব কারণে প্রাণীটিকে কয়েকবার হত্যা করা হয়!

শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দুটি বিষয় আত্মস্থ করে রেখেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.»

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জিনিসের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যখন কোনো ব্যক্তিকে (কিসাস বা এ রকম কোনো কারণে) হত্যা করবে, তাকে উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে। যখন পশুপাখি জবাই করবে, উত্তম পদ্ধতিতে জবাই করবে। তোমরা অবশ্যই ছুরি ধার দিয়ে নেবে এবং জবাইকৃত পশুকে শান্তি দেবে।[২৩০]

অনুরূপ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক জবাই করার জন্য একটি ছাগল শোয়াল, তারপর তার ছুরি ধার দিতে লাগল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থা দেখে বললেন,

«أَتُرِيْدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ هَلاَّ حَدَّدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا»

---

২৩০. *মুসলিম*, কিতাব : শিকার করা ও জবাই করা এবং যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, বাব : উত্তম পদ্ধতিতে জবাই ও হত্যা করা এবং ছুরি ধার দেওয়ার নির্দেশ, হাদিস নং ১৯৫৫; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৮১৫; *সুনানে তিরমিযি*, হাদিস নং ১৪০৯।

তুমি কি প্রাণীটাকে কয়েকবার মারতে চাও? এটাকে মাটিতে শোয়াবার আগে তোমার ছুরিটাকে ধার দিয়ে নিতে পারলে না?[২৩১]

ইসলামে প্রাণীদের অধিকার এমনই, প্রাণীদের রয়েছে নিরাপত্তা ও শান্তির অধিকার, আরাম ও স্বস্তির অধিকার। ইসলামি সভ্যতার পতাকা যেখানে পতপত করে উড়েছে সেখানে এমনই ছিল পরিবেশ-পরিস্থিতি।

---

২৩১. *মুসতাদরাকে হাকেম*, কিতাব : কুরবানি, হাদিস নং ৭৫৬৩। তিনি বলেছেন, এ হাদিস ইমাম বুখারির শর্ত অনুযায়ী সহিহ, যদিও ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম হাদিসটি সংকলন করেননি। ইমাম যাহাবি তার বক্তব্য সমর্থন করেছেন।

৮. অষ্টম অনুচ্ছেদ

পরিবেশের অধিকার

আল্লাহ তাআলা যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তা হলো পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও উপকারী। তিনি পরিবেশকে মানুষের অধীনে করে দিয়েছেন। একইসঙ্গে মানুষের ওপর পরিবেশের প্রয়োজনীয় সুরক্ষাবিধান আবশ্যক করে দিয়েছেন। যেমন তিনি মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টিজগতের নিদর্শনাবলি নিয়ে প্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনা করতে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। এ জগৎকে তিনি অত্যন্ত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾

> তারা কি তাদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি কীভাবে তা নির্মাণ করেছি, তা সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোনো ফাটলও নেই? আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদ্‌গত করেছি সব রকম নয়নপ্রীতিকর উদ্ভিদ।[২৩২]

কুরআনের এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করেই মুসলিম মানব এবং প্রাণিকুল ও জড়পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত তার চারপাশের পরিবেশের মধ্যে প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, পরিবেশ সুরক্ষায় পার্থিব জীবনে তার উপকারিতা রয়েছে, কারণ সে সুন্দর-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করতে পারবে এবং আখিরাতেও আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে চমৎকার পুরস্কার।

---

২৩২. সুরা কাফ : আয়াত ৬-৭।

সৃষ্টিজগতের প্রতি কুরআনের যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, তার সমর্থনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে এবং তার ভিত্তি এই যে, প্রকৃতির উপাদান ও মানুষের মধ্যে মৌলিক বন্ধন বিদ্যমান এবং তাদের মধ্যে রয়েছে আদান-প্রদানমূলক সম্পর্ক। মানুষ যখন প্রকৃতির কোনো উপাদানের অপব্যবহার করবে বা পুরো উপাদান নিঃশেষ করে দেবে তখন গোটা পৃথিবীই সরাসরি বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে, এই বিশ্বাসই হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিন্তাভাবনার মূল পয়েন্ট।

এ কারণে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী মানবমণ্ডলীর জন্য সর্বজনীন নীতি প্রবর্তন করেছে ইসলামি শরিয়া। তা হলো এই ধরিত্রীর কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন না করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لاَ ضَرَرَ ولاَ ضِرَارَ»

> কেউ কারও ক্ষতি করবে না ও কারও ক্ষতির সম্মুখীন হবে না।(২০৩)

ইসলামি শরিয়ার ধারাবাহিক বিধানাবলি পরিবেশকে নোংরা করা এবং বিনষ্ট করার ব্যাপারে সতর্ক করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুরূপ একটি বিধান দিয়ে বলেন,

«اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ : الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ»

> তোমরা তিনটি অভিসম্পাতপূর্ণ কাজ—যাওয়া-আসার স্থানে, রাস্তার মধ্যস্থলে এবং গাছের ছায়ায় মলমূত্র ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকো।(২০৪)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াকে রাস্তার অধিকার বলে ঘোষণা করেছেন। আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

২০৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, *আহমাদ*, হাদিস নং ২৭১৯, শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি হাসান। *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ২৩৪৫, তিনি বলেছেন, মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটির সনদ সহিহ, যদিও *বুখারি* ও *মুসলিম* গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়নি।

২০৪. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : আত-তাহারাহ, বাব : আল-মাওয়াদিউল্লাতি নাহান-নাবিয়্যু আনিল-বাওলি ফিহা, হাদিস নং ২৬।

«إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ.. وَكَفُّ الْأَذَى..»

তোমরা রাস্তার ওপর বসা থেকে বিরত থাকো। তারা (সাহাবিগণ) বললেন, আমাদের তো রাস্তার ওপর বসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ, রাস্তায় আমরা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সমাধা করি। তিনি বললেন, যদি তোমরা সেখানে বসতে একান্ত বাধ্যই হও তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বললেন, রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, ... এবং কাউকে (পথচারীকে) কষ্ট না দেওয়া...।[২০৫]

'কষ্ট না দেওয়া' কথাটি সামগ্রিক। অর্থাৎ, যেসব মানুষ সড়ক ও অলিগলি ব্যবহার করে তাদেরকে যেকোনো ধরনের কষ্টদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

তার চেয়ে বড় ব্যাপার হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রতিদানপ্রাপ্তির মধ্যে একটি সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ»

আমার উম্মতের ভালো-মন্দ আমলসমূহ আমার কাছে উপস্থিত করা হয়, তখন আমি তাদের ভালো কাজসমূহের মধ্যে পেলাম রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা এবং মন্দ কাজসমূহের মধ্যে পেলাম

---

২০৫. *বুখারি*, আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-মাযালিম, বাব : আফনিয়াতুদ-দুর ওয়াল-জুলুস ফিহা ওয়াল-জুলুসু আলাস-সুউদাত, হাদিস নং ২৩৩৩; *মুসলিম*, কিতাব : আল-লিবাস ওয়ায-যিনাহ, বাব : আন-নাহয়ু আনিল-জুলুসি ফিত-তুরুকাতি ওয়া ইতাউত-তারিকি হাক্কাহু, হাদিস নং ২১২১।

কফ বা নাসা-শ্লেষ্মা মসজিদে ফেলা, যা (মাটিতে) পুঁতে ফেলা হলো না।[২৩৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবাসস্থল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ،... فَنَظِّفُوا بُيُوتَكُمْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকেই ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, তাই পরিচ্ছন্নতাকেই পছন্দ করেন। ...সুতরাং তোমরা তোমাদের ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো, ইহুদিদের মতো (অপরিচ্ছন্ন) রেখো না।[২৩৭]

এসব শিক্ষা ও বিধান কত উত্তম, যা সব ধরনের নোংরা ও আবর্জনা থেকে মুক্ত পবিত্র জীবনের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। এসব বিধানের মধ্য দিয়ে ইসলামি শরিয়া মানুষের আত্মিক ও স্বাস্থ্যগত সুখের সুরক্ষা দিয়েছে।

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সুরক্ষাদানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে আরও স্পষ্ট ও ব্যাপকার্থক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, আমার কাপড়চোপড় সুন্দর, আমার জুতা সুন্দর এগুলো কি অহংকারের মধ্যে পড়ে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ؛ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ»

---

২৩৬. *মুসলিম*, আবু যর রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস-সালাত, বাব : আন-নাহয়ু আল-বিসাক ফিল-মাসজিদি ফিস-সালাতি ওয়া গাইরিহা, হাদিস নং ৫৫৩; *আহমাদ*, হাদিস নং ২১৫৮৯; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩৬৮৩।

২৩৭. *তিরমিযি*, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আদাব, বাব : আন-নাযাফাহ, হাদিস নং ২৭৯৯; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ৭৯০। *মিশকাতুল মাসাবিহ*, হাদিস নং ৪৪৫৫।

নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। অহংকার হলো সত্য অস্বীকার করা ও মানুষকে অবজ্ঞা করা।[২৩৮]

কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ যে প্রকৃতিকে রুচিস্নিগ্ধ ও নয়নাভিরাম করে সৃষ্টি করেছেন তা প্রকাশের আগ্রহও সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।

একইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুগন্ধি ভালোবাসতেন এবং মানুষের মধ্যে সুগন্ধি ছড়িয়ে দিতে ও হাদিয়া দিতে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি পরিবেশ সুরভিত করে তুলতে ও নোংরা পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ»

কাউকে সুগন্ধি (উপহার) দেওয়া হলে সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কারণ, সুগন্ধি বহন করা সহজসাধ্য এবং ঘ্রাণও চমৎকার।[২৩৯]

ইসলামের একটি মহত্ত্ব এই যে, ইসলাম যেসব ব্যাপারে বিধান দিয়েছে তার মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কেও বিশেষ বিধান দিয়েছে। জমিনে বীজ বপন ও চারা রোপণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ»

যেকোনো মুসলিম কোনো ফলবতী গাছ লাগাবে, তা থেকে কিছু খাওয়া হলে তা তার পক্ষ থেকে দান স্বরূপ, তা থেকে কিছু চুরি হলে তাও দানস্বরূপ, বন্য জীবজন্তু তা থেকে যা খাবে তাও দানস্বরূপ, পাখপাখালি যা খাবে তাও দানস্বরূপ। অন্য কেউ

---

২৩৮. *মুসলিম*, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : তাহরিমুল কিবর ওয়া বায়ানুহু, হাদিস নং ৯১; *আহমাদ*, হাদিস নং ৩৭৮৯; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫৪৬৬।

২৩৯. *মুসলিম*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আলফায মিনাল-আদাব ও গাইরিহা, বাব : ইসতি'মালুল-মিসক..., হাদিস নং ২২৫৩; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৭৯১।

> কোনো ক্ষতিসাধন করলে তাও দানস্বরূপ। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, «إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»–তা কিয়ামত পর্যন্ত দান হিসেবে থাকবে।[২৪০]

ইসলামের মাহাত্ম্য এই যে, পরিবেশ ও পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত সকলের জন্য উপকারী গাছ রোপণের সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে যতক্ষণ ওই গাছ উপকারে আসবে, যদিও ওই গাছের মালিকানা অন্য কারও হাতে চলে যায় বা রোপণকারী বা চাষি মারা যায়!

মানুষ অকর্ষিত বা অনুর্বর ভূমি কর্ষণ করে তাতে ফসল ফলিয়ে যে জীবিকা উপার্জন করে ইসলামি শরিয়া তার উচ্চ প্রশংসা করেছে। কারণ, গাছ রোপণ করা, বীজ বপন করা, শুকনো ও উষর ভূমিতে জল সিঞ্চন করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ مِنْهَا يَعْنِي أَجْرًا وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ»

> যে ব্যক্তি অনুর্বর ভূমিকে উর্বর করল তার জন্য এতে রয়েছে প্রতিদান এবং পশুপাখি তা থেকে যা খেল তা তার জন্য সদকা।[২৪১]

পানি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ, তাই এতে মিতব্যয়িতা ও তার পবিত্রতা রক্ষা করা ইসলামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি ব্যবহারে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি পর্যাপ্ত পানি থাকলেও। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি অজু করছিলেন। তিনি বলেন,

---

২৪০. *মুসলিম*, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-মুসাকাত, বাব : ফাদলুল-গারসি ওয়ায-যারয়ি, হাদিস নং ১৫৫২; *আহমাদ*, হাদিস নং ২৭৪০১।

২৪১. *সুনানে নাসায়ি*, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : ইহ্ইয়াইল-মাওয়াত, বাব : আল-হাসসু আলা ইহ্ইয়াইল-মাওয়াত, হাদিস নং ৫৭৫৬; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫২০৫; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৪৩১০। শুআইব আরনাউত বলেছেন, এটা সহিহ হাদিস।

«مَا هٰذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ قَالَ أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ»

হে সাদ, কেন এই অপচয়? সাদ বললেন, অজুতেও কি অপচয় হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এমনকি তুমি প্রবহমান নদীতে অজু করলেও।[২৪২]

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি নোংরা করতে নিষেধ করেছেন। স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।[২৪৩]

পরিবেশের প্রতি এটাই হলো ইসলাম ও ইসলামি সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি। মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলা উৎকৃষ্টরূপে যে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন তাতে তাঁর নীতি অনুযায়ীই পরিবেশ-প্রকৃতি তার নানাবিধ পরিপার্শ্ব নিয়ে আন্তঃক্রিয়া, পরিপূর্ণতা লাভ ও পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখে। ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমের জন্য পরিবেশের সৌন্দর্য রক্ষা করা আবশ্যক করে দিয়েছে।

03.07.'21
6:45 pm

---

২৪২. *সুনান ইবনে মাজাহ*, কিতাব : আত-তাহারাত, বাব : মা জাআ ফিল-কাসরি ওয়া কারাহিয়াতি আত-তাআদ্দি ফিহি, হাদিস নং ৪২৫; *আহমাদ*, হাদিস নং ৭০৬৫।

২৪৩. *মুসলিম*, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আত-তাহারাত, বাব : আন-নাহয়ু আন আল-বাওলি ফি আল-মায়ি আর-রাকিদ, হাদিস নং ২৮১; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৬৯; *তিরমিযি*, হাদিস নং ৬৮।
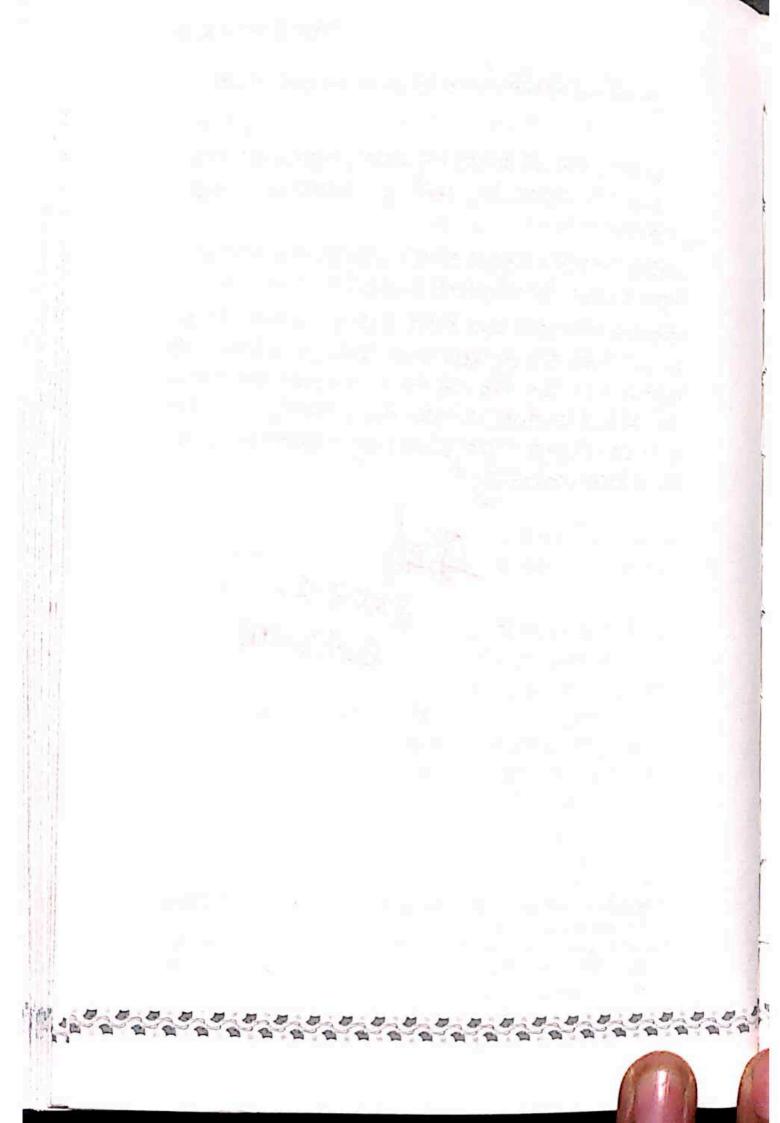
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা

ইসলাম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাকে একটি আসমানি নীতি বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যাতে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং মানবতার উৎকর্ষ সাধিত হয়। স্বাধীনতা কখনো সমাজ-বিকাশের কোনো ফল ছিল না, স্বাধীনতা-বঞ্চিতদের প্রার্থিত বিপ্লবের পরিণতিও ছিল না। সামসময়িক বহু জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে অনুরূপ অবস্থা এখনো বিদ্যমান।

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোর আলোচনা এ বিষয়টি স্পষ্ট করবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ : বিশ্বাসের স্বাধীনতা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : চিন্তার স্বাধীনতা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মত প্রকাশের স্বাধীনতা

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ব্যক্তি স্বাধীনতা

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : মালিকানার স্বাধীনতা

প্রথম অনুচ্ছেদ

১. বিশ্বাসের স্বাধীনতা

ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা সম্পর্কে স্পষ্ট মৌলিক নীতি বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ﴾

> দ্বীন গ্রহণে জোরজবরদস্তি নেই, সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।[২৪৪]

ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরবর্তী মুসলিমগণ কাউকে ইসলাম গ্রহণের জন্য জবরদস্তিমূলক নির্দেশ দেননি। তেমনই মৃত্যু ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে ইসলামকে নিজেদের ধর্ম বলে প্রকাশ করতে মানুষকে বাধ্য করেননি। তা তারা কীভাবে করতে পারেন, অথচ তারা জানেন যে আখিরাতের হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ইসলামের কোনো মূল্য নেই এবং আখিরাতের দিকেই প্রত্যেক মুসলিম ধাবমান?!

উপরিউক্ত আয়াতের শানে নুযুল হিসেবে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, জাহিলি যুগে যদি কোনো নারী মৃতবৎসা (যে নারীর সন্তান জীবিত থাকে না) হতো, সে এরূপ মানত করত, যদি তার কোনো সন্তান জীবিত থাকে তাহলে তাকে ইহুদি বানাবে। অবশেষে বনু নাযিরকে যখন দেশান্তর করা হলো, তাদের মধ্যে আনসারদের ওই ধরনের কয়েকজন সন্তান ছিল। আনসাররা বললেন, আমরা আমাদের সন্তানদের ছাড়ব না। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন,

﴿لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ﴾

> দ্বীন গ্রহণে জোরজবরদস্তি নেই, সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।[২৪৫]

---

[২৪৪]. সুরা বাকারা : আয়াত ২৫৬।

ইসলাম ঈমান পোষণ করা ও না করার বিষয়টিকে মানুষের অভিপ্রায় ও অভ্যন্তরীণ সন্তুষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾

আর বলুন, সত্য আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, সুতরাং যার ইচ্ছা সত্য বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক।[২৪৬]

আল-কুরআন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিকে এই বাস্তবিক সত্যের প্রতি আকর্ষণ করেছে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, তাঁর দায়িত্ব হলো কেবল দাওয়াত পৌছে দেওয়া, মানুষকে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করানোর ক্ষমতা তাঁর নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে?[২৪৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾

আপনি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নন।[২৪৮]

অন্য আয়াতে বলেছেন,

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾

যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আমি আপনাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কাজ তো কেবল বাণী পৌছে দেওয়া।[২৪৯]

---

[২৪৫]. সুনানে আবু দাউদ, কিতাব : আল-জিহাদ, বাব : ফিল-আসিরি ইয়ুকরাহু আলাল ইসলাম, হাদিস নং ২৬৮২; আল-ওয়াহিদি, আসবাবু নুযুলিল কুরআন, পৃ. ৫২; সুয়ুতি, লুবাবুন নুযুল, পৃ. ৩৭।

[২৪৬]. সুরা কাহফ : আয়াত ২৯।

[২৪৭]. সুরা ইউনুস : আয়াত ৯৯।

[২৪৮]. সুরা গাশিয়া : আয়াত ২২।

[২৪৯]. সুরা শুরা : আয়াত ৪৮।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, মুসলিমদের সংবিধান বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে এবং কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার ব্যাপারটি চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।[২৫০]

ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতিদান, অর্থাৎ বহুধর্মীয় অনুশীলনের অনুমোদন প্রদান বিষয়টির বাস্তব প্রয়োগ ঘটেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনার প্রথম সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি ইহুদিরা মুসলিমদের সঙ্গে মিলে একটি উম্মাহ গঠন করবে বলে অনুমোদন দিয়েছেন। একইভাবে মক্কা বিজয়ের সময়ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি। যদিও তাঁর সক্ষমতা ছিল, বিজয়ী প্রতাপ ছিল। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উদ্দেশে বলেন,

﴿اِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ﴾

তোমরা যাও, তোমরা মুক্ত।[২৫১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. আল-কুদসের অধিবাসী খ্রিষ্টানদের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, তাদের জীবন, উপাসনালয় (গির্জা) ও ক্রুশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন, তাদের কেউই ধর্মের কারণে ক্ষতি বা অপদস্থতার শিকার হয়নি।[২৫২]

ইসলাম বরং পারস্পরিক তিরস্কার ও গালিগালাজ থেকে মুক্ত থেকে বাস্তবিক ভিত্তির ওপর ধর্মীয় তর্কবিতর্কের অনুমোদন দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

---

২৫০. মাহমুদ হামদি যাকযুক, *হাকায়িকু ইসলামিয়্যা ফি মুওয়াজাহাতি হামলাতিত তাশকিক*, পৃ. ৩৩।

২৫১. ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৪১১; তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৫৫; ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৪, পৃ. ৩০১।

২৫২. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ১০৫।

> তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে তর্ক করো উত্তম পন্থায়।[২৫৩]

এই সমুন্নত নীতিমালার আলোকেই মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে (ধর্মীয়) আলোচনা-পর্যালোচনা ও তর্কবিতর্ক হওয়া উচিত। এই নীতি অনুসারেই পবিত্র কুরআন আহলে কিতাবদের উদ্দেশে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

> আপনি বলুন, হে কিতাবিগণ, এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি, কোনোকিছুকেই তাঁর শরিক না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ব্যতীত কাউকেও রব হিসেবে গ্রহণ না করি। তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাকো যে আমরা মুসলিম।[২৫৪]

এই আহ্বানের অর্থ হলো, আলোচনা যদি ফলপ্রসূ না হয় এবং কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো না যায়, তাহলে প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে, সে যে দ্বীনে সন্তুষ্টি বোধ করে সেই দ্বীন মান্য করার। সুরা কাফিরুনের শেষ আয়াত এ ব্যাপারটিই ব্যক্ত করেছে। সুরাটি মুশরিকদের উদ্দেশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানে আল্লাহর এই বাণীর দ্বারা শেষ হয়েছে,

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।[২৫৫]

---

২৫৩. সুরা নাহল : আয়াত ১২৫।
২৫৪. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৬৪।
২৫৫. সুরা কাফিরুন : আয়াত ৬।
মাহমুদ হামদি যাকযুক, হাকায়িকু ইসলামিয়্যা ফি মুওয়াজাহাতি হামলাতিত তাশকিক, পৃ. ৮৫-৮৬।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২. চিন্তার স্বাধীনতা

ইসলাম চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। বিষয়টি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবেই বর্ণিত হয়েছে। কারণ, ইসলাম গোটা সৃষ্টিজগৎ, আকাশমণ্ডল ও জমিন নিয়ে চিন্তা করতে, বুদ্ধি খাটাতে আহ্বান জানিয়েছে। এ ব্যাপারে অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾

বলুন, আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে দুই-দুইজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও, তারপর তোমরা চিন্তা করে দেখো।[২৫৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হলো বক্ষস্থিত হৃদয়।[২৫৭]

ইসলাম বরং যারা তাদের চিন্তাশক্তি ও অনুভূতিশক্তি কাজে লাগায় না তাদের মারাত্মকভাবে নিন্দা করেছে। তাদের জীবজন্তুর স্তরের চেয়েও নিচু স্তরে স্থাপন করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

২৫৬. সুরা সাবা : আয়াত ৪৬।

২৫৭. সুরা হজ : আয়াত ৪৬।

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দ্বারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে, তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, তা দ্বারা তারা শোনে না। তারা পশুর মতো, বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল।(২৫৮)

যারা ধারণা ও অনুমানের অনুসরণ করে (ধারণা ও অনুমানের বশবর্তী হয়ে কর্মকাণ্ড করে) তাদের বিরুদ্ধে ইসলাম কঠিন আক্রমণ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾

তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে, কিন্তু সত্যের মোকাবিলায় অনুমানের কোনো মূল্য নেই।(২৫৯)

একইভাবে যারা তাদের বাপদাদা ও নেতারা সত্যের ওপর রয়েছে না মিথ্যার ওপর তা নিরীক্ষণ করা ছাড়াই তাদের অনুসরণ করে, তাদের প্রতিও কুরআন আক্রমণ হেনেছে। তাদের হীনতার দিকে ইঙ্গিত করে কুরআন বলে,

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾

তারা আরও বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম আর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল।(২৬০)

ইসলামি আকিদা প্রমাণ করতে ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল-প্রমাণের ওপর নির্ভর করেছে। এ কারণেই ইসলামের মনীষীগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বর্ণনামূলক জ্ঞানের ভিত্তি হলো বুদ্ধিমত্তা। আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণসাপেক্ষতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

---

২৫৮. সুরা আরাফ : আয়াত ১৭৯।

২৫৯. সুরা নাজম : আয়াত ২৮।

২৬০. সুরা আহযাব : আয়াত ৬৭

আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের বিষয়টিও প্রথমত বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে প্রমাণিত হয়েছে, তারপর মুজিযাসমূহ তাঁর নবুয়তের শুদ্ধতাকে প্রমাণসিদ্ধ করেছে। ইসলাম বুদ্ধি ও চিন্তাকে এভাবেই সম্মানিত করেছে।

চিন্তাভাবনা ইসলামের দৃষ্টিতে আবশ্যক দ্বীনি কার্য বলে বিবেচিত। যেকোনো অবস্থায়ই হোক এই দ্বীনি কর্তব্যকে অবহেলা করা কোনো মুসলিমের জন্যই জায়েজ নয়। দ্বীনি বিষয়সমূহে চিন্তাচর্চার জন্য ইসলাম বিশাল দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তার একটি কারণ হলো জীবনে যা-কিছু নতুন ঘটবে সেসবের শরয়ি সমাধান কী তা অনুসন্ধান করা। ইসলামের মনীষীগণ একে (শরয়ি সমাধান অনুসন্ধানকে) 'ইজতিহাদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার অর্থ হলো, শরয়ি হুকুম-আহকাম উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে চিন্তার ওপর নির্ভরশীল হওয়া।[২৬১]

মুসলিমদের কাছে ফিকহের পঠনপাঠন ও চর্চার ক্ষেত্রে এবং ইসলামের প্রথম যুগে যেসব সমস্যার কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না সেগুলোর দ্রুত সমাধান উদ্ভাবনে ইজতিহাদের–যা ইসলামে চিন্তার স্বাধীনতাকে মূর্ত করে তুলেছে–গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। ইজতিহাদের নীতিমালার ফলেই ইসলামি ফিকহের বিখ্যাত মাযহাবগুলোর উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে। ইসলামি বিশ্ব এসব মাযহাবের শিক্ষার ওপরই এখনো চলমান রয়েছে। মুসলিমদের নিজেদের চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভরশীলতা ছিল এমনই, যখনই তাদের কাছে দ্বীনের বা দুনিয়ার কোনো বিষয় জটিল বা সমস্যাপূর্ণ মনে হয়েছে, যে ব্যাপারে শরয়ি নুসুস (স্পষ্ট বক্তব্য) বর্ণিত হয়নি, তারা চিন্তাভাবনা করে তার সমাধান বের করেছেন। ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক গভীর অবস্থানের ক্ষেত্রে এটাই হলো প্রধান স্তম্ভ। এই বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে, যার ওপর মুসলিমগণ ইসলামের ইতিহাসব্যাপী তাদের উৎকর্ষশোভিত সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[২৬২]

---

[২৬১]. মাহমুদ হামদি যাকযুক, *হাকায়িকু ইসলামিয়্যা ফি মুওয়াজাহাতি হামলাতিত তাশকিক*, পৃ. ৫৩।

[২৬২]. মাহমুদ হামদি যাকযুক, আল-ইনসানু খলিফাতুল্লাহ-আত-তাফকিরু ফারিদাহ, *আল-আহরাম* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, রমযান ১৪২৩ হি.-নভেম্বর ২০০২ খ্রি.।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩. মত প্রকাশের স্বাধীনতা

মত প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ হলো কোনো সাধারণ ব্যাপারে বা বিশেষ ব্যাপারে ব্যক্তির বিবেচনা অনুযায়ী মত নির্বাচন, মত প্রকাশ ও তা অন্যদের শোনানোর অধিকার। অর্থাৎ, অন্যদের অধিকার লঙ্ঘন না করে নিজের অভিপ্রায় ও এখতিয়ার অনুযায়ী চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশে ব্যক্তির অধিকার।

এই অর্থে মত প্রকাশের স্বাধীনতা মুসলিমের জন্য ন্যায্য ও প্রতিষ্ঠিত অধিকার। কারণ, ইসলামি শরিয়া তার জন্য এই অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। ইসলামি শরিয়া ব্যক্তির জন্য যা-কিছুর স্বীকৃতি দিয়েছে তা ক্ষুণ্ন করার বা ছিনিয়ে নেওয়ার অথবা অস্বীকার করার অধিকার কারও নেই। বরং মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি মুসলিমদের জন্য ওয়াজিব, কেউ তা উপেক্ষা করতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের ওপর উপদেশদান, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ আবশ্যক করেছেন। মুসলিমরা মত প্রকাশের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে না পারলে তাদের পক্ষে এসব শরয়ি অবশ্যকর্তব্যগুলো পালন করা সম্ভব নয়। সুতরাং মুসলিমদের জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতা আবশ্যক দায়িত্ব পালনের একটি উপায়, আর যা ব্যতীত অবশ্যকর্তব্য পালন করা যায় না তাও অবশ্যকর্তব্য।

ইসলাম যাবতীয় পার্থিব বিষয়ে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বৈধতা দিয়েছে। তা সাধারণ (রাষ্ট্রীয়) বিষয় হতে পারে, সামাজিক বিষয়ও হতে পারে। উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাতফান গোত্রের সঙ্গে মদিনার (এক বছরের) এক তৃতীয়াংশ খেজুর প্রদানের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতি করতে চেয়েছেন, যাতে গাতফান গোত্র তাদের মিত্রদের থেকে সরে আসে এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে এবং এ ব্যাপারে সাদ ইবনে মুআয ও সাদ ইবনে

উবাদা রা.-এর কাছে পরামর্শ চেয়েছেন। তারা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«جاء الحارث الغطفاني إلى النبي فقال: يا محمد، شاطرنا تمر المدينة. قال: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ السُّعُودَ. فبعث إلى سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، وسعد بن مسعود، فقال: إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّ الْحَارِثَ يَسْأَلُكُمْ أَنْ تُشَاطِرُوهُ تَمْرَ الْمَدِينَةِ، فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَدْفَعُوا إِلَيْهِ عَامَكُمْ هَذَا حَتَّى تَنْظُرُوا فِي أَمْرِكُمْ بَعْدُ. قالوا: يا رسول الله، أوحيٌ من السماء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك أو هواك، فرأينا تبع لهواك ورأيك. فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا؛ فوالله! لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرة إلا بشرى أو قرى»

গাতফান গোত্রের নেতা আল-হারিস আল-গাতফানি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। বললেন, হে মুহাম্মাদ, মদিনার খেজুর অর্ধেক আমাদের দিন। তিনি বললেন, আমি সাদদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিই। তিনি সাদ ইবনে মুআয, সাদ ইবনে উবাদা, সাদ ইবনে রবি, সাদ ইবনে খাইসামা ও সাদ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর কাছে লোক পাঠালেন। তারা এলে তিনি বললেন, আমি তো জেনেছি যে, আরবরা একই তূণীর থেকে (সংঘবদ্ধ হয়ে) তোমাদের আক্রমণ করতে যাচ্ছে। অন্যদিকে হারিস তোমাদের কাছে মদিনার খেজুর অর্ধেক দিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। এখন যদি তোমরা তাকে এই বছরে উৎপন্ন খেজুর (খেজুরের অর্ধেক) দিয়ে দিতে চাও তাহলে তা চিন্তাভাবনা করে দেখো। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তা যদি আসমানের ওহি হয় তাহলে আল্লাহর নির্দেশই মেনে নেব। আর যদি আপনার অভিমত হয়, তাহলে তাও আমরা মেনে নেব। আর যদি বিষয়টা আমাদের ওপর ছেড়ে দেন, তাহলে বলব, আল্লাহর কসম! আমরা নিজেদেরও তাদের সমপর্যায়ের মনে করি।

ক্রয় বা (কোনোকিছুর) ভাড়া ছাড়া তারা আমাদের থেকে একটি খেজুরও পাবে না।[২৬৩]

কল্যাণকামনা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধে যেসব স্পষ্ট বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আল্লাহর এই বাণী,

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে।[২৬৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণী,

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসুলের জন্য, মুসলিমদের ইমামদের জন্য ও তাদের সাধারণের জন্য।[২৬৫]

ইমাম নববি এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মুসলিমদের ইমামদের জন্য কল্যাণকামিতার অর্থ হলো সত্যের ব্যাপারে তাদের সাহায্য করা এবং সত্যের ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা। তাদের সত্যের নির্দেশদান ও সত্যের বিপরীতগামিতায় তাদের বাধাদান এবং কোমল ভাষায় তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া। কোনো ব্যাপারে তারা উদাসীন হয়ে গেলে তা

---

২৬৩. তাবারানি, *মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ৫৪১৬। হাইসামি বলেছেন, বাযযার ও তাবারানির বর্ণিত সনদে মুহাম্মাদ ইবনে আমর রয়েছে। তার বর্ণিত হাদিস হাসান। তিনি ব্যতীত অন্য রাবিগণ সিকাহ (তুলনামূলক অধিক নির্ভরযোগ্য)। *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, খ. ৬, পৃ. ১১৯; এবং ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *যাদুল মাআদ*, খ. ৩, পৃ. ২৪০।

২৬৪. সুরা তাওবা : আয়াত ৭১।

২৬৫. *মুসলিম*, তামিম আদ-দারি থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : আদ-দ্বীনুন নাসিহাহ, হাদিস নং ৮২; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৯৪৪; *নাসায়ি*, হাদিস নং ৪১৯৭, *আহমাদ*, হাদিস নং ১৬৯৮২।

তাদের জানিয়ে দেওয়া এবং মুসলিমদের যে অধিকারের কথা তাদের কাছে পৌঁছায়নি তা পৌঁছে দেওয়া।[২৬৬]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ»

সাবধান, কেউ যদি সত্য অবগত হয়ে থাকে তাহলে মানুষের ভয় যেন তাকে সত্য বলা থেকে বিরত না রাখে।[২৬৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

«إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

শ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়ের বাণী উচ্চারণ করা।[২৬৮]

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার আবশ্যকতা তাদের মতামতের স্বাধীনতা প্রদান করে। আল্লাহ তাদের আবশ্যক কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ, তারা যা ভালো মনে করেন বা যা খারাপ মনে করেন এবং যা করতে নির্দেশ দেবেন বা যা থেকে বিরত থাকতে বলবেন সেসব ব্যাপারে তাদের মতামত প্রকাশের অধিকার তাদের রয়েছে। একইভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তি যাদের থেকে পরামর্শ নেবেন তাদের মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ দেবেন। এটাই মাশওয়ারা বা মতামত গ্রহণের আবশ্যকতা।

ইসলামের ইতিহাসজুড়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা যথার্থ আনুকূল্য পেয়েছে। সম্মানিত সাহাবি হুবাব ইবনুল মুনযির রা. বদর যুদ্ধের সময় মুসলিমদের অবস্থান কী হওয়া উচিত সে ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তা ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতের বিপরীত। তারপরও তিনি সাহাবির মত গ্রহণ করেছেন।

---

২৬৬. *আল-মিনহাজ ফি শারহি সহিহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ*, খ. ২, পৃ. ৩৮।

২৬৭. *তিরমিযি*, আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ফিতান, বাব : মা আখবারান নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বি-মা হুয়া কায়িনুন ইলা ইয়াওমিল-কিয়ামাহ, হাদিস নং ২১৯১; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩৯৯৭।

২৬৮. *তিরমিযি*, আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ফিতান, বাব : আফদালুল জিহাদি কালিমাতু আদ্‌লিনদা সুলতানিন জায়ির, হাদিস নং ২১৭৪; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৩৪৪; *নাসায়ি*, হাদিস নং ৪২০৯; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৪০১১।

ইফকের ঘটনায়ও কতিপয় সাহাবি তাদের ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ এমনও রয়েছেন যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর স্ত্রী সাইয়িদা আয়িশা সিদ্দিকা রা.-কে তালাক দিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। তবে কুরআন তাকে পবিত্র ঘোষণা করেছে। এসব ছাড়া আরও অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যেখানে সাহাবিগণ বা তাদের উত্তরসূরিগণ নিজেদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করেছেন।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ইসলামি শরিয়ায় একটি স্বীকৃত অধিকার। সুতরাং কোনো ব্যক্তিকে তার মত প্রকাশের জন্য শাস্তি দেওয়া বৈধ হবে না। কারণ, শরিয়ত তাকে মত প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে। একজন নারী উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করলেন, তিনি তখন মসজিদে দেনমোহর প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। উমর রা. তাকে বাধা দেননি, বরং স্বীকার করেছেন যে, সেই নারীই সঠিক। তিনি সেই নারীর বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করে বলেন, একজন নারী সঠিক বলেছে এবং উমর ভুল বলেছে।[২৬৯]

মুসলিমের জন্য কর্তব্য হলো মত প্রকাশের অধিকার কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আমানত ও সত্যবাদিতাকে গুরুত্ব দেওয়া। সে যেটাকে সত্য মনে করে সেটাই বলবে, যদিও সেই সত্য তার নিজের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য হলো সত্য ও সঠিক কথাটি বলা এবং শ্রোতাদের তা জানানো। তার অর্থ সত্য-মিথ্যায় গোলমাল পাকানো নয় বা সত্য গোপন করা নয়। মত প্রকাশের আরও একটি প্রয়োজনীয় ব্যাপার হলো কল্যাণের অভিপ্রায় থাকা। লোক দেখানো, প্রশংসা কুড়ানো, হকদারের মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে দেওয়া, সত্য-মিথ্যায় প্যাঁচ লাগিয়ে দেওয়া, মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন করা, দায়িত্বশীলদের খারাপ কাজকে ভালো করে দেখানো, তাদের ভালো কাজকে ছোট করে দেখানো এবং লাভবান হওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো এবং লোকদের তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলা ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে মত প্রকাশ বা বক্তব্য উপস্থাপন একেবারেই অনুচিত।

---

২৬৯. কুরতুবি, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৫, পৃ.৯৫।

এভাবেই ইসলামি শরিয়া মতামত প্রকাশের যে স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে তা রক্ষিত হবে এবং এ কারণেই তা সভ্যতার অগ্রগামিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং ব্যক্তিসত্তার প্রকাশে প্রধান উপায়।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৪ ব্যক্তি স্বাধীনতা

মানুষের জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে ইসলামের আগমন ঘটেছে। সকল মানবসন্তানের জন্য তা সমতার বিধান দিয়েছে। তাকওয়া ও পরহেযগারিতাকে তাদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর জাতিগত ও বর্ণগত পার্থক্য মুছে দিয়েছেন এবং চিরতরে গোষ্ঠীগত বৈষম্যের বিনাশ ঘটিয়েছেন। যখন তিনি তাওহিদের বাণী উচ্চারণরত বিলাল ইবনে রাবাহ রা.-কে কাবার ছাদে তুলে দিয়েছেন এবং তাঁর চাচা হামযা রা. ও তাঁর আযাদকৃত ক্রীতদাস যায়দে রা.-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজে এইসব মূলনীতি ঘোষণা করেছেন,

«أَنْتُمْ بَنُوْ آدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُرَابٍ وَ أَنَّه لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى»

তোমরা আদমসন্তান। আদম মাটির সৃষ্টি। জেনে রাখো, অনারবের ওপর আরবের এবং আরবের ওপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের এবং কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব হলো তাকওয়ার ভিত্তিতে।[২৭০]

এসব মূলনীতি ছিল ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা ও দাসত্বের বিনাশের প্রতি আহ্বান।

ইসলামে মূলনীতি এই যে, মানুষ স্বাধীন, তারা দাস নয়। তার কারণ, চূড়ান্ত বিচারে তারা একই পিতার সন্তান এবং জন্মগতভাবেই তারা স্বাধীন।

২৭০. *আহমাদ*, হাদিস নং ২৩৫৩৬।

ইসলাম এই মূলনীতির স্বীকৃতি দিয়েছে এমন এক যুগে যখন মানুষ ছিল দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি। তারা ভোগ করেছে নানা ধরনের লাঞ্ছনা ও বিভিন্ন রকমের গোলামি।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মানবতা যে সমাজ ও সভ্যতার ছায়ায় বসবাস করেছে, উৎপীড়নমূলক নাগরিকব্যবস্থায় তার চেহারা ছিল কদর্য, এই নাগরিকব্যবস্থার ভিত্তি ছিল পশ্চাৎমুখী সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবদলগুলোকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্তকারী বিষম শ্রেণিগত বিভাজন। এই ব্যবস্থার চূড়ায় আসন পেতে বসে ছিল স্বাধীন লোকেরা, যারা নেতৃত্ব ও ক্ষমতার যাবতীয় অধিকার ভোগ করছিল এবং এর নিচে দাস শ্রেণির লোকদেরকে স্বাধীনতা ও সম্মানিত জীবনযাপনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নির্মমভাবে পেষণ করা হচ্ছিল।

ইসলাম তার সূচনালগ্নেই মুমিনদেরকে দাস আযাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাদের মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারটিকে শোভনীয় করে তুলেছে এবং একে অনুগ্রহ ও ক্ষমা বলে আখ্যায়িত করেছে। ইসলাম দাস আযাদ করাকে একটি বড় ইবাদত বলে বিবেচনা করেছে এবং মুমিনদেরকে বিশেষ সম্পদ দ্বারা দাসদের স্বাধীন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। দাসের মুক্তিকেই তার ওপর জুলুম বা তাকে প্রহার করার কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) নির্ধারণ করেছে। দাসমুক্তিকে সুন্নত ও উত্তম কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। ভুলক্রমে হত্যা, যিহার, কসম ভঙ্গ করা, রমযান মাসে রোযা ভঙ্গ করা ইত্যাদির গুনাহের জন্য দাসমুক্তিকে কাফফারা সাব্যস্ত করেছে। দাসদের মধ্যে যারা (অর্থের বিনিময়ে) নিজেদের মুক্তির চুক্তি করতে চায় তাদেরকে সহায়তা করার নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলাম যাকাত প্রদানের একটি খাত দাসদের (মুক্তির) জন্য নির্ধারণ করেছে। মনিবের মৃত্যুর পর উম্মুল ওয়ালাদকে (মনিবের ঘরে যে দাসীর সন্তান হয়েছে) স্বাধীন ঘোষণা করেছে।

এই মানবিক সমস্যার সমাধানে ইসলামের প্রজ্ঞাপূর্ণ রূপরেখার সারমর্ম তিনটি পয়েন্টে নিয়ে আসা যায় :

১. ইসলাম দাসত্বের উৎসগুলো বন্ধ করে দিয়েছে এবং তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তবে যুদ্ধবন্দিদের বিষয়টি ভিন্ন।

২. দাসমুক্তির ব্যাপক খাত সৃষ্টি করেছে এবং

৩. মুক্তির পর দাসদের অধিকারসমূহের সুরক্ষা দিয়েছে।

ইসলামি শরিয়া নবগঠিত ও বিকাশমান মুসলিম সমাজকে দাসদের মুক্ত করতে ও তাদের স্বাধীনতা দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এর জন্য তাদের আখিরাতে বিরাট প্রতিদান দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ»

যে-কেউ একজন দাস মুক্ত করে দিলে আল্লাহ সেই দাসের প্রতি অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন। এমনকি তার যৌনাঙ্গের বিনিময়ে তার যৌনাঙ্গকেও মুক্তি দেবেন।[২৭১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসীদের মুক্ত করে দিয়ে তাদের বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ...»

যে-কেউ তার ক্রীতদাসীকে উত্তম শিক্ষা দান করে এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, তারপর তাকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে বিবাহ করে, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।...[২৭২]

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত,

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»

---

২৭১. *বুখারি*, কিতাব : কাফফারাতুল আইমান, বাব : আল্লাহ তাআলার বাণী 'অথবা দাস মুক্ত করা' (সুরা মায়িদা : আয়াত ৮৯) ওয়া আয়্যুর-রিকাবি আযকা, হাদিস নং ৬৩৩৭; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ইত্‌ক, বাব : ফাদলুল-ইত্‌ক, হাদিস নং ১৫০৯।

২৭২. *বুখারি*, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : ইত্তিখাযুস সারারি ..., হাদিস নং ৪৭৯৫।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব রা.-কে স্বাধীন করে দিলেন এবং এই স্বাধীনতাকে তার বিয়ের মোহরানা ধার্য করলেন।[২৭৩]

দাসশ্রেণি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ উপদেশমালা ছিল তাদের মুক্ত ও স্বাধীন করার পথে সমাজ-সংস্কারের চাবিকাঠি। তিনি দাস-দাসীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমনকি শব্দ-ব্যবহার ও বাগ্‌ভঙ্গিতেও শিষ্টাচার বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِى وَأَمَتِى. كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلاَمِى وَجَارِيَتِى وَفَتَاىَ وَفَتَاتِى»

তোমাদের কেউ 'আমার দাস', 'আমার বাঁদি' ইত্যাদি যেন না বলে। কেননা, তোমরা সকল পুরুষই আল্লাহর দাস এবং সকল নারীই আল্লাহর বাঁদি। বরং সে যেন বলে, 'আমার সেবক', 'আমার সেবিকা', 'আমার ছেলে', 'আমার মেয়ে'।[২৭৪]

একইভাবে ইসলাম গৃহবাসীরা যে আহার গ্রহণ করে ও যে পোশাক পরিধান করে তা দাস-দাসীদের খাওয়াতে ও পরাতে নির্দেশ দিয়েছে। তাদের ওপর সাধ্যের বাইরে কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতে নিষেধ করেছে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাস-দাসীদের কল্যাণ বিধানের উপদেশ দিয়ে বলতেন,

«فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلاَ تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ»

তোমরা যা খাও তাদেরকে তা থেকে খাওয়াও, তোমরা যে পোশাক পরিধান করো তাদেরকে তা থেকে পরিধান করাও এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে শাস্তি দিয়ো না।[২৭৫]

---

২৭৩. *বুখারি*, কিতাব : আল-মাগাযি, বাব : গাযওয়াতু খাইবার, হাদিস নং ৩৯৬৫; বাব : ফাজিলাহ ই'তাক আমাত সুম্মা ইয়াতাযাওওয়াজুহা, হাদিস নং ১৩৬৫।

২৭৪. *বুখারি*, কিতাব : আল-ইত্‌ক, বাব : কারাহিয়াতুত তাতাউল আলার-রাকিক..., হাদিস নং ২৪১৪; *মুসলিম*, কিতাব : আল-আলফায মিনাল-আদাব ওয়া গাইরিহা, বাব : হুকুম ইতলাকু লাফযিল আবদি ওয়াল-আমাতি, হাদিস নং ২২৪৯।

২৭৫. *মুসলিম*, কিতাব : আল-আইমান, বাব : ইতআমুল মামলুকি মিম্মা ইয়া'কুলু..., হাদিস নং ১৬৬১; *আহমাদ*, হাদিস নং ২১৫২১; বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, খ. ১, পৃ. ৭৬।

একইভাবে ইসলাম দাস-দাসীদের অন্যান্য অধিকার ঘোষণা করেছে যা তাদের মানব-অস্তিত্বকে উন্নীত করেছে, যার সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির সুযোগ নেই।

ইসলাম আরও গুরুত্ব দিয়ে দাস-দাসীদের কষ্টদান ও প্রহারের শাস্তি হিসেবে সাব্যস্ত করেছে তাদের মুক্ত ও স্বাধীন করে দেওয়াকে, যাতে মানবসমাজ সত্যিকার মুক্তি ও স্বাধীনতায় উত্তীর্ণ হতে পারে। বর্ণিত আছে যে, একবার আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তার একজন গোলামকে পেটালেন। তারপর ডেকে আনলেন, দেখলেন তার পিঠে (প্রহারের) দাগ পড়ে গেছে। তাকে বললেন, আমি কি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি? গোলাম বলল, না। তিনি বললেন, যাও, তুমি মুক্ত। তারপর তিনি মাটি থেকে একটি বস্তু তুলে নিলেন এবং বললেন, এতে (তোমাকে মুক্ত করে দেওয়ায়) এতটুকু ওজনের সওয়াবও মেলেনি। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ»

যে লোক তার গোলামকে বিনা অপরাধে প্রহার করল (অথবা অপরাধের চেয়ে বেশি শাস্তি দিলো) বা চড় মারল, তার কাফফারা হলো তাকে মুক্ত করে দেওয়া।[২৭৬]

ইসলাম এই বিধানও দিয়েছে যে, একবার দাসমুক্তির কথা উচ্চারণ করলে সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যকর হয়ে যাবে। কথার কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ»

তিনটি বিষয়ে সত্য উক্তি ও হাসিঠাট্টার উক্তি উভয়টি সত্য উক্তি বলে বিবেচিত হবে : এক. তালাক, দুই. বিবাহ ও তিন. দাস-দাসী মুক্ত করা।[২৭৭]

---

২৭৬. *মুসলিম*, কিতাব : আল-আইমান, বাব : সুহবাতুল মামালিক ওয়া কাফফারাতু মান লাতামা আবদাহু, হাদিস নং ১৬৫৭; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৫১৬৮; *আহমাদ*, হাদিস নং ৫০৫১।

২৭৭. *মুসনাদ আল-হারিস*, হাদিস নং ৫০৩; বাইহাকি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে মাওকুফরূপে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। খ. ৭, পৃ. ৩৪১।

ইসলাম দাসমুক্তিকে পাপ মার্জনা ও গুনাহ থেকে মুক্তির অন্যতম উপায় বলে আখ্যায়িত করেছে। তার কারণ এই যে, এতে অধিকাংশ দাস-দাসীরই মুক্তি ও স্বাধীনতার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়। কারণ, পাপের কোনো শেষ নেই, আদমসন্তানের প্রত্যেকের থেকে পাপকাজ হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا»

কোনো মুসলিম কোনো মুসলিম দাসকে মুক্ত করলে সে হবে তার জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির কারণ, তার (মুক্ত দাসের) প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার (মুক্তিদাতার) প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যাবে। কোনো মুসলিম পুরুষ দুইজন মুসলিম দাসীকে মুক্ত করলে তারা হবে তার জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির কারণ, তাদের (দুই মুক্ত দাসীর) প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে। কোনো মুসলিম নারী কোনো মুসলিম দাসীকে মুক্ত করলে সে হবে তার জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির কারণ, তার (মুক্ত দাসীর) প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার (মুক্তিদাতা নারীর) প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যাবে।[২৭৮]

ইসলাম দাস-দাসীদেরকে লিখিত বিনিময়চুক্তির মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার সুযোগ দিয়েছে। তা হলো দাস বা দাসীকে তার মনিবের সঙ্গে নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ প্রদানের চুক্তি করবে এবং তার বিনিময়ে সে স্বাধীনতা ভোগ করবে। এ ক্ষেত্রে দাস বা দাসীকে সাহায্য করা মনিবের অবশ্যকর্তব্য বলে ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে। কারণ, মুক্তি ও

২৭৮. মুসলিম : কিতাব : আল-ইতক, বাব : ফাদলুল-ইতক, হাদিস নং ১৫০৯; তিরমিযি আবু উমামা থেকে, হাদিস নং ১৫৪৭; ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৫২২।

স্বাধীনতাই হলো মৌলিক বিষয়, দাসত্ব হলো আপতিত বিষয়। এই ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই আদর্শ। জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস রা.-এর বিনিময়চুক্তির সব টাকা পরিশোধ করে তিনি তাকে বিয়ে করেন।[২৭৯]

মুসলিমগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে জুওয়াইরিয়ার বিয়ের সংবাদ শুনে তাদের হাতে যত বন্দি ছিল সবাইকে ছেড়ে দিলেন। বললেন, তারা তো রাসুলুল্লাহর শ্বশুরের গোষ্ঠী। জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিসের কল্যাণে বনু মুস্তালিক গোত্রের একশজন মানুষ মুক্তি পেল।[২৮০]

তার চেয়ে বড় ব্যাপার হলো, ইসলাম দাসমুক্তিকে যাকাতের একটি খাত বলে বিধান দিয়েছে। (দাসকে তার মুক্তির জন্য যাকাতের টাকা প্রদান করা যাবে।) আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ﴾

সদকা (যাকাত) তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য[২৮১], দাসমুক্তির জন্য।[২৮২]

---

২৭৯. বনু মুস্তালিক যুদ্ধে গোত্র-প্রধানের কন্যা জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস বন্দি হন ও তার স্বামী (ও তার চাচাতো ভাই) মুসাফি ইবনে সাফওয়ান ইবনে আবুশ শাফর নিহত হন। গনিমতের সম্পদ বণ্টনের সময় তিনি সাবিত ইবনে কাইস রা.-এর ভাগে পড়েন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। তিনি সাবিত ইবনে কাইসের সঙ্গে মুক্তির জন্য লিখিত বিনিময়চুক্তি করেন এবং এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাহায্য চান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুওয়াইরিয়ার সম্মতি নিয়ে তার বিনিময়চুক্তির টাকা পরিশোধ করে তাকে বিয়ে করেন।-অনুবাদক

২৮০. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আস-সালেহি আশ-শামি, *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ*, খ. ১১, পৃ. ২১০; ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৩, পৃ. ৩০৩; সুহাইলি, *আর-রওদুল উনুফ*, খ. ৪, পৃ. ১৮।

২৮১. যে অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ করার আশা আছে, তার মন জয় করার জন্য তাকে অথবা যে মুসলিমকে কিছু দিলে ইসলামের প্রতি তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হওয়ার আশা আছে তাকে যাকাত দেওয়া যায়।

২৮২. সুরা তাওবা : আয়াত ৬০।

বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬৩ দাস-দাসীকে এবং আয়িশা রা. ৬৯ দাস-দাসীকে মুক্ত করেছিলেন। আবু বকর সিদ্দিক রা. অসংখ্য দাস-দাসীকে মুক্ত করেছিলেন। আব্বাস রা. ৭০ দাসকে এবং উসমান ইবনে আফফান রা. ২০ দাস-দাসীকে মুক্ত করেছিলেন। হাকিম ইবনে হিযাম রা. একশ দাস-দাসী এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এক হাজার দাস-দাসী মুক্ত করেছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. ত্রিশ হাজার দাস-দাসী মুক্ত করেছিলেন।[২৮৩]

দাস-ব্যবসার সংকোচনে ইসলামের উপর্যুক্ত নীতিসমূহ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। এমনকি পরবর্তী সময়ে দাস-ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী ইসলামি শাসনামলগুলোতে দেখা গেছে যে, দাসেরা দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বের শিখরে পৌঁছে গেছে। এই ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো মামলুক সাম্রাজ্যের শাসনামল। মুসলিম উম্মাহর বিশাল ভূখণ্ডজুড়ে তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল এবং তা প্রায় তিনশ বছর টিকে ছিল। সন্দেহাতীতভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

---

২৮৩. আল-কাত্তানি এসব সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। দেখুন, *আত-তারাতিবুল ইদারিয়্যা*, পৃ. ৯৪-৯৫।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৫. মালিকানার স্বাধীনতা

মালিকানার প্রশ্নে প্রাচীন পৃথিবী ও আধুনিক পৃথিবীর অস্থিরতার শেষ নেই। এ ব্যাপারে নানা ধরনের মত এবং নানা পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়েছে। কমিউনিজমের উদ্ভব ঘটেছে, যা ব্যক্তির মূল্য ও স্বাধীনতাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এই মতবাদ অনুসারে কেউই কোনো ভূমির বা কারখানার বা স্থাবর সম্পত্তির বা অন্য কোনো উৎপাদন উপকরণের মালিক হতে পারবে না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের শ্রমিক হয়ে কাজ করতে হবে, রাষ্ট্রই সকল উৎপাদন-উৎসের মালিক ও তাদের পরিচালক। ব্যক্তির জন্য পুঁজির মালিক হওয়া অবৈধ, যদিও পুঁজি বৈধ হয়।

একইভাবে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে। পুঁজিবাদের ভিত্তি হলো ব্যক্তির মালিকানা-স্বাধীনতার পবিত্রকরণ ও তার লাগামহীনতা। ফলে ব্যক্তি যা ইচ্ছা তার মালিক হতে পারে এবং মালিকানাধীন সম্পদকে যেভাবে খুশি বৃদ্ধি করতে পারে এবং যেখানে খুশি তা খরচ করতে পারে। সম্পদের মালিক হওয়া, তা বৃদ্ধি করা ও তার খরচ করার যত ধরনের উপায় আছে সেগুলোতে কোনো বিধিনিষেধ নেই। ব্যক্তির সম্পদে সমাজের কোনো ধরনের অধিকারও নেই।

পুঁজিবাদ ব্যক্তি-মালিকানার বিষয়টিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলতে বাড়াবাড়ি করেছে এবং কমিউনিজম ব্যক্তি-মালিকানাকে বাতিল করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। ফলে এই দুটি অর্থব্যবস্থা সর্বদিক থেকে ক্ষতিকর ও অশুভ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলাম অর্থব্যবস্থায় মধ্যপন্থার কথা বলেছে, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করে। ইসলাম ব্যক্তি-মালিকানার বৈধতা দিয়েছে এবং অন্যদের সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা তৈরি করে দিয়েছে। যেমন গণমানুষের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে গিয়ে নির্দিষ্ট কিছু বস্তুতে (ব্যক্তি) মালিকানার অধিকার নিষিদ্ধ করেছে এবং গণমালিকানা নিশ্চিত করেছে। এর অর্থ এই যে, ইসলাম ভারসাম্য ও

সমতা বজায় রাখতে ব্যক্তি-মালিকানার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং গণমালিকানার স্বাধীনতাকেও স্বীকৃতি দিয়েছে।

ইসলাম ব্যক্তিকে বস্তুর অধিকার লাভ এবং নির্দিষ্ট পর্যায়ে ও নির্ধারিত মাত্রায় সেসব বস্তু ভোগ করতে মালিকানার অধিকার দিয়েছে। কারণ তা স্বাভাবিক প্রকৃতির চাহিদাগুলোর অন্যতম এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার একটি বৈশিষ্ট্য, বরং তা মনুষ্যত্বেরও অনন্য বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া ব্যক্তি-মালিকানা অধিক ও উত্তম উৎপাদনের একটি শক্তিশালী কারণ। ইসলাম এই অধিকারকে ইসলামি অর্থনীতির একটি মৌলিক নীতি হিসেবে স্থির করেছে। এই নীতির স্বাভাবিক ফলাফল, সম্পদকে তার মালিকের জন্য সুরক্ষিত রাখা এবং ছিনতাই, চুরি ও গচ্চা যাওয়া থেকে হেফাজত করা ইত্যাদি। ইসলাম এই অধিকারের নিরাপত্তা বিধান এবং ব্যক্তি তার বৈধ অধিকারের ক্ষেত্রে যেসব হুমকির সম্মুখীন হয় সেগুলোকে প্রতিহত করার জন্য যারা এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করবে তাদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে। ইসলাম মালিকানার অধিকারের অন্য পরিণতিও নিশ্চিত করেছে, তা হলো লেনদেনের স্বাধীনতা : বেচা-কেনা, ভাড়া দেওয়া, বন্ধক রাখা, (হেবা করা) উইল করা ও অন্যান্য বৈধ লেনদেনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে।

তবে ইসলাম ব্যক্তি-মালিকানাকে কোনো ধরনের শর্ত বা সীমারেখা ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়নি, বরং ব্যক্তি-মালিকানার জন্য শর্ত ও সীমারেখা নিরূপণ করেছে, যাতে অন্যদের অধিকার বিনষ্ট না হয়। যেমন সুদ, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, ঘুষ, মজুতদারি ইত্যাদি যেসব অশুভ কর্মকাণ্ড সমাজের কল্যাণ বিনষ্ট করে সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছে। ব্যক্তি-মালিকানার স্বাধীনতায় নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, এটিই আল্লাহ তাআলার নিম্নলিখিত বাণীর উদ্দেশ্য,

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾

পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।[২৮৪]

---

২৮৪. সুরা নিসা : আয়াত ৩২।

2 ব্যক্তি-মালিকানার আরেকটি শর্ত হলো ব্যক্তি তার সম্পদকে উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করবে। সম্পদ অনর্থক ফেলে রাখা তা তার মালিকের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনই সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যও ক্ষতিকর। 3 আরেকটি শর্ত হলো সম্পদ নিসাব (যাকাত আবশ্যক হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ) পর্যন্ত পৌছলে এবং এক বছর পূর্ণ হলে তার যাকাত আদায় করা। যাকাত সম্পদের অধিকার।

ইসলামে রয়েছে গণমালিকানার বিধান। এ ধরনের মালিকানায় একটি বিশাল মানবসমাজের অথবা কয়েকটি মানব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ থাকে এবং সকল সদস্যই তার উপকারিতা লাভ করে। ব্যক্তি সমাজের সদস্য হওয়ার কারণেই গণমালিকানা থেকে উপকার পেয়ে থাকে, যদিও তার জন্য বিশেষ অংশ নির্ধারিত থাকে না। যেমন মসজিদ, পাবলিক হাসপাতাল, রাস্তা, নদী, সমুদ্র, ব্রিজ, সেতু ইত্যাদি। এগুলোর মালিক সমাজের সবাই এবং সকলের কল্যাণে এগুলো ব্যবহৃত হয়। শাসক বা শাসকের প্রতিনিধি বা পরিচালন-কর্তৃপক্ষ এগুলোর মালিক নয়, তাদের দায়িত্ব হলো সুচারুরূপে পরিচালনা করা এবং সঠিক নির্দেশনায় এগুলোর উন্নতি বিধান করা এবং এ দুটি দায়িত্বই মুসলিম সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

ইসলাম মালিকানা লাভে কতিপয় পন্থা ও উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং বাকি পন্থা ও উপায় নিষিদ্ধ করেছে। ব্যক্তি-মালিকানা লাভের উপায়গুলোকে দুটি গুচ্ছে ভাগ করেছে : এক. মালিকানায় অর্জিত সম্পদ, অর্থাৎ, যেসব সম্পদের মালিকানা রয়েছে। এসব সম্পদ শরয়ি কারণ বা উপায় ব্যতীত তার মালিকের মালিকানা থেকে অন্যের মালিকানায় আসবে না। যেমন উত্তরাধিকার, উইল বা ওসিয়ত, বিনিময়চুক্তি, অগ্রক্রয়াধিকার, হেবা ইত্যাদি। দুই. দ্বিতীয় গুচ্ছে রয়েছে বৈধ সম্পদ, অর্থাৎ যা নির্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানায় যায়নি। এসব সম্পত্তির মালিকানা নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হবে না যতক্ষণ না কোনো কর্মের দ্বারা তা মালিকানায় ও অধিকারে আসে। যেমন মৃত ভূমি আবাদ করা, শিকার করা, খনিজ সম্পদ বা পদার্থ উত্তোলন করা, অথবা শাসক কর্তৃক এমন সম্পত্তির একটি অংশ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দান করা।

ইসলামে গণমালিকানার উপায়গুলো বিভিন্ন পর্বে ভাগ করা যায়।

১. প্রাকৃতিক গণসম্পদ। রাষ্ট্রের সকল মানুষ কোনো ধরনের প্রচেষ্টা বা কর্ম ছাড়াই এগুলো লাভ করে থাকে। যেমন পানি, ঘাস, আগুন ও আনুষঙ্গিক বিষয়।

২. সংরক্ষিত সম্প্রদ। অর্থাৎ, রাষ্ট্র তা মুসলিম বা সকল মানুষের উপকারের জন্য সংরক্ষণ করে। যেমন কবরস্থান, সরকারি এলাকাসমূহ, ওয়াকফকৃত সম্পত্তি, যাকাত ইত্যাদি।

৩. এমন সম্পদ যেখানে কারও হাত পড়েনি অথবা হাত পড়েছে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এমনিতেই পড়ে আছে। যেমন অনাবাদি জমি বা খাস জমি।[২৮৫]

মালিকানা রক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা সম্পদ পাহারা দেওয়ার ও হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। একইভাবে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বৈধকৃত শাস্তির দ্বারা ইসলামি শরিয়ত মালিকানার অধিকারকে সুরক্ষা দিয়েছে। যেমন চোরের হাত কাটা ইত্যাদি।

মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত বৈধ উত্তম সম্পদের ওপর, অন্যদের সম্পদ বা হিসাবের ওপর নয়। সুতরাং এতিমদের প্রতারণা করে তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা যাবে না, দরিদ্রদের দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে ফায়দা হাসিল করা যাবে না, মুখাপেক্ষীদের প্রয়োজনীয়তার দোহাই দিয়ে সুদের মাধ্যমে তাদের সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া যাবে না। জুয়ার দ্বারাও সম্পদ অর্জন করা যাবে না, জুয়া সমাজে শত্রুতা ও অরাজকতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং সমাজের সদস্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।[২৮৬]

---

২৮৫. http://www.islamtoday.net/toislam/11/11.3.cfm
২৮৬. সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৮।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা একে অন্যের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর সম্মত হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।[২৮৭]

মালিকানা যদি অবৈধ পন্থা বা উপায়ে অর্জিত হয় তাহলে ইসলাম তার স্বীকৃতি দেয় না এবং তার সুরক্ষারও দায়িত্ব নেয় না, বরং তা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আসল মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। যেমন চুরিকৃত মাল বা ছিনতাইকৃত মাল। এসব মালের মালিক পাওয়া না গেলে বাইতুল মালে (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) রাখা হবে।

ইসলাম সম্পদ অর্জনের পন্থা ও সম্পদ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন শর্ত ও শরিয়তসম্মত লেনদেনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। বাতিল পন্থায় ও হারাম উপায়ে বর্ধিত সম্পদের স্বীকৃতি ইসলামে নেই। যেমন সুদি কারবার থেকে বর্ধিত সম্পদ বা মদ ও মাদকদ্রব্য বিক্রির ফলে অর্জিত সম্পদ অথবা জুয়ার আসর বা জুয়ার ক্লাব থেকে অর্জিত সম্পদ। কারও মালিকানায় অর্থসম্পদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছে গেলে সমাজের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক করা হয়েছে, যাকাত ও শরয়ি খরচাদির মাধ্যমে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। একইভাবে এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি সম্পদে ওসিয়ত করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যাতে দুই-তৃতীয়াংশ উত্তরাধিকারীদের জন্য সুরক্ষিত থাকে।

ইসলাম অর্থসম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও মধ্যপন্থা অবলম্বনের শর্তারোপ করেছে। অপচয়ও করা যাবে না, কৃপণতাও করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا﴾

এবং তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।[২৮৮]

---

২৮৭. সুরা নিসা : আয়াত ২৯।

একইভাবে অবৈধ খাতে, ইসলামি শরিয়ত যেসব বিষয় হারাম করেছে সেসব ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। জনসাধারণের উপকারের স্বার্থে মালিককে ন্যায্য বিনিময় প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ নিয়ে নেওয়ারও বৈধতা দেওয়া হয়েছে। যেমন জনপথ প্রশস্ত করার জন্য সম্পদ অধিগ্রহণ করা।[২৮৯]

ইসলামি রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্পদের এই অনুপম অনন্য ব্যবস্থা ভোগ করে থাকে, হোক তারা মুসলিম বা অমুসলিম। এভাবে তারা অনেক সম্পদের মালিকও হতে পারে। উদাহরণত, দশম আব্বাসি খলিফা মুতাওয়াক্কিলের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও একান্ত বিশ্বাসভাজন খ্রিষ্টান বুখতাইশু ইবনে জিবরিল পোশাক-আশাকে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে, ধনে-সম্পদে খলিফার মতোই ছিলেন।[২৯০] একই সময়ে এই সকল লোক গণমালিকানার কল্যাণে প্রাচুর্য ও বৈভব ভোগ করেছেন।

ইসলামে এমনই মালিকানার স্বাধীনতা। এটা সকলের জন্য সুনিশ্চিত অধিকার। কিন্তু শর্ত এই যে, এই অধিকার ব্যবহার করে গণকল্যাণের ক্ষতি করা যাবে না এবং অন্যদের ব্যক্তিগত কল্যাণ বিনষ্ট করা যাবে না।

---

[২৮৮]. সুরা ফুরকান : আয়াত ৬৭।

[২৮৯]. সুলাইমান ইবনে আবদুর রহমান আল-হাকিল, *হুকুকুল ইনসান ফিল-ইসলাম*, পৃ. ৫৭।

[২৯০]. মুস্তফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৬৮।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবার

মুসলিম পরিবার ইসলামি সমাজের প্রাসাদে একটি ভিত্তি-ইটের ভূমিকা পালন করে। মুসলিম পরিবারই এই সমাজের রক্ষাদুর্গ এবং তার নিরাপত্তা ও শান্তির প্রহরী।

ইসলাম পরিবারকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং পরিবারের জন্য যৌক্তিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করেছে। পরিবারের ব্যক্তি সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ বর্ণনা করেছে। বিবাহ, খরচাদি, উত্তরাধিকার (মিরাস), সন্তান লালনপালন, মা-বাবার অধিকার ইত্যাকার কর্মনীতি প্রণয়ন করেছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা ও মায়া-মমতা দৃঢ়মূল করে দিয়েছে। তার কারণ এই যে, পরিবার শক্তিশালী হলে এবং পরিবারের সদস্যদের আচার-আচরণ ও কাজকর্ম যথাযথ হলে সমাজও শক্তিশালী হয়, সমাজ সুন্দরভাবে গতিশীল থাকে। সমাজের সদস্যদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক সৌজন্যবোধ জাগরূক থাকে। ইসলাম সমাজকে সভ্যতার আদলে যে উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে তার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এভাবেই ইসলাম পরিবার ও সমাজকে অনর্থ, চারিত্রিক অধঃপতন ও বংশের বিনষ্টি থেকে সুরক্ষা দিয়েছে।

সামনের অনুচ্ছেদসমূহ থেকে পরিবারের ক্ষেত্রে চরিত্র ও মূল্যবোধের সভ্যতাকেন্দ্রিক বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রী বা দাম্পত্যজীবন

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সন্তান

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মা-বাবা (ছোট পরিবার)

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : আত্মীয়স্বজন (বড় পরিবার)
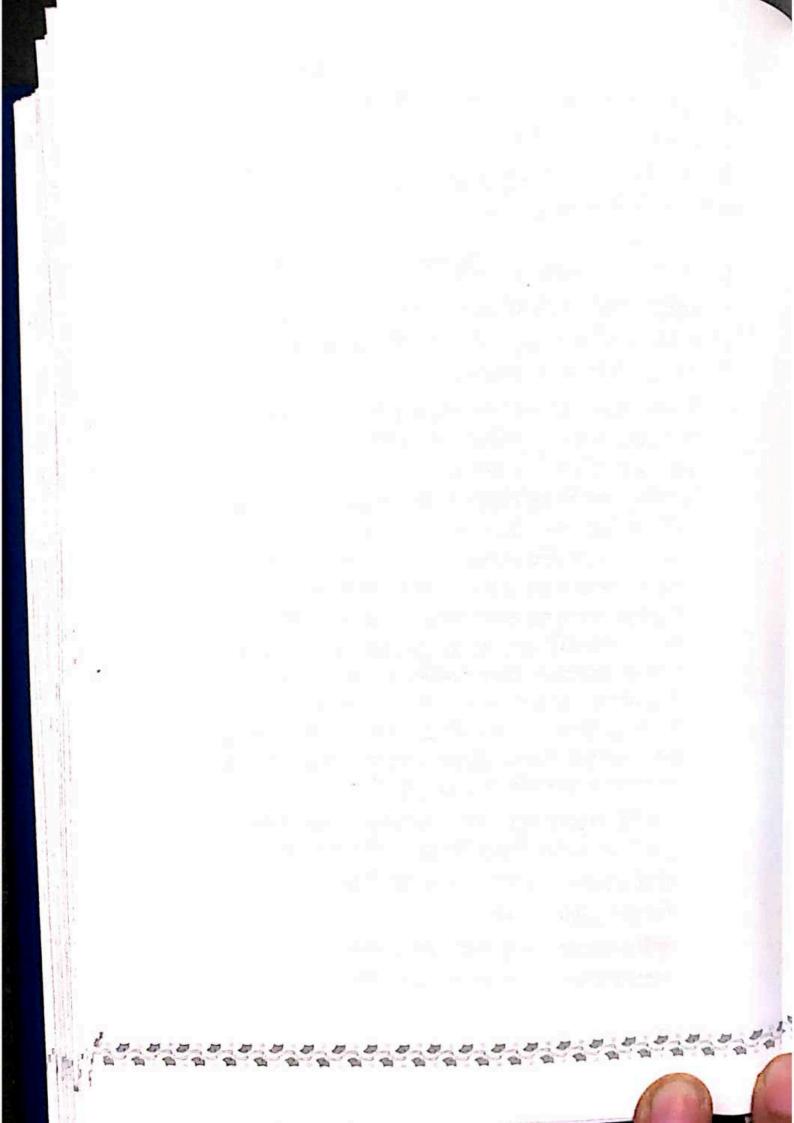
প্রথম অনুচ্ছেদ

১. স্বামী-স্ত্রী বা দাম্পত্যজীবন

পরিবার দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, এই দুটি স্তম্ভ পরিবারের ভিত্তি। তারা হলো পুরুষ ও নারী, অর্থাৎ, স্বামী ও স্ত্রী। তারা পরিবার নির্মাণ ও সন্ততি উৎপাদনের মূল ভিত্তি। স্বামী-স্ত্রীই মানব বংশধারা চালু রাখে, যাদের দ্বারা সমাজ ও উম্মাহ গঠিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾

হে মানব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদের এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দুইজন থেকে বহু নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।[২৯১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾

এবং আল্লাহ তোমাদের থেকেই তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন।[২৯২]

ইসলাম পরিবারের এই দুটি মৌলিক স্তম্ভের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। তাই দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

---

২৯১. সুরা নিসা : আয়াত ১।
২৯২. সুরা নাহল : আয়াত ৭২।

স্বামী ও স্ত্রীর প্রত্যেকের জন্য অধিকারের ও দায়িত্বের সীমারেখা টেনে দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়েছে। যাতে তারা উভয়ে পরিবার নির্মাণ ও পরিচালনায় তাদের পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং অব্যাহতভাবে সমাজ বিনির্মাণে অবদান রাখতে পারে।

ইসলাম প্রথমেই বিবাহের বিষয়টিকে বিধিবদ্ধ করেছে। বিবাহের উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে রক্ষা করা এবং সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা সমাজকে সাহায্য করা। এই সৎ ব্যক্তিরা পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করবে এবং নির্মাণ ও আবাদির দায়িত্ব পালন করবে। এই দায়িত্ব পালনই খিলাফতের বা জমিনে মানুষের প্রতিনিধিত্বের দাবি। বিবাহের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি ও সমাজকে অনৈতিকতা ও চারিত্রিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করা। এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকদের উদ্দেশে বলেন,

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

হে যুব-সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা, তা চোখকে আনত রাখে ও লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোযা রাখে, কেননা, রোযাই হলো তার জন্য খোঁজা হওয়ার মতো।[২৯০]

কয়েকজন যুবক চিন্তা করেছিলেন যে তারা ইবাদতের জন্য সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন এবং নারীদের পরিত্যাগ করবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ধমক দেন এবং তাদের এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করেন। এই ঘটনা আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا

---

২৯০. *বুখারি*, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : মান লাম ইয়াসতাত্বি-বাআতা ফালইয়াসুম, হাদিস নং ৪৭৭৯; *মুসলিম*, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : ইসতিহবাবুন নিকাহ লি-মান তাকাত নাফসুহু লাহু, হাদিস নং ১৪০০।

فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

একবার তিনজন লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের কাছে এলো। যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে তাদের বলা হলো তারা এটিকে কম মনে করল। এবং পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, আমরা কোথায় আর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায় (তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো তুলনাই হয় না)? কারণ, তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তাদের একজন বলল, আমি সবসময় রাতভর নামাজ পড়ব। আরেকজন বলল, আমি সবসময় দিনের বেলা রোযা রাখব, কখনো রোযা ভাঙব না। তৃতীয়জন বলল, আমি সর্বদা নারীদের থেকে দূরে থাকব, কখনো বিয়ে করব না। ঠিক এই সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, তোমরাই কি এমন এমন কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কখনো রোযা রাখি, কখনো বিরতি দিই; কখনো রাত জাগি (রাত জেগে ইবাদত করি), কখনো ঘুমিয়েও থাকি; আমি নারীদের বিবাহও করি (স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করি)। সুতরাং যারা আমার সুন্নাহ

(জীবনপদ্ধতি) থেকে বিরাগ হয় তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২১৫]

যারা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছে ও নিজেদের পক্ষ থেকে বিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তাদের এমন সংকীর্ণ চিন্তার ফলে মানবতার বিরুদ্ধে অনেক বেশি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। পনেরো শতাব্দীব্যাপী সংকট ও অস্থিরতার অভিজ্ঞতা লাভের পর ইউরোপের জ্ঞানী সম্প্রদায় যখন দেখল যে সন্ন্যাসবাদ অন্ধকারে বিপর্যয় ঘটানো ছাড়া আর কিছুই করেনি, তারা এটিকে নিষিদ্ধ করল। দেখা গেছে যে, বহু সংখ্যক পুরোহিত, বিশপ, পাদরি মেয়েশিশু ও ছেলেশিশুকে ধর্ষণের মতো অপরাধ ঘটিয়েছে। এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকায় এই মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। শত শত বিশপ ও পাদরিকে পদচ্যুত করা হয়েছে। গির্জাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি হুমকির মুখে পড়েছে এবং যৌন বিকৃতি ও সীমালঙ্ঘনের ভয়াবহতা তাকে গ্রাস করেছে। আমাদের সত্যনিষ্ঠ দ্বীন আমাদেরকে এ ধরনের যাবতীয় বিকৃতি ও সীমালঙ্ঘন থেকে সুরক্ষা দিয়েছে এবং নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতা ও ইতর ব্যাধি থেকে স্বস্তি দিয়েছে।

বিবাহের পেছনে ইসলামের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির আত্মিক প্রশান্তি অর্জন। ব্যক্তির অন্তরে যে অনুভূতি ও আবেগ ক্রিয়াশীল থাকে তা উজাড় হয় বিবাহের কারণে। তা ছাড়া বিয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সুখ-আহ্লাদেরও কারণ, তাদের একজন অপরজনকে সুখ দিয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রী যখন একত্রে থাকে তখন তারা পারস্পরিক উত্তম সঙ্গী, যখন তাদের একজন অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় (সফর বা অন্য কোনো কারণে) তখনও তারা উত্তম সঙ্গী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের যাতে

[২১৫]. *বুখারি*, কিতাব : নিকাহ, বাব : আত-তারগিব ফিন-নিকাহ, হাদিস নং ৪৭৭৬; *মুসলিম*, কিতাব : নিকাহ, বাব : ইসতিহবাবুন নিকাহ লি-মান তাকাত নাফসুহু ইলাইহি, হাদিস নং ১৪০১।

তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।[২৯৫]

উপর্যুক্ত আয়াতে যে তিনটি মৌলিক বিষয় (শান্তি, ভালোবাসা, দয়া) বিবৃত হয়েছে, এই তিনটি বিষয়ের দ্বারা ইসলামের কাঙ্ক্ষিত দাম্পত্য সুখ ও সৌভাগ্য নিশ্চিত হয়।

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কে সুন্দর সঙ্গী নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত (তারা পুরুষ হোক বা নারী) তাদের বিবাহ সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[২৯৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষকে দ্বীনদার সতী নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»

নারীকে (সাধারণত) চারটি গুণের কারণে বিয়ে করা হয় : তার ধনসম্পদের কারণে বা তার বংশগৌরবের কারণে, তার সৌন্দর্যের কারণে ও তার ধর্মপরায়ণতার কারণে। লাভবান হতে চাইলে

২৯৫. সুরা রুম : আয়াত ২১।
২৯৬. সুরা নুর : আয়াত ৩২।

ধর্মপরায়ণা নারীকে বিয়ে করো। আরে বোকা, তোমার হস্তদ্বয় ধূলিধূসরিত হোক।[২৯৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীকেও একই মানদণ্ড ও নীতির ভিত্তিতে স্বামী নির্বাচন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»

যখন তোমাদের (মেয়েদের বিয়ে করতে) এমন লোক প্রস্তাব দেবে যার দ্বীনদারি ও চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তার কাছে বিয়ে দিয়ে দাও। তা না করলে জমিনে ফেতনা ও ব্যাপক অরাজকতা ছড়িয়ে পড়বে।[২৯৮]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উত্তম স্ত্রী বা স্বামী নির্বাচনের ফলে মানবসমাজ উপকৃত হয়। কারণ, সৎ ও ধার্মিক স্বামী-স্ত্রীর সন্তানসন্ততির দ্বারাই সৎ ও সুন্দর প্রজন্ম তৈরি হয়। এসব সন্তানসন্ততি ভালোবাসাপূর্ণ ও দয়াময় পরিবারে বেড়ে ওঠে এবং ইসলামি মূল্যবোধ ও নৈতিক অনুশাসনের ছায়ায় জীবনযাপন করে।

বিবাহবন্ধন একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্ধন বা চুক্তি। এই চুক্তি সম্পাদন করার পূর্বে কিছু পালনীয় ভূমিকা রয়েছে, যা এই বন্ধনকে অটুট ও সুদৃঢ় রাখবে। বরং ইসলামি শরিয়তে যত ধরনের চুক্তি রয়েছে তার কোনোটির ক্ষেত্রেই বিবাহের মতো পূর্বপালনীয় কর্তব্য জুড়ে দেয়নি। শরিয়ত এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে এবং বিশেষ বিধান জারি করেছে। বিবাহবন্ধনের পূর্বপালনীয় কর্তব্যের মধ্যে একটি হলো 'খিতবাহ' বা 'প্রস্তাব'। প্রস্তাব-পর্যায়ে পারস্পরিক জানাশোনা ও নৈকট্য তৈরি হয়। এক

---

২৯৭. *বুখারি*, কিতাব : নিকাহ, বাব : আল-আকফাউ ফিদ-দ্বীন, হাদিস নং ৪৮০২; *মুসলিম*, কিতাব : আর-রাদাউ, বাব : ইসতিহবাবু নিকাহি যাতিদ-দ্বীন, হাদিস নং ১৪৬৬।

২৯৮. *তিরমিযি*, কিতাব : নিকাহ, বাব : মা জাআ ইযা জাআকুম মান তারযাওনা দ্বীনাহু ফাযাওয়িজুহু, হাদিস নং ১০০৪; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৯৬৭; *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ২৬৯৫। হাকিম বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ, যদিও *বুখারি* ও *মুসলিমে* তা সংকলিত হয়নি।

পক্ষ অপর পক্ষকে ভালোভাবে জানতে-বুঝতে পারে। এর ভিত্তিতেই বিবাহ-কার্যক্রমের সূচনা হয় অথবা তা নাকচ করে দেওয়া হয়।

ইসলামি শরিয়ত বিবাহচুক্তির শুদ্ধতার জন্য আরেকটি বিষয় শর্ত করেছে। তা হলো তা প্রচার-প্রসার করা। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। কারণ, বিবাহের দ্বারা জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধিত হয়। সুতরাং তা প্রচার করাই সংগত, যাতে কুধারণার সৃষ্টি না হয় এবং কেউ সন্দেহ না করে।

ইসলাম বিবাহবন্ধনকে দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যের ছকে বেঁধে দিয়েছে, যা স্বামী-স্ত্রীর সুখশান্তি নিশ্চিত করে এবং পরিবারের জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। ইসলাম পুরুষ ও নারীকে যে শক্তি ও সামর্থ্য দান করেছে তার ভিত্তিকে পুরুষকে নারীর অগ্রগণ্য বানিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

> পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যেহেতু তারা তাদের সম্পদ থেকে খরচ করে।[২৯৯]

এই অগ্রগণ্যতার কারণে ইসলাম স্বামীর ওপর দেনমোহর ফরজ করেছে এবং একে স্ত্রীর অধিকার বলে সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

> তোমরা নারীদের তাদের দেনমোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে।[৩০০]

স্ত্রীর আরেকটি অধিকার হলো ভরণপোষণ প্রাপ্তি। খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা ও অন্যান্য যত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে সব স্ত্রীর প্রাপ্য। যথাযথ ভালো ব্যবহার প্রাপ্তিও স্ত্রীর অধিকার। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[২৯৯]. সুরা নিসা : আয়াত ৩৪।
[৩০০]. সুরা নিসা : আয়াত ৪।

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

স্ত্রীদের সঙ্গে যথাযথ ভালো ব্যবহার করো। যদি তোমরা তাদের ঘৃণা করো, তাহলে তোমরা এমনকিছু ঘৃণা করছ যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।[৩০১]

এ সবকিছুর বিনিময়ে ইসলাম স্ত্রীর ওপর স্বামীকে আনুগত্যপ্রাপ্তির অধিকার দিয়েছে। স্ত্রীর ওপর স্বামীর যত অধিকার রয়েছে তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আনুগত্য।

এভাবে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও পালনীয় দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং উভয়ের কাছে সদাচার ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ ও যৌথ জীবনে সাহায্য-সহযোগিতা করতে দাবি জানিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ও জটিলতার সৃষ্টি হলে তার সুরাহার জন্যও যথার্থ পন্থা নির্দেশ করেছে। চরম পর্যায়ে, যখন স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলা এবং দাম্পত্যজীবনে কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত নীতিমালা মান্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন তালাকের বৈধতা দিয়েছে।[৩০২]

---

৩০১. সুরা নিসা : আয়াত ১৯।

৩০২. মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু সালিহ, *হুকুকুল ইনসান ফিল-কুরআনি ওয়াস-সুন্নাহ ওয়া-তাতবিকাতুহা ফিল-মামলাকাতিল আরাবিয়্যাতিস সাউদিয়্যা*, পৃ. ১৩৫-১৩৮।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সন্তান

সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও শোভা। তারা চিত্তের আনন্দ ও চোখের শীতলতা। ইসলাম সন্তানদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামি শরিয়ত মাতাপিতার ওপর সন্তানের অধিকার ও সন্তানের প্রতি কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে।

সন্তান মা-বাবার পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার অন্তরে প্রাথমিক জীবনচিত্র অঙ্কন করে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ»

> প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের (আল্লাহপ্রদত্ত দ্বীন গ্রহণের স্বভাবের) ওপর জন্মগ্রহণ করে। তার মা-বাবাই তাকে ইহুদি বা নাসারা বা পৌত্তলিক বানায়।[৩০৩]

সন্তানসন্ততির দ্বীনদারি ও চরিত্র গঠনে মা-বাবার বড় প্রভাব রয়েছে। মা-বাবার সততার ওপর নির্ভর করে সন্তানদের কল্যাণ ও উম্মাহর ভবিষ্যৎ। এ কারণে সন্তানদের অধিকার তাদের জন্মের পূর্ব থেকেই কার্যকর হয়ে থাকে। যেমন সততাপরায়ণ মা ও সততাপরায়ণ বাবা নির্বাচন। ইতিপূর্বে আমরা এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি।

স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের উত্তম নির্বাচনের পর সন্তানের যে অধিকারটি সামনে আসে তা হলো তাকে শয়তান (শয়তানের প্রভাব) থেকে সুরক্ষিত রাখা।

---

৩০৩. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, কিতাব : আল-কাদ্‌র, বাব : আল্লাহু আ'লামু বিমা কানু আমিলিন, হাদিস নং ৬২২৬; *মুসলিম*, কিতাব : আল-কাদ্‌র, বাব : মা'না কুল্লু মাওলুদিন ইয়ুলাদু আলাল-ফিতরাহ ওয়া হুকমু মাওতি আতফালিল কুফফার ও ইয়া আতফালিল-মুসলিমিন, হাদিস নং ২২।

তা জরায়ুতে বীর্য স্থাপনের সময়। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহবাসের সময় যে দোয়া পাঠ করতে নির্দেশনা দিয়েছেন তা থেকে তা স্পষ্ট হয়। এই দোয়ার ফলে গর্ভের ভ্রূণ শয়তানের প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ»

যদি তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করার সময় এই দোয়া পাঠ করে, বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ, শয়তানকে আমাদের থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদের যে সন্তান দান করবেন তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখুন। তাহলে তাদের যে সন্তান দান করা হয় শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।[৩০৪]

সন্তান মাতৃগর্ভে ভ্রূণে পরিণত হওয়ার পর তার জন্য ইসলাম যে অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে তা হলো জীবনের অধিকার। ইসলাম (চার মাসের) ভ্রূণ অবস্থায় গর্ভপাত নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামি শরিয়া মায়ের ওপর জন্মের আগেই ভ্রূণ ফেলে দেওয়া হারাম করে দিয়েছে। কারণ, এটি একটি আমানত, যা আল্লাহ তাআলা তার গর্ভে রেখেছেন। এই ভ্রূণের জীবনের অধিকার রয়েছে। সুতরাং একে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা কষ্ট দেওয়া জায়েয হবে না। শরিয়ত এটিকে 'প্রাণ' বলে বিবেচনা করেছে। চার মাস অতিবাহিত হওয়ার ও এতে 'রুহ' ফুঁকে দেওয়ার পর ভ্রূণ হত্যা জায়েজ নেই। এমনকি ইসলামি শরিয়া ভ্রূণ হত্যাকারীর ওপর ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক করে দিয়েছে। মুগিরা ইবনে শুবা রা. থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা, হুযাইল গোত্রের এক লোকের দুজন স্ত্রী ছিল। তাদের একজন অপরজনকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে তাকে ও তার গর্ভের সন্তানকে মেরে ফেলল। নিহত মহিলার আত্মীয়স্বজন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিচার চাইল। ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

---

৩০৪. *বুখারি*, কিতাব : নিকাহ, বাব : মা ইয়াকুলুর রাজুলু ইযা আতা আহলাহু, হাদিস নং ৪৭৬৭; *মুসলিম*, কিতাব : নিকাহ, বাব : মা ইয়ুসতাহাব্বু আন ইয়াকুলাহু ইনদাল জিমা, হাদিস নং ২৫৯১।

«ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِىَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا - قَالَ - وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ - قَالَ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِى بَطْنِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ. قَالَ وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ»

এক মহিলা তার সতিনকে তাঁবুর খুঁটি দ্বারা আঘাত করল। সে ছিল গর্ভবতী। (আঘাতকারী মহিলা আঘাতের দ্বারা) তাকে মেরে ফেলল। তাদের একজন ছিল লিহইয়ান গোত্রের নারী। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হত্যাকারী মহিলার আসাবার (আত্মীয়স্বজনের) ওপর নিহত মহিলার দিয়ত (রক্তপণ) দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং গর্ভের সন্তানের জন্য (ক্ষতিপূরণ হিসেবে) একটি দাস প্রদান করতে বললেন। হত্যাকারী নারীর এক আত্মীয় বলল, আমরা কি এমন শিশুর ক্ষতিপূরণ দেবো যে খায়নি, পান করেনি, এমনকি আওয়াজও করেনি? এমন বিষয় তো বাতিলযোগ্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ তো বেদুইনদের ছন্দযুক্ত বাক্যের মতো একটি বাক্য। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাদের ওপর দিয়ত (ক্ষতিপূরণ) সাব্যস্ত করলেন।[৩০৫] (অনুবাদক কর্তৃক ঈষৎ পরিমার্জিত)

ইসলামি শরিয়া গর্ভবতী নারীকে রমজানে পানাহারের অনুমতি দিয়েছে। গর্ভের সন্তানের সুস্থতা বজায় রাখাই এর উদ্দেশ্য। এমনকি গর্ভবতী নারীর ব্যভিচারের দণ্ডাদেশ বিলম্বে কার্যকরের অনুমতি দিয়েছে। গর্ভবতী নারী ব্যভিচারের দণ্ডে দণ্ডিত হলে সন্তান জন্মদান ও দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত দণ্ড কার্যকর করা যাবে না।

---

[৩০৫] *বুখারি*, কিতাব : আত-তিব্ব, বাব : আল-কাহানাহ, হাদিস নং ৫৪২৬; *মুসলিম*, কিতাব : আল-কাসামাহ ওয়াল-মুহারিবুন ওয়াল-কিসাস ওয়াদ-দিয়াত, বাব : দিয়াতুল-জানিন, ওয়া উজুবুদ-দিয়াত ফি কাতলিল খাতা ওয়া শিবহিল আমাদ আলা আকিলাতিল জানি, হাদিস নং ১৬৮২; *আবু দাউদ*, কিতাব : আদ-দিয়াত, বাব : দিয়াতুল-জানিন, হাদিস নং ৪৫৬৮; *নাসায়ি*, হাদিস নং ৪৮২৫; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৬০১৬।

জন্মের পর ইসলাম সন্তানদের জন্য জন্ম-সময় ও পরবর্তী সময়ে পালনীয় কিছু বিধান দিয়েছে। একটি হলো সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দচিত্তে সুসংবাদ গ্রহণ করা। ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আলাইহিস সালামের জন্মের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যা বলেছেন তাতে অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়,

﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

যখন যাকারিয়া ইবাদতখানায় নামাযে দাঁড়িয়ে ছিল তখন ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বলল, আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রীবিরাগী এবং পুণ্যবান নবীদের মধ্যে একজন।[৩০৬]

এই সুসংবাদ ছেলে সন্তান ও মেয়ে সন্তান উভয়ের জন্য, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

সন্তানের জন্মকালীন আরেকটি বিধান হলো তার ডান কানে আজান এবং বাম কানে ইকামত দেওয়া। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণেই এ বিধান পালন করতে হবে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ইবনে আলি রা.-এর জন্মের সময় তার কানে আজান দিয়েছেন। তা উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ - بِالصَّلاَةِ»

ফাতিমা রা. যখন হাসান ইবনে আলিকে প্রসব করলেন তখন আমি দেখেছি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কানে নামাযের আজানের মতো আজান দিলেন।[৩০৭]

---

৩০৬. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৯।

৩০৭. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : আস-সাবিয়্যু ইয়ুলাদু ফাইয়ুআযযানু ফি উযুনিহি, হাদিস নং ৫১০৭।

সন্তানের জন্মকালীন আরেকটি অধিকার হলো তাকে খেজুর দ্বারা তাহনিক[৩০৮] করানো। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহনিক করেছেন। আবু মুসা আশআরি রা. বর্ণনা করেন,

«وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ»

আমার একটি ছেলে সন্তান হলো। আমি তাকে নিয়ে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহিম এবং তাকে একটি খেজুর দ্বারা তাহনিক করালেন। তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। তারপর তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।[৩০৯] (উল্লেখ্য, ইবরাহিম রা. ছিলেন আবু মুসা আল-আশআরি রা.-এর বড় ছেলে।)

শিশুর জন্মকালীন আরেকটি অধিকার হলো তার মাথার চুল মুণ্ডন করা এবং চুলের সমপরিমাণ রুপা সদকা করা। এতে স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক উপকারিতা রয়েছে। স্বাস্থ্যগত উপকারিতা : নবজাতকের মাথা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, তার দুর্বল চুলগুলো ফেলে দিয়ে এটা করা যায়। ফলে মাথায় শক্ত চুল গজিয়ে উঠবে। সামাজিক উপকারিতা : মুণ্ডিত চুলের সমপরিমাণ রুপা সদকা করলে সমাজের সদস্যদের সহযোগিতা করা হয়, দরিদ্র মানুষদের সুখী করা হয়। এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনুল হুসাইন থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

«وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً»

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা ফাতিমা রা. হাসান ও হুসাইন রা.-এর চুল ওজন করে সেই সমপরিমাণ রুপা সদকা করলেন।[৩১০]

---

৩০৮. খেজুর চিবিয়ে নরম করে নবজাতকের মুখে দেওয়া, যাতে কিছুটা তার পেটে প্রবেশ করে।

৩০৯. *বুখারি*, কিতাবুল আকিকা, বাব : তাসমিয়াতুল মাউলুদ হাদিস নং ৫০৪৫, *মুসলিম*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ইসতিহবাবু তাহনিকিল মাউলুদ, হাদিস নং ৩৯৯৭।

৩১০. মালিক, *মুআত্তা*, কিতাব : আল-আকিকাহ, বাব : মা জাআ ফিল-আকিকাহ, হাদিস নং ১৮৪০।

সন্তানদের জন্মের সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো ভালো নামে তাদের নামকরণ করা। মা-বাবার জন্য নবজাতকের সুন্দর নাম নির্বাচন করা আবশ্যক, যে নামে তাকে সবাই ডাকবে, চিনবে এবং অন্তরে শান্তি পাওয়া যাবে, মনে সুখ পাওয়া যাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'হারব' (যুদ্ধ) শব্দটি অপছন্দ করতেন, এ শব্দটি শুনতে চাইতেন না। একটি হাদিসে রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا: حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا: حَرْبٌ وَمُرَّةُ»

আল্লাহ তাআলার কাছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান নাম সর্বাধিক প্রিয়। (অর্থ ও বাস্তবতার দিক থেকে) হারিস ও হাম্মাম সর্বাধিক সত্য নাম এবং সবচেয়ে মন্দ নাম হারব ও মুররাহ।[৩১১]

আলি ইবনে আবু তালিব রা. বলেন,

«لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ. فَقُلْتُ : حَرْبًا فَقَالَ : بَلْ هُوَ حَسَنٌ. ثُمَّ وُلِدَ الْحُسَيْنُ فَسَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ. فَقُلْتُ : حَرْبًا قَالَ : بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ. فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أُرَاهُ فَقَالَ : أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ. قُلْتُ : حَرْبًا قَالَ : بَلْ هُوَ مُحَسِّنٌ. ثُمَّ قَالَ : سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُونَ شَبَّرٍ وَشَبِيرٍ وَمُشَبِّرٍ»

হাসানের জন্ম হলো। আমি তার নাম রাখলাম হারব। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। বললেন, আমার সন্তানকে (নাতিকে) দেখাও। তোমরা তার কী নাম রেখেছ? আমি বললাম, হারব। তিনি বললেন, বরং সে হাসান। পরে যখন

---

৩১১. আবু দাউদ, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ফি তাগরিরিল আসমা, হাদিস নং ৪৯৫০; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ৩৫৬৮; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৯০৫৪; বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৮১৪।

হুসাইনের জন্ম হলো, আমি তারও নাম রাখলাম হারব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন এবং বললেন, আমার সন্তানকে (নাতিকে) দেখাও। তোমরা তার কী নাম রেখেছ? আমি বললাম, হারব। তিনি বললেন, বরং সে হুসাইন। আমার তৃতীয় সন্তান হলে তারও নাম রাখলাম হারব। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে বললেন, আমার সন্তানকে (নাতিকে) দেখাও। তোমরা কী নাম রেখেছ তার? আমি বললাম, হারব। তিনি বললেন, বরং সে মুহাসসিন। তারপর বললেন, আমি তাদের হারুন আলাইহিস সালামের ছেলেদের নামে নাম রেখেছি : শাব্বার, শাবির ও মুশাব্বির।[৩১২]

সন্তানের জন্মের পর আকিকা করাও তার একটি অধিকার। তার অর্থ হলো নবজাতকের জন্মের সপ্তম দিনে তার নামে ছাগল জবাই করা। আকিকা করা সুন্নতে মুআক্কাদা। এটিও নবজাতককে পেয়ে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের একটি দিক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আকিকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

«لاَ أُحِبُّ الْعُقُوقَ، وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»

আমি নাফরমানি পছন্দ করি না। আর কারও সন্তান হলে সে যদি তার পক্ষ থেকে পশু জবাই করতে চায় তাহলে ছেলে সন্তানের পক্ষ থেকে দুটি পূর্ণবয়স্ক ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল জবাই করবে।[৩১৩]

জন্মের পর সন্তানের আরেকটি অধিকার হলো মাতৃদুগ্ধপানের অধিকার। শিশুর শারীরিক ও মানসিক গঠনে মাতৃদুগ্ধপানের সুদূরপ্রসারী প্রভাব

---

৩১২. *আহমাদ*, হাদিস নং ৭৬৯; *মুআত্তা মালিক*, হাদিস নং ৬৬০; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৬৯৫৮; *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ৪৭৭৩, তিনি বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ, যদিও ইমাম বুখারি ও মুসলিম তা সংকলন করেননি। যাহাবি তার বক্তব্য সমর্থন করেছেন। বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৮২৩; শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ হাসান।

৩১৩. *আবু দাউদ*, কিতাব : আদ-দাহায়া, বাব : আল-আকিকাহ, হাদিস নং ২৮৪৪; *আহমাদ*, হাদিস নং ৬৮২২; শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ৭৫৯২, তিনি বলেছেন, এই হাদিসের সনদ সহিহ, যদিও ইমাম বুখারি ও মুসলিম তা বর্ণনা করেননি। যাহাবি তার বক্তব্য সমর্থন করেছেন।

রয়েছে। মানবজীবনে এর সামাজিক প্রভাবও রয়েছে। ইসলামি শরিয়া মাতৃদুগ্ধপানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। মায়ের জন্য তার শিশুকে পূর্ণ দুই বছর বুকের দুধ পান করানো আবশ্যক। এটি শিশুর অন্যতম অধিকার বলে স্বীকৃত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

> মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু-বছর দুধ পান করাবে। (এ সময়কাল) তাদের জন্য, যারা দুধ পান করানোর মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা।[৩১৪]

আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে স্তন্যপানের দুই বছরের মেয়াদকাল শিশুর স্বাস্থ্যগত ও মনোগত উভয় দিক থেকে নিরাপদ ও সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত জরুরি।[৩১৫] তবে মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ মনোবিজ্ঞানী ও শিশু-প্রতিপালনবিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে মনোবিজ্ঞান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব গবেষণা হয়েছে এবং যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তার অপেক্ষা করেনি। বরং আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহই অগ্রগামী। আমরা দেখতে পাই, শরিয়ত মাতৃদুগ্ধপানের ব্যাপারে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে এবং একে শিশুর অন্যতম অধিকার সাব্যস্ত করেছে। তবে এই অধিকার কেবল মায়ের ওপর সীমাবদ্ধ নয়, পিতার কাঁধেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার রয়েছে। মাকে আবশ্যকভাবে খাদ্য ও বস্ত্র দানের মধ্য দিয়েই এই দায়িত্ব পালিত হয়। যাতে মা সন্তানের লালনপালন ও তাকে স্তন্যদানে ভাবনাহীন থাকতে পারেন। এভাবে মা-বাবার প্রত্যেকেই শরিয়তের নির্ধারিত কার্য-পরিমণ্ডলে থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। যত্ন ও সুরক্ষার মধ্য দিয়ে

---

৩১৪. সুরা বাকারা : আয়াত ২৩৩।

৩১৫. স্বাভাবিক স্তন্যপানের সময় কমপক্ষে ১২ মাস। তার চেয়ে ভালো হলো আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য-সংস্থা পূর্ণ দুই বছর স্তন্যপানের যে বিশেষ নির্দেশনাবলি প্রদান করেছে সেগুলো মান্য করা। দেখুন, হাসসান শামসি পাশা, الرضاعة من لبن الأم حولين كاملين, https://dvd4arab.maktoob.com/showtheread.php?t/60832-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ।

দুগ্ধপোষ্য শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত করবেন। মাতাপিতার সামর্থ্যের মধ্যেই এসব দায়িত্ব সম্পন্ন হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾

কারও ওপর তার সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না।[৩১৬]

মা-বাবার ওপর সন্তানদের আরেকটি অধিকার হলো তাদের লালনপালন ও ভরণপোষণ। শরিয়ত মাতাপিতার ওপর সন্তানদের যত্ন নেওয়া, তাদের জীবন ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষা দেওয়া ও তাদের ভরণপোষণ বহন করার বিষয়টিকে আবশ্যক করে দিয়েছে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং সে তার অধীনদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম (শাসক) একজন দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার অধীনদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার অধীনদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। খাদেম (কর্মচারী) তার মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।[৩১৭]

সন্তানদের আরেকটি অধিকার হলো শিষ্টাচার এবং জরুরি ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। সন্তানদের কার্যকরী শিক্ষাদান প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

৩১৬. সুরা বাকারা : আয়াত ২৩৩।

৩১৭. *বুখারি*, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, কিতাব : আল-ইত্ক, বাব : কারাহিয়াতুত-তাতাউল আলার-রাকিক, হাদিস নং ২৪১৬; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ইমারাহ, বাব : ফাদিলাতুল ইমামিল আদিল ওয়া উকুবাতুল জায়ির, হাদিস নং ১৮২৯।

«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»

তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়স হলে নামাযের নির্দেশ দাও, দশ বছর বয়স হলে নামাযের জন্য তাদের শাসন করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।[৩১৮]

আল্লাহ তাআলা আমাদের নিজেদের ও সন্তানদের কিয়ামতের দিন (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًاوقودها الناس والحجارة﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো জাহান্নামের আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।[৩১৯]

এর পাশাপাশি সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক যত্নও নিতে হবে। তাদের স্নেহ করা, দয়ামায়া দেখানো, তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করা এবং তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করা শারীরিক ও মানসিক যত্নের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ইবনে আলি রা.-কে চুমু খেলেন। সেখানে আকরা ইবনে হাবিস রা. উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমার দশটি সন্তান রয়েছে। আমি তাদের কাউকে কখনো চুমু খাইনি। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং বললেন,

«مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ»

যে মমতা দেখায় না তাকে মমতা দেখানো হয় না।[৩২০]

---

৩১৮. *আবু দাউদ*, কিতাব : আস-সালাত, বাব : ই'মারুল গুলাম বিস-সালাত, হাদিস নং ৪৯৫; *আহমাদ*, হাদিস নং ৬৬৮৯; *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ৭০৮।

৩১৯. সুরা তাহরিম : আয়াত ৬।

৩২০. *বুখারি*, কিতাব : রহমাতুল ওয়ালাদ ওয়া তাকবিলুহু ওয়া মুআনাকাতুহু, হাদিস নং ৫৬৫১; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ফাযায়িল, বাব : রহমাতুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিস-সিবয়ান ওয়াল-ইয়াল, হাদিস নং ২৩১৮।

শাদ্দাদ ইবনুল হাদ রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাতের কোনো এক নামাযের (মাগরিব বা এশার)[৩২১] সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁর কাঁধে ছিল হাসান রা. বা হুসাইন রা.। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিয়ে মসজিদে এলেন এবং মেঝেতে নামালেন। তারপর নামাযের জন্য তাকবির বললেন। নামাজ পড়তে শুরু করলেন। নামাযের মধ্যে একটি দীর্ঘ সিজদা দিলেন। (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সিজদা দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমি মাথা তুললাম এবং দেখলাম যে শিশুটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিঠের ওপর রয়েছে এবং তিনি সিজদায় রয়েছেন। আমি সিজদায় ফিরে গেলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষ করলেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি নামাযের মধ্যে একটি দীর্ঘ সিজদা দিয়েছেন, এমনকি আমরা ভেবেছি কোনো ঘটনা ঘটেছে বা আপনার প্রতি ওহি নাযিল করা হচ্ছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ»

তার কোনোটিই ঘটেনি, বরং আমার নাতি আমার পিঠের ওপর চড়ে বসে ছিল। আমি তাকে জোর করে নামিয়ে দিতে চাইনি, যতক্ষণ না তার প্রয়োজন পূরণ হয় (নিজেই নেমে যায়)।[৩২২]

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ»

আমি অনেক সময় নামাযে প্রবেশ করি এবং ইচ্ছা পোষণ করি যে নামাজ দীর্ঘ করব। কিন্তু যখনই শিশুর ক্রন্দন শুনি, আমার নামাজ

---

৩২১. অন্য বর্ণনায় আছে, দ্বিপ্রহরের কোনো নামাযের, তথা যোহর বা আসর নামাযের সময়।

৩২২. *নাসায়ি*, হাদিস নং ১১৪১; *আহমাদ*, হাদিস নং ২৭৬৮৮; *হাকিম*, হাদিস নং ৪৭৭৫; হাকিম হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন এবং যাহাবি তাকে সমর্থন করেছেন। *ইবনে খুযাইমা*, হাদিস নং ৯৩৬; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ২৮০৫।

> সংক্ষিপ্ত করি। কারণ, আমি জানি যে, শিশুর ক্রন্দনে তার মায়ের মনের উদ্বেগ বেড়ে যাচ্ছে।[৩২৩]

মেয়েদের সুন্দরভাবে লালনপালন করা ও তাদের যত্ন নেওয়ার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এমনকি যারা তাদের মেয়েদের সুন্দরভাবে লালনপালন করে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরাট প্রতিদান ও পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ»

> যে ব্যক্তি দুটি কন্যাকে তাদের প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত লালনপালন করবে, কিয়ামতের দিন সে আর আমি এভাবে উপস্থিত হব। তিনি তার আঙুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।[৩২৪]

বোঝা গেল যে, মা-বাবার ওপর সন্তানদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার রয়েছে। ইসলাম তাদের জন্য এসব অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মানবপ্রণীত যাবতীয় রীতিনীতি ও ব্যবস্থা এসব অধিকারের স্তর ও সামগ্রিকতাকে নির্দেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসলাম সন্তানসন্ততির জীবনের প্রতিটি ধাপকে গুরুত্ব দিয়েছে। ভ্রূণ অবস্থায়, মাতৃস্তন্য পানকালে, শিশু বয়সে ও বয়ঃসন্ধিকালে তাদের যত্ন নেওয়ার প্রতি বেশ গুরুত্বারোপ করেছে। যতক্ষণ না তারা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হয়ে ওঠে ততক্ষণ তাদের শারীরিক ও মানসিক যত্ন নিতে হবে। এমনকি ইসলাম তাদের প্রতি মায়ের গর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় আসার আগেও গুরুত্ব প্রদান করেছে। অর্থাৎ, সৎ ও চরিত্রবান মা ও বাবা নির্বাচনে উদ্বুদ্ধ করেছে। এর উদ্দেশ্য একটিই, মুসলিম সমাজের জন্য উত্তম নারী-পুরুষের বিস্তার, যে সমাজ পরিচালিত হয় নৈতিকতা ও উন্নত সভ্যতার মূল্যবোধ দ্বারা।

---

৩২৩. *বুখারি*, কিতাব : আল-জামাহ ওয়াল-ইমামাহ, বাব : মান আখাফফাস-সালাতা ইনদা বুকাইস সাবিয়্যি, হাদিস নং ৬৭৭; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৯৮৯; *ইবনে খুযাইমাহ*, হাদিস নং ১৬১০; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ২১৩৯; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ৩১৪৪; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ১১০৫৪।

৩২৪. *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : আল-ইহসান ইলাল বানাত, হাদিস নং ২৬৩১; *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৯১৪; *হাকিম*, হাদিস নং ৭৩৫০; বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৮৯৪।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩. মা-বাবা (ছোট পরিবার)

এখানে মা-বাবা বলতে স্বামী-স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে, আল্লাহ যাদের সন্তান দান করেছেন, যাদের বংশধর রয়েছে। যারা সন্তানদের জন্য অপরিসীম পরিশ্রম করেছেন, তাদের আরাম-আয়েশের জন্য অসংখ্য বিনিদ্র রাত যাপন করেছেন, তাদের হকসমূহ আদায় করেছেন এবং জীবনযাত্রার পথে তাদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা তৈরি করে দিয়েছেন।

ইসলাম সৌজন্যের প্রতিদান, সদাচারের কৃতজ্ঞতা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে অনুগ্রহস্বরূপ সন্তানদের ওপর পিতামাতার কিছু অধিকার সাব্যস্ত করেছে। বিশেষ করে যখন তারা বার্ধক্যে পৌঁছে যান এবং দুর্বল হয়ে পড়েন। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অনুগ্রহ, কোমল আচরণ ও সদ্ব্যবহার করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। ঠিক তেমনই, যেমন তারা তাদের সন্তানদের শিশুকালে লালনপালন করেছেন।

মা-বাবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো আনুগত্য, সদ্ব্যবহার ও উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিকার। আল্লাহ তাআলার পর সবচেয়ে বেশি সম্মান ও সদাচার পাওয়ার উপযুক্ত মা-বাবা ছাড়া কেউ নয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মা-বাবার সঙ্গে উত্তম আচরণ ও তাদের যত্ন-আত্তিকে তাঁর ইবাদত ও ইখলাসের সাথে পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

> তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে এবং মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের উফ[৩২৫] বলো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না, তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলো। তাদের সামনে ভালোবাসার সঙ্গে বিনয়াবনত হও এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক, তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা শৈশবকালে আমাকে লালনপালন করেছেন।[৩২৬]

মা-বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অবাধ্য হতে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি 'উফ' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করে তাদের অনুভূতিকে আহত করতেও নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এসব শব্দ তাদের প্রতি বিরক্তি-প্রকাশক। আল্লাহ তাআলা কখনোই ছোট ও নত হওয়ার প্রশংসা করেননি এবং কারও সামনে তাঁর বান্দাদের ছোট ও নত হওয়ার বিষয়টি তাঁর কাছে স্বীকৃত নয়, তবে মা-বাবার অবস্থান ভিন্ন। উপর্যুক্ত শেষ আয়াতে যা এসেছে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾

তাদের সামনে ভালোবাসার সঙ্গে বিনয়াবনত।[৩২৭]

মা-বাবা উভয়ে বা তাদের একজন যখন বার্ধক্যে পৌঁছে যান তখন উত্তম ব্যবহার ও সদাচারের বিষয়টি অবধারিতভাবে চলে আসে। কারণ, তখন তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, কখনো অক্ষমও হয়ে পড়েন। আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলতে, তাদের কোমলভাবে সম্বোধন করতে, তাদের ভালোবাসতে, তাদের প্রতি সদাচার করতে। একইসঙ্গে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দয়া প্রার্থনা করতে, যেমন তারা আমাদের শিশুকালে দুর্বলতার সময়ে আমাদের প্রতি দয়া করেছেন। তা ছাড়া মা-বাবাকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক বাক্য বেশি বেশি শোনাতে হবে। আল্লাহ তাআলা মা-বাবার প্রতি

---

[৩২৫]. বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক কোনো কথা।-অনুবাদক

[৩২৬]. সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ২৩-২৪।

[৩২৭]. সুরা ইসরা : আয়াত ২৪

কৃতজ্ঞতাকে তাঁর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾

আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।[৩২৮]

মা-বাবার প্রতি সদাচার কল্যাণের সবচেয়ে বড় দরজা। তা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

«سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ : الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيلِ اللهِ»

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে কোন আমল সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, সময়মতো নামাজ আদায় করা। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করা। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।[৩২৯]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বলেন,

«أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ. قَالَ: فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟

---

৩২৮. সুরা লুকমান : আয়াত ১৪।

৩২৯. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : আল-বির্রু ওয়াস-সিলাহ, হাদিস নং ৫৬২৫; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : বায়ানু কাওনিল ঈমান বিল্লাহি তাআলা আফদালুল আ'মাল, হাদিস নং ১৩৭।

قَالَ: نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا. قَالَ: فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا»

একজন লোক নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি আপনার হাতে হিজরত ও জিহাদের বাইআত হব। এতে আমি আল্লাহর কাছে পুরস্কার ও বিনিময় আশা করি। তিনি বললেন, তোমার মাতাপিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ, বরং তারা দুজনই জীবিত আছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহর কাছে বিনিময় আকাঙ্ক্ষা করছ? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তোমার মাতাপিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের দুজনের সঙ্গে সদাচারপূর্ণ জীবনযাপন করো।[৩৩০]

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে,

«فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»

তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করো।[৩৩১]

ইসলাম সন্তানদের ওপর মা-বাবার জন্য যেসব অধিকার বিধিবদ্ধ করেছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো যে, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে,

«أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِيْ مَالاً وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِيْ يَحْتَاجُ مَالِيْ. قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ»

একজন লোক নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার সম্পদ ও সন্তান রয়েছে এবং আমার বাবার আমার সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে (তিনি তা

---

৩৩০. *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : বিররুল ওয়ালিদাইন ওয়া আন্নাহুমা আহাক্কু বিহি, হাদিস নং ৬; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৫২৮; *নাসায়ি*, হাদিস নং ৪১৬৩; *আহমাদ*, হাদিস নং ৬৪৯০; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪১৯।

৩৩১. *বুখারি*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : আল-জিহাদ বি-ইযনিল আবাওয়াইন, হাদিস নং ২৮৪২; *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : বিররুল ওয়ালিদাইন ওয়া আন্নাহুমা আহাক্কু বিহি, হাদিস নং ২৫৪৯।

খরচ করতে চান)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য।[৩৩২]

আবু হাতিম ইবনে হিব্বান[৩৩৩] বলেন, এর অর্থ এই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে যে আচরণ করে তার পিতার সঙ্গে সেই আচরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। পিতার সঙ্গে কথায় ও কাজে সদাচার ও কোমলতা অবলম্বন করতে এবং প্রয়োজনে পিতার জন্য সম্পদ ব্যয় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি লোকটিকে বলেছেন, 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য।' তবে এর অর্থ এই নয় যে, পুত্রের জীবদ্দশায় তার সম্মতি ছাড়াই পিতা তার সম্পদের মালিক হয়ে যাবেন।[৩৩৪]

অসংখ্য হাদিস ও অগুনতি আসারে মা-বাবার সঙ্গে সদাচার ও সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে অবাধ্যাচরণ না করতে সতর্ক করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, জ্যোতির্ময় শরিয়ত সমাজের মৌলিক মূল্যবোধ সংরক্ষণে কতটা গুরুত্বারোপ করেছে, যাতে সেগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, বিনষ্ট না হয়।

---

৩৩২. *ইবনে মাজাহ*, কিতাব : আত-তিজারাত, বাব : মা লির-রাজুলি মিন মালি ওয়ালিদিহি, হাদিস নং ২২৯১; *আহমাদ*, হাদিস নং ৬৯০২; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪১০।

৩৩৩. আবু হাতিম : পূর্ণ নাম আবু হাতিম মুহাম্মাদ বিন হিব্বান বিন আহমাদ। (মৃ. ৩৫৪ হিজরি, ৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ) ইতিহাসবিদ, মহাপণ্ডিত, ভূগোলবিদ ও মুহাদ্দিস। জন্ম ও মৃত্যু সিজিস্তানের বুস্ত নগরীতে, তাই তাকে বুস্তি বলা হয়। আস-সুবকি, *তাবাকাত শাফিইয়্যাহ*। খ. ৩ পৃ. ১৩১।

৩৩৪. *সহিহ ইবনে হিব্বান*, খ. ২, পৃ. ১৪২।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ
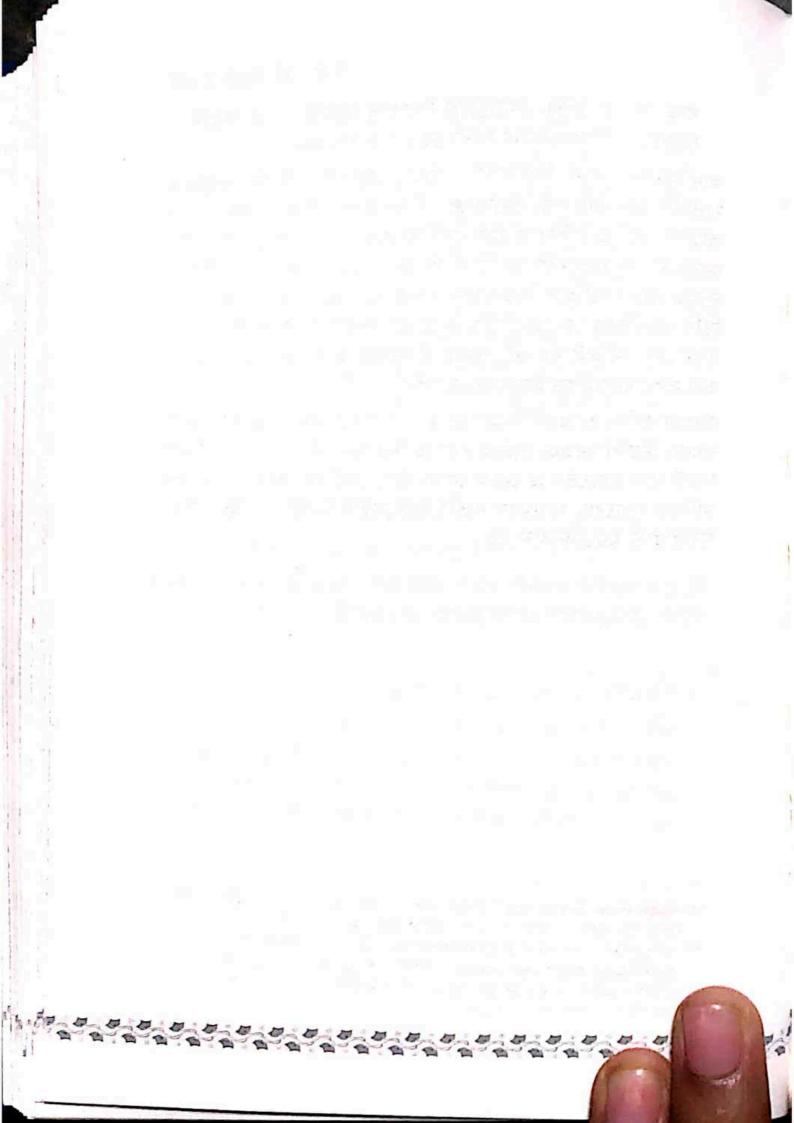
৪. আত্মীয়স্বজন (বড় পরিবার)

ইসলাম যা-কিছুর প্রবর্তন করেছে তার একটি মহত্ত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, এখানে পরিবারের ধারণা মা-বাবা ও সন্তানদের সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা এত বিস্তৃত যে তা ভাইবোন, চাচা-ফুফু ও মামা-খালা এবং পুত্রকন্যাসহ যত নিকটাত্মীয় আছে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। তারা সবাই এই পরিবারের সদস্য। তাদের সকলের সুসম্পর্ক ও সদাচারের অধিকার রয়েছে। ইসলাম আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং একে ফজিলত ও সওয়াবের একটি মৌলিক বিষয় বলে গণ্য করেছে। আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখলে অশেষ সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যেমন, যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের ভয়াবহ শাস্তির হুমকি দিয়েছে। কেউ আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখলে আল্লাহ তার সঙ্গে বন্ধন অটুট রাখেন এবং কেউ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

ইসলাম কিছু বিধান ও ব্যবস্থা নির্দেশ করেছে, যা এই বৃহৎ পরিবারের মধ্যে শক্তিশালী বন্ধন অব্যাহত থাকার বিষয়টিকে আবশ্যক করে। এই পরিবারে সবাই আত্মীয়স্বজন, তারা একে অপরের সমর্থন-সহযোগিতা করবে, একজন অপরজনের হাত ধরবে। ইসলামের নির্দেশিত ব্যবস্থার ফলে ভরণপোষণ, মিরাস, রক্তপণের দায়ভার বর্তায়। রক্তপণের দায় বলতে বোঝানো হয়েছে যে, ভুলবশত হত্যা এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারীর নিকটাত্মীয়দের ওপর দিয়াত বা রক্তপণের দায়ভার বণ্টিত হবে। (তারা সবাই মিলে রক্তপণ আদায় করবে।)[৩৩৫]

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ হলো এই সকল নিকটাত্মীয়ের প্রতি সদাচার করা এবং যতটুকু সম্ভব হয় তাদের জন্য কল্যাণ করা এবং তাদের থেকে অকল্যাণ ও ক্ষতি প্রতিহত করা। তাদের কাছে বেড়াতে

---

[৩৩৫]. ড. ইউসুফ আল-কারযাবি, *আল-ইসলাম হাদারাতুল-গাদ*, পৃ. ১৮৫।

যাওয়া, কুশল জিজ্ঞেস করা, ভালো-মন্দ অবস্থা জানতে চাওয়া, উপহার দেওয়া, দরিদ্র আত্মীয়দের দান-সদকা করা, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তারা দাওয়াত দিলে তা কবুল করা, তাদের মেহমানদারি করা, তাদের সম্মান করা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা, হাসি-আনন্দে তাদের সঙ্গে শরিক হওয়া, শোক ও যাতনায় তাদের সান্ত্বনা দেওয়া ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া যা-কিছু এই ছোট সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনকে বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করে তাও এর অন্তর্ভুক্ত।

এটা ব্যাপক কল্যাণের উৎস। এতে ইসলামি সমাজের ঐক্য ও বন্ধন দৃঢ় হয়, এই সমাজের সদস্যদের অন্তরসমূহ দয়া ও স্বস্তির অনুভূতিতে পূর্ণ হয়। মানুষ সর্বদা একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্ত থাকে। সে বিশ্বাস করে যে, তার আত্মীয়স্বজনরা ভালোবাসায় ও মমতায় তাকে ঘিরে আছে, প্রয়োজনে তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।

আল্লাহ তাআলা নিকটাত্মীয়দের প্রতি সদাচার ও অনুগ্রহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়, যাদের সঙ্গে বন্ধন অটুট রাখা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا﴾

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোনোকিছুকে তাঁর শরিক করবে না এবং পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গীসাথি, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।[৩৩৬]

আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীর সঙ্গে তাঁর (রহমতের) সম্পর্ককে আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণেই তিনি তাকে ধারাবাহিকভাবে অনুগ্রহ করেন, কল্যাণ দান করেন, তার ওপর নেয়ামত

---

৩৩৬. সুরা নিসা : আয়াত ৩৬।

বর্ষণ করেন। নিম্নবর্ণিত হাদিসে কুদসি থেকে তা-ই প্রমাণিত হয়। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«قَالَ اللهُ أَنَا الرَّحْمٰنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِيْ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ»

> আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি রহমান এবং তা হলো রহিম (আত্মীয়তার বন্ধন), আমি আমার নাম থেকে তার একটি নাম নিঃসৃত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবে আমি তার সঙ্গে আমার (রহমতের) সম্পর্ক অটুট রাখব এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তাকে আমার সম্পর্ক (রহমত) থেকে ছিন্ন করব।[৩৩৭]

যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে রিযিকের ব্যাপকতা ও বয়সের বরকত বৃদ্ধির সুসংবাদ দিয়েছেন। আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»

> যে ব্যক্তি তার জীবিকার প্রশস্ততা ও মরণে বিলম্বতা কামনা করে সে যেন তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখে।[৩৩৮]

আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই বৃদ্ধির অর্থ হলো বয়সে বরকত, বেশি বেশি আনুগত্যের সুযোগ, আখিরাতে উপকারী কাজের জন্য সময় ব্যয় এবং অনর্থক কাজে সময় নষ্ট না হওয়া।[৩৩৯]

অন্যদিকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে স্পষ্ট নস (কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বক্তব্য) এসেছে এবং একে

---

৩৩৭. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : আয-যাকাত, বাব : সিলাতুর-রাহিম, হাদিস নং ১৬৯৪; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৬৮০; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪৪৩; *হাকিম*, হাদিস নং ৭২৬৫। হাকিম বলেছেন, ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটি সহিহ, যদিও *বুখারি* ও *মুসলিমে* তা সংকলিত হয়নি।

৩৩৮. *বুখারি*, কিতাব : আল-বুয়ু, বাব : মান আহাব্বাল-বাসতা ফির-রিয্ক, হাদিস নং ১৯৬১ এবং কিতাব : আল-আদাব, বাব : মান বুসিতা লাহু ফির-রিযৃকি বি-সিলাতির-রাহিম, হাদিস নং ৫৬৩৯; *মুসলিম*, কিতাব : আল-বির্রু ওয়াস-সিলাতু ওয়াল-আদাব, বাব : সিলাতুর-রাহিম ও তাহরিমু কাতিআতিহা, হাদিস নং ২১।

৩৩৯. ইমাম নববি, *আল-মিনহাজ ফি শারহি সহিহি মুসলিম ইবনিল-হাজ্জাজ*, খ. ১৬, পৃ. ১১৪।

বিরাট পাপ গণ্য করা হয়েছে। কারণ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দ্বারা মানুষের মধ্যকার সম্পর্কই নষ্ট করে ফেলা হয়। শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন ভেঙে পড়ে। আল্লাহ তাআলা লানত বর্ষণ এবং চোখ ও অন্তর অন্ধ হয়ে পড়ার সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন,

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ﴾

তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকেই লানত করেন আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।[৩৪০]

জুবাইর ইবনে মুতয়িম রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ»

আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৩৪১]

আত্মীয়তা ছিন্ন করার অর্থ হলো আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা এবং তাদের সদাচার ও অনুগ্রহ না করা। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ যে কত বড় ও ভয়ংকর এ ব্যাপারে অনেক নস রয়েছে। এসবের মর্মার্থ হলো একটি সহযোগিতাপূর্ণ, সহানুভূতিশীল ও সহৃদয়তাপূর্ণ পারস্পরিক দৃঢ় সম্পর্কের সমাজ নির্মাণ করা। এই সমাজ কেমন হবে তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় ব্যক্ত হয়েছে,

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»

পারস্পরিক বন্ধুত্ব, সহানুভূতি ও দয়া-অনুগ্রহে মুমিনদের উদাহরণ হলো একটি দেহের মতো; যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর তার জন্য বিনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।[৩৪২]

---

৩৪০. সুরা মুহাম্মাদ : আয়াত ২২-২৩।
৩৪১. বুখারি : ৫৯৮৪, মুসলিম : ১৯।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমাজ

ইসলামি সমাজ বলতে একটি বড় পরিবারকে বোঝায়, যে পরিবার ভালোবাসা, যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং প্রেম ও দয়ার বন্ধনে আবদ্ধ। ইসলামি সমাজ আধ্যাত্মিকতা, মানবিকতা, নৈতিকতা ও ভারসাম্যপূর্ণ। এই সমাজের সদস্যরা উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির সঙ্গে সহাবস্থান করে এবং ইনসাফ ও পরামর্শের ভিত্তিতে পারস্পরিক কার্য সম্পাদন করে। ইসলামি সমাজে বড়রা ছোটদের স্নেহ করে, ধনীরা দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে, শক্তিমানেরা দুর্বলদের সাহায্য করে; বরং তা একটি দেহের মতো, তার কোনো একটি প্রত্যঙ্গ পীড়িত হলে গোটা দেহই পীড়িত বোধ করে; তা একটি অট্টালিকার মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে দৃঢ় রেখেছে।

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে ইসলামি সমাজের মৌলিক উপাদান ও স্তম্ভগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ : ভ্রাতৃত্ব
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : পারস্পরিক সহযোগিতা
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : সুবিচার ও ইনসাফ
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : দয়া

---

৩৪২. *বুখারি* : কিতাব : আল-আদাব, বাব : রহমাতুন নাসি ওয়াল-আজায়িমি, হাদিস নং ৫৬৬৫; *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : তারাহুমুল মুমিনিনা ওয়া তাআতুফুহুম ওয়া তাআদুদুহুম, হাদিস নং ২৫৮৬।
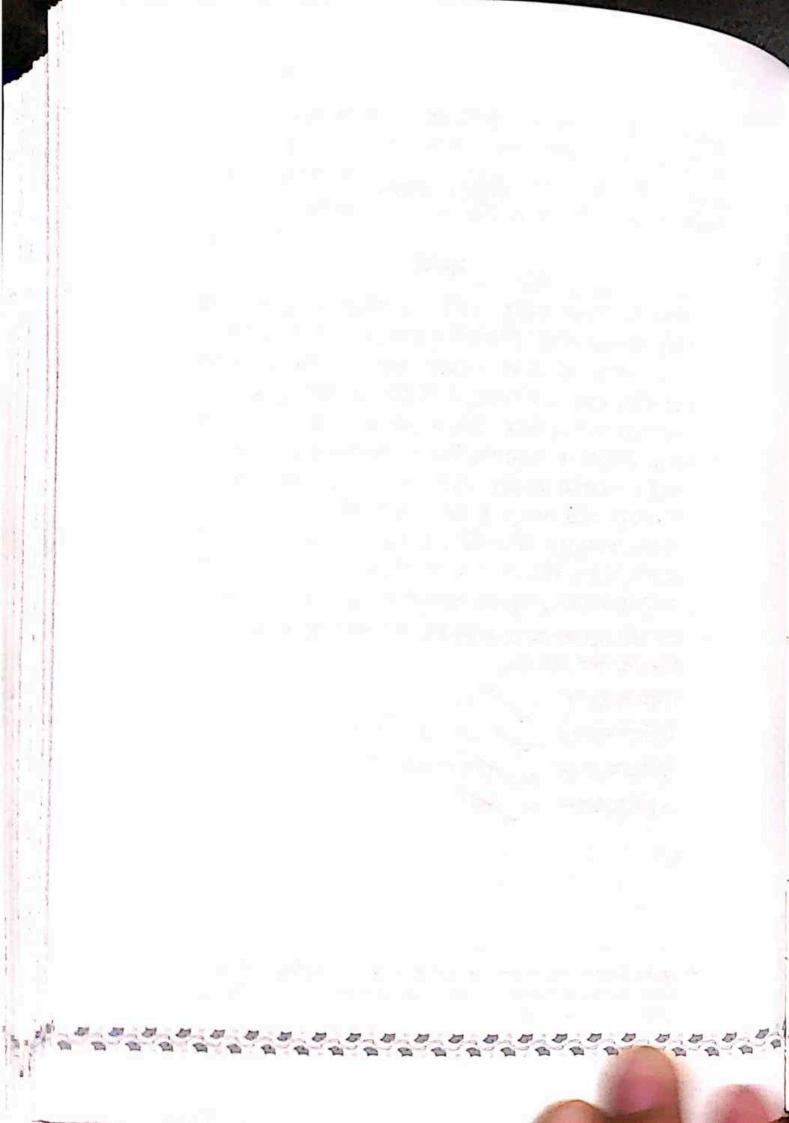
প্রথম অনুচ্ছেদ

ভ্রাতৃত্ব

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানের[৩৪৩] দপ্তরের উচ্চতর কর্মকর্তা (উপদেষ্টা) লি অ্যাটওয়াটার[৩৪৪] লাইফ ম্যাগাজিনের ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় বলেছেন,

> আমার অসুস্থতা আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছে যে, সমাজে যা অনুপস্থিত ছিল তা আমার মধ্যেও অনুপস্থিত ছিল : এতটুকু প্রেম ও ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ব।[৩৪৫]

ভ্রাতৃত্ব বা ভ্রাতৃবন্ধন শ্রেষ্ঠ মানবিক মূল্যবোধ। সমাজের অস্তিত্বের সুরক্ষার জন্য ইসলাম তার শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত করেছে। ভ্রাতৃত্ব সমাজকে একতাবদ্ধ ও সংহত রাখে। এই মূল্যবোধ কোনো সমাজে পাওয়া যায়নি, প্রাচীন সমাজেও নয়, আধুনিক সমাজেও নয়; অর্থাৎ, সমাজের মানুষেরা পারস্পরিক ভালোবাসায়, বন্ধনে, সাহায্য-সহযোগিতায় বসবাস করে; একই পরিবারের সন্তানদের মতো অনুভূতি তাদের একীভূত রাখে, যে পরিবারের এক অংশ অপর অংশকে ভালোবাসে, এক অংশ অপর অংশকে সংহত রাখে। তার প্রত্যেক সদস্য অনুভব করে যে, তার ভাইয়ের শক্তিই হলো তার শক্তি, তার ভাইয়ের দুর্বলতাই হলো তার দুর্বলতা এবং সে একাকী নগণ্য ও তার ভাইদের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৩৪৬]

ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধ দৃঢ়ীকরণ, তার অবস্থানের ওপর জোর দেওয়া ও মুসলিম সমাজ নির্মাণে তার প্রভাব প্রসঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলিল রয়েছে। যা-কিছু এই মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে তার প্রতি উৎসাহিত

---

৩৪৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪০তম রাষ্ট্রপতি (২০ জানুয়ারি ১৯৮১-২০ জানুয়ারি ১৯৮৯)।

৩৪৪. লি অ্যাটওয়াটার (১৯৫১-১৯৯১ খ্রি.) : আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টির রাজনৈতিক পরামর্শক ও কৌশলবিদ। প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান ও জর্জ এইচডব্লিউ বুশের রাজনৈতিক উপদেষ্টা।

৩৪৫. আবদুল হাই যালুম, *ইমবারাতুরিয়্যাতুশ-শাররিল-জাদিদাহ*, পৃ. ৩৯৭।

৩৪৬. ড. ইউসুফ আল-কারযাবি, *মালামিহুল-মুজতামাইল-মুসলিম আল্লাযি নুনশিদুহু*, পৃ. ১৩৮।

করা হয়েছে এবং যা-কিছু তা ক্ষুণ্ন করে তার থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ঈমানের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।[৩৪৭]

এখানে জাতিগত বা বর্ণগত বা বংশগত পার্থক্যকে বিবেচনায় আনা হয়নি। এই নীতির ভিত্তিতেই সালমান ফারসি রা., বিলাল হাবশি রা. সুহাইব রুমি রা. তাদের আরব ভাইদের সঙ্গে একত্র হয়েছেন ও বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন।

পবিত্র কুরআন এই ভ্রাতৃত্বকে আল্লাহর অন্যতম নেয়ামত বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾

তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।[৩৪৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মদিনায় হিজরতের পর—যখন মুসলিম সমাজের সূচনা হলো—মসজিদ নির্মাণের পরপরই সরাসরি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন শুরু করলেন। কুরআনুল কারিম এই ভ্রাতৃত্বকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে, যা ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

---

৩৪৭. সুরা হুজুরাত : আয়াত ১০।

৩৪৮. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১০৩।

আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।[৩৪৯]

এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনের ফলে ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের যেসব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছে তার একটি চিত্র তুলে ধরছি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, এক আনসারি ভাই তার মুহাজির ভাইয়ের জন্য তার অর্ধেক সম্পত্তি এবং দুই স্ত্রীর একজনকে তালাকের পর বিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন! এই ঘটনা আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

«قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ...»

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. যখন মদিনায় আগমন করলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ও সাদ ইবনে রবি আল-আনসারি রা.-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিলেন। সাদ রা. তার সম্পত্তি ভাগ করে অর্ধেক সম্পত্তি এবং দুজন স্ত্রীর একজনকে (তালাক দেওয়ার পর) নিয়ে যাওয়ার জন্য আবদুর রহমানকে অনুরোধ জানালেন। জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবারবর্গ ও ধনসম্পদে বরকত দান করুন। আমাকে স্থানীয় বাজারের রাস্তাটি দেখিয়ে দিন...।[৩৫০]

সমাজ-কাঠামোকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রাখার ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। তাই আল্লাহ তাআলা ইসলামি ভ্রাতৃত্বকে ক্ষুণ্ন করে বা

---

৩৪৯. সুরা হাশর : আয়াত ৯।

৩৫০. *বুখারি*, কিতাব : ফাযায়িলুস সাহাবা, বাব : কাইফা আখান-নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইনা আসহাবিহি, হাদিস নং ৩৭২২; *সুনানে তিরমিযি*, হাদিস নং ১৯৩৩; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ৩৩৮৮; *আহমাদ*, হাদিস নং ১২৯৯৯।

ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন সব কাজের ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾

হে মুমিনগণ, কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।[৩৫১]

একইভাবে আল্লাহ তাআলা দোষারোপ, নিন্দা ও বংশগৌরব ফলানো নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না, ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তওবা না করে তারাই জালিম।[৩৫২]

আল্লাহ তাআলা গিবত, পরচর্চা, কুধারণাও নিষিদ্ধ করেছেন। এসব কর্মকাণ্ড সমাজকে ধসিয়ে দেওয়ার নিকৃষ্ট কার্যকারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾

---

৩৫১. সুরা হুজুরাত : আয়াত ১১।
৩৫২. সুরা হুজুরাত : আয়াত ১১।

হে মুমিনগণ, তোমরা নানারকম অনুমান থেকে দূরে থাকো, কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।[৩৫৩]

ঝগড়াঝাঁটি হয়ে গেলে, কলহবিবাদ লেগে গেলে ইসলাম যা-কিছু চিত্তের বন্ধন অটুট রাখে এবং ঐক্যের ভিত্তিকে সংহত রাখে তার প্রতি উৎসাহিত করেছে এবং এ কারণে বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করতে আহ্বান জানিয়েছে। সদ্ভাব বজায় রাখার গুরুত্ব বোঝাতে এবং এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا بَلَى.
قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ»

আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দেবো না, যার মর্যাদা রোযা, সদকা এবং নামায থেকে উত্তম? আমরা বললাম, হ্যাঁ, বলুন। তিনি বললেন, বিবদমানদের মধ্যে আপস করিয়ে দেওয়া। পক্ষান্তরে নিজেদের মধ্যে বিবাদ ধ্বংসাত্মক (কল্যাণমূলক কাজসমূহ ধ্বংস করে দেয়)।[৩৫৪]

এমনকি ইসলাম বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে আপস করার জন্য বানিয়ে কথা বলার বৈধতা দিয়েছে। কারণ তা ইসলামি সমাজকাঠামো ভেঙে পড়ার উপক্রম হলে তা রোধ করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا»

---

৩৫৩. সুরা হুজুরাত : আয়াত ১২।

৩৫৪. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ইসলাহ যাতিল-বাইন, হাদিস নং ৪৯১৯; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৫০৯; *আহমাদ*, হাদিস নং ২৭৫৪৮, শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫০৯২।

যে ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দেয় সে মিথ্যাবাদী নয়। বস্তুত সে ভালো কথা বলে এবং উত্তম কথাই আদান-প্রদান করে।[৩৫৫]

তা ছাড়া ইসলাম ভ্রাতৃত্বসুলভ সকল অধিকার ও দায়দায়িত্ব আরোপ করেছে। ভ্রাতৃত্ববন্ধনের দাবি অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলিম এগুলো মান্য করবে। ঋণ মনে করে এসব বিষয়ের দায়িত্ব নেবে, যার জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং তার কাছে আমানত হিসেবে বিবেচিত হবে, যা আদায় করা জরুরি। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব বিষয় ব্যাখ্যা করে বলেন,

«لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»

তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি করো না, পরস্পর শত্রুতা করো না, একে অন্যের পেছনে লেগো না, একজনের কেনা-বেচার ওপর আরেকজন কেনা-বেচা করো না। বরং তোমরা এক আল্লাহর বান্দা ও ভাই ভাই হয়ে থাকো। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, কাজেই তার ওপর জুলুম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে হেয় মনে করবে না। আল্লাহভীতি এখানে—এ কথা বলে তিনি তিনবার নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি আরও বলেন, কোনো ব্যক্তির মন্দ কাজ করার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে নিজের কোনো মুসলিম

---

৩৫৫. *বুখারি*, কিতাব : আস-সুলহ, বাব : লাইসাল কাযযাবুল-লাযি ইয়ুসলিহু বাইনান-নাস, হাদিস নং ২৫৪৬। *মুসলিম*, হাদিস নং ২৬০৫।

ভাইকে হেয় মনে করে। বস্তুত প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য হারাম। অর্থাৎ, তার জানমাল ও ইজ্জত-আবরু।[৩৫৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'তাকে লজ্জিত করবে না' কথাটির ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেছেন, লজ্জিত করার অর্থ তাকে সাহায্য না করা, তার প্রতি সহযোগিতার হাত না বাড়ানো। অর্থাৎ, জুলুম বা জালিমকে প্রতিহত করার জন্য সাহায্য চাইলে তাকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে, সম্ভব হলে এবং তার কোনো শরয়ি ওজর না থাকলে।[৩৫৭]

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ»

তোমার ভাইকে সাহায্য করো জালিম অবস্থায় অথবা মাজলুম অবস্থায়। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, সে যখন জুলুমের শিকার হয় তখন তাকে সাহায্য করতে পারব, কিন্তু সে যদি নিজেই জুলুমকারী হয়ে থাকে তাহলে তাকে কীভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তাকে জুলুম থেকে বাধা দেবে বা বিরত রাখবে, এটাই তাকে সাহায্য করা।[৩৫৮]

আমরা কি এমন মানবসমাজ দেখতে পাই যা তার প্রত্যেক সদস্যকে তার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য বাধ্য করতে সক্ষম, যে তার ভাইকে সাহায্য করবে মাজলুম অবস্থায় এবং জালিম হলে তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে?!

---

৩৫৬. *মুসলিম*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আস-সিলাতু ওয়াল-আদাব, বাব : তাহরিমু যুলমিল-মুসলিম ওয়া খাযলুহু ওয়া ইহতিকারুহু ওয়া দামুহু ওয়া ইরদুহু ওয়া মালুহু, হাদিস নং ২৫৬৪; *আহমাদ*, হাদিস নং ৭৭১৩; বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১১৮৩০।

৩৫৭. নববি, *আল-মিনহাজ ফি শারহি সহিহি মুসলিম ইবনে আল-হাজ্জাজ*, খ. ১৬, পৃ. ১২০।

৩৫৮. *বুখারি*, কিতাব : আল-ইকরাহ, বাব : ইয়ামিনুর-রাজুলি লি-সাহিবিহি আন্নাহু আখুহু ইযা খাফা আলাইহিল-কাত্‌লা আও নাহওয়াহু, হাদিস নং ৬৫৫২; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২২৫৫; *আহমাদ*, হাদিস নং ১১৯৬৭; *দারেমি*, হাদিস নং ২৭৫৩।

এই অবস্থা পাওয়া যাবে কেবল ইসলামি সমাজে। কারণ এখানে রয়েছে উন্নত ভ্রাতৃত্ববন্ধন এবং বোধ ও অনুভূতির ঐক্য। ইসলামি সমাজের প্রত্যেক সদস্য তার ভাইয়ের বিপদ দূর করে ও সংকট-সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং সাহায্য ও সহযোগিতার অবস্থানে থাকে, হিংসাত্মক ও শত্রুতামূলক অবস্থানে থাকে না। তারা সবসময় ইতিবাচক মনোভাব ধারণ করে। এভাবেই ভ্রাতৃত্ববন্ধন ইসলামি সমাজের কাঠামো ও সংহতির ভিত্তিরূপে রয়েছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

পারস্পরিক সহযোগিতা

শরিয়ত তার অনুসারীদের ওপর আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সাহায্য-সমর্থন আবশ্যক করে দিয়েছে। দৈনন্দিন প্রয়োজন ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে সহযোগিতার কথা তো বলাই বাহুল্য। এ কারণে এই দ্বীনের কল্যাণে তারা একটি মজবুত অট্টালিকার মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। আবু মুসা আশআরি রা. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন,

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»

একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য গৃহ-কাঠামোর মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় রাখে।[৩৫৯]

অথবা, মুসলিম উম্মাহ একটি দেহের মতো, তার এক অঙ্গ অসুস্থ হলে দেহের সব অঙ্গই জ্বর ও অনিদ্রায় ভোগে হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»

পারস্পরিক বন্ধুত্ব, সহানুভূতি ও দয়া-অনুগ্রহে মুমিনদের উদাহরণ হলো একটি দেহের মতো। যখন দেহের কোনো অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর তার জন্য বিনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।[৩৬০]

---

৩৫৯. *বুখারি* : কিতাব : আল-আদাব, বাব : তাআউনুল মুমিনিনা বা'দুহুম বা'দা, হাদিস নং ৫৬৮০; *মুসলিম*, কিতাব : আল-বির্‌রু ওয়াস-সিলাহ, বাব : তারাহুমুল মুমিনিনা ওয়া তাআতুফুহুম ওয়া তাআদুদুহুম, হাদিস নং ২৫৮৫।

এ কারণে ইসলামে সামাজিক সহযোগিতা কেবল বৈষয়িক উপকারিতাতেই সীমাবদ্ধ নয়। যদিও তা ইসলামে একটি মৌলিক স্তম্ভ, বরং এই সহযোগিতা সমাজের যাবতীয় প্রয়োজনে ব্যাপ্ত। চাই তা ব্যক্তির ক্ষেত্রে বা দলবদ্ধ মানুষের ক্ষেত্রে হোক, চাই সে প্রয়োজন বৈষয়িক হোক বা মানসিক অথবা চিন্তাগত হোক। সহযোগিতার এসব ক্ষেত্র যতটা বিস্তৃত ততটাই এর অন্তর্ভুক্ত। এভাবে তা উম্মাহর অভ্যন্তরে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর যাবতীয় মৌলিক অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ইসলামের সব শিক্ষাই মুসলিমদের মধ্যে সামগ্রিক অর্থে পারস্পরিক সহযোগিতাকে জোরদার করেছে। আপনি দেখবেন যে, ইসলামি সমাজে স্বাতন্ত্র্য, আমিত্ব ও নেতিবাচকতা বলতে কিছু নেই; বরং ইসলামি সমাজে সর্বদাই রয়েছে সত্য ভ্রাতৃত্ব, উত্তম দান এবং কল্যাণ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা।[৩৬১]

ইসলামে সামাজিক সহযোগিতা কেবল মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে যুক্ত মুসলিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ধর্ম, গোত্র, বিশ্বাস নির্বিশেষে ইসলামি সমাজে বসবাসকারী সকলের জন্য পরিব্যাপ্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।[৩৬২]

---

[৩৬০]. *বুখারি* : কিতাব : আল-আদাব, বাব : রহমাতুন-নাসি ওয়াল-আজায়িমি, হাদিস নং ৫৬৬৫; *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : তারাহুমুল মুমিনিনা ওয়া তাআতুফুহুম ওয়া তাআদুদুহুম, হাদিস নং ৬৫।

[৩৬১]. মুহাম্মাদ আদ-দাসুকি, *আল-ওয়াকফু ওইয়া দাওরুহু ফি তানমিয়াল মুজতামাল ইসলামি, সিলসিলা কাদায়া ইসলামিয়্যা*, সংখ্যা ৪৬, *আল-মাজলিসুল আ'লা লিশ-শুয়ুনিল ইসলামিয়্যা*, প্রথম অংশ, পৃ. ৫।

[৩৬২]. সুরা মুমতাহিনা : আয়াত ৮।

পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি হলো মানুষের সম্মান ও মর্যাদা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

আর নিঃসন্দেহে আমি আদমসন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদের আমি উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি অনেকের ওপর আমি তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।[৩৬৩]

ইসলামি সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে যত ব্যাপকার্থক আয়াত রয়েছে তার অন্যতম হলো এ আয়াতটি,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। এবং আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।[৩৬৪]

ইমাম কুরতুবি বলেছেন, সৎকর্ম ও তাকওয়ায় পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশ সৃষ্টিজগতের সকলের জন্য। অর্থাৎ, তাদের একে অপরকে সাহায্য করবে।[৩৬৫]

আল-মাওয়ারদি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সৎকাজে সহযোগিতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং একে তার তাকওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। কারণ, তাকওয়ায় রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সৎকাজে রয়েছে মানুষের সন্তুষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানুষের সন্তুষ্টি একত্রে অর্জন

---

৩৬৩. সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৭০।

৩৬৪. সুরা মায়িদা : আয়াত ২।

৩৬৫. *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৬, পৃ. ৪৬-৪৭।

করল তার জন্য সৌভাগ্য পূর্ণতা পেল এবং তার নেয়ামতসমূহ ব্যাপক হলো।[৩৬৬]

আল-কুরআনুল কারিম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, ধনীদের সম্পদে মুখাপেক্ষীদের জন্য নির্ধারিত হক রয়েছে, তা তাদের দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

আর যাদের অর্থ-সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে ভিখিরি ও বঞ্চিতের।[৩৬৭]

শরিয়ত-প্রবর্তক নিজেই এই হকের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। ধনাঢ্যদের বদান্যতা, অনুগ্রহকারীদের করুণা এবং তাদের অন্তরে যে দয়া, তাদের হৃদয়ে সৎকাজ ও পরোপকারের যে আগ্রহ ও কল্যাণকর কাজের যে প্রেম রয়েছে তার জন্য তা বাদ দেননি।[৩৬৮]

কারা এই হকদার-মুখাপেক্ষী তাদের আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কুরআনের আয়াতে,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

সদকা (যাকাত) তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের[৩৬৯] জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য[৩৭০], দাসমুক্তির জন্য, ঋণ-ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর

---

৩৬৬. আনবুল দুনিয়া ওয়াদ-দীন, পৃ. ১৯৬-১৯৭।

৩৬৭. সুরা মাআরিজ : আয়াত ২৪-২৫।

৩৬৮. হুসাইন হামেদ হাসসান : আত-তাকাফুলুল ইজতেমাই ফিশশারিআতিল ইসলামিয়্যা, পৃ. ৮।

৩৬৯. যাকাতের অর্থ সংগ্রহ ও বিতরণে নিয়োজিত কর্মচারী।-সম্পাদক

৩৭০. যে অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের আশা আছে, তার মন জয় করার জন্য তাকে অথবা যে মুসলিমকে কিছু দান করলে ইসলামের প্রতি তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হওয়ার আশা আছে

পথে ও মুসাফিরদের জন্য[৩৭১] তা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৩৭২]

এই আয়াত থেকে যাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। কারণ, যাকাতের খাতসমূহে সমাজের অধিকাংশ সদস্যই অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া সহযোগিতা ও সাহায্য-সমর্থনের দিকটি সামলানোর জন্য এটি প্রধান মৌলিক উৎস। যাকাত ইসলামের ফরজগুলোর মধ্যে তৃতীয় ফরজ (ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের তৃতীয় স্তম্ভ)। কেউ যাকাত অস্বীকার করলে তার ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়। যাকাত তার মালিকের (প্রদানকারীর) চিত্তকে পরিচ্ছন্ন করে এবং আত্মাকে পবিত্র করে। যাকাত যাদের দেওয়া হয় তাদের উপকারের চেয়ে আদায়কারীর উপকারই আগে করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾

তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।[৩৭৩]

কোনো সন্দেহ নেই যে, যিনি যাকাত দেন তা তার অন্তর থেকে কৃপণতা, লোভ, কুক্ষিগত করে রাখার মনোভাব ইত্যাদি দূরীভূত করে দেয়। একইভাবে তা দরিদ্র, মুখাপেক্ষী ও যাকাতের হকদারের অন্তর থেকে হিংসা, বিদ্বেষ এবং ধনিক শ্রেণি ও সম্পদশালীদের প্রতি যে ঘৃণা তা দূর করে দেয়। ফলে যে সমাজে এই মহান ফরজটি আদায় করা হয় সেখানে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা, ভালোবাসা, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও দয়া-মমতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

শরিয়ত রাষ্ট্র-প্রধানকে ধনীদের থেকে দরিদ্রদের চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। প্রত্যেকের থেকে তার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করা হবে। মুসলিম সমাজে এ ব্যাপারটি জায়েয নেই যে, কিছু মানুষ ভরা-পেটে তৃপ্ত হয়ে রাত কাটাবে এবং তাদেরই পাশে তাদের প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকবে। সামগ্রিকতার বিবেচনায় সমাজের ওপর

তাকে যাকাত থেকে দেওয়া যায়, ইসলাম শক্তিশালী হওয়ার কারণে বিধানটি বর্তমানে রহিত।-অনুবাদক

৩৭১. সফরে থাকাকালে কোনো অবস্থায় অভাবগ্রস্ত হলে।-অনুবাদক

৩৭২. সুরা তাওবা : আয়াত ৬০।

৩৭৩. সুরা তাওবা : আয়াত ১০৩।

এটা আবশ্যক যে, ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে তাদের একে অপরকে সাহায্য করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ»

> ওই লোক আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি যে পেট ভরে খেয়ে রাত যাপন করল, অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত এবং সে তা জানে।[৩৭৪]

ইমাম ইবনে হায্ম এ ব্যাপারে বলেছেন, প্রত্যেক দেশের ধনীদের জন্য ফরজ (আবশ্যক) হলো দরিদ্রের (ভরণপোষণের) দায়িত্ব গ্রহণ করা। শাসক তাদের তা করতে বাধ্য করবেন। যদি যাকাত তাদের জন্য পর্যাপ্ত না হয়।[৩৭৫] ...তখন তাদের জন্য আবশ্যক খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে, শীতের পোশাক এবং অনুরূপ গ্রীষ্মের পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ঝড়বাদল, রোদ-তাপ ও যাতায়াতকারীদের দৃষ্টি থেকে হেফাজতকারী বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।[৩৭৬]

বৈষয়িক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজনগ্রস্তদের ন্যূনতম প্রয়োজন সুন্দরভাবে পূরণ করে দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাদের যথেষ্ট পরিমাণ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর বক্তব্য থেকে এ মর্মার্থই প্রকাশ পায়। তিনি বলেছেন,

«كَرِّرُوْا عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ، وَإِنْ رَاحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ»

> তোমরা তাদের বারবার সদকা দাও, এমনকি তাদের একেকজন একশটি করে উট পেলেও।[৩৭৭]

অসংখ্য হাদিসে নববি মুসলিম সমাজের তাকাফুল বা পারস্পরিক সহযোগিতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।

---

৩৭৪. *মুসতাদরাকে হাকেম*, কিতাব : আল-বির্‌রু ওয়াস-সিলাহ, হাদিস নং ৭৩০৭। তিনি বলেছেন, এই হাদিসের সনদগুলো সহিহ, যদিও *বুখারি* ও *মুসলিমে* তা সংকলিত হয়নি। তাকে ইমাম যাহাবি সমর্থন করেছেন। তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ৭৫০, উদ্ধৃত বাক্য এই কিতাবের। বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৩২৩৮।

৩৭৫. ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের জন্য যাকাতের বাইরেও হক রয়েছে।

৩৭৬. *আল-মুহাল্লা*, খ. ৬, পৃ. ৪৫২, মাসআলা নং ৭২৫।

৩৭৭. প্রাগুক্ত।

ইসলামে এর গুরুত্ব কতটুকু সে ব্যাপারে একটি হাদিস, আবু মুসা আশআরি রা. বর্ণনা করেছেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ»

আশআরি গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা মদিনাতেই তাদের পরিবার-পরিজনদের খাবার কমে যায়, তারা তাদের যা-কিছু সম্বল থাকে তা একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে মেপে তা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। কাজেই তারা আমার এবং আমি তাদের।[৩৭৮]

ইবনে হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারি*তে বলেছেন, অর্থাৎ তারা আমার সঙ্গেই সম্পৃক্ত হবে।[৩৭৯] এটা যেকোনো মুসলিমের জন্য চূড়ান্ত সম্মান।

অনুরূপ আরেকটি হাদিস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

মুসলিম মুসলিম ভাই ভাই, সে তার ওপর জুলুম করবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাবে সাহায্য করবে, আল্লাহ তাআলা তার অভাবে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের কোনো একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি

---

৩৭৮. *বুখারি*, কিতাব : আশ-শিরকাহ, বাব : আশ-শিরকাহ ফিত-তাআম, ওয়ান-নাহদ ওয়াল-উরূদ, হাদিস নং ২৩৫৪; *মুসলিম*, কিতাব : ফাযায়িলুস সাহাবা, বাব : ফাযায়িলুল আশআরিয়্যিন, হাদিস নং ২৫০০।

৩৭৯. *ফাতহুল বারি*, খ. ৫, পৃ. ১৩০।

ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ-ক্রটি ঢেকে রাখবেন।[৩৮০]

ইমাম নববি বলেছেন, উপর্যুক্ত হাদিসে মুসলিমকে সাহায্য করা, তার সংকট দূর করা ও তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখার মাহাত্ম্য ও ফজিলত প্রকাশ পেয়েছে। কেউ সম্পদ দিয়ে বা সামর্থ্য দিয়ে বা সহযোগিতা দিয়ে সংকট দূর করলে সে সংকট থেকে উদ্ধারকারী ও আপদে সাহায্যকারী বিবেচিত হবে। আর এটা প্রকাশ থাকে যে, কেউ বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে, মতামত জানিয়ে সংকটে ও আপদে সাহায্য করলেও অনুরূপ সাহায্যকারী গণ্য হবে।[৩৮১] এটাই মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মর্মার্থ।

অর্থাৎ, জাতির ব্যক্তিমণ্ডলী তাদের দল ও গোষ্ঠীর সহযোগিতায় থাকবে। প্রত্যেক সামর্থ্যবান ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি সমাজে কল্যাণকর কাজের জিম্মাদার হবে। সমাজের মানবিক শক্তিগুলো ব্যক্তির কল্যাণ সংরক্ষণে ও ক্ষতি প্রতিহতকরণে সক্রিয় থাকবে এবং সমাজ-গঠন ও একে নিরাপদ ভিত্তিসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমস্যা ও জটিলতা প্রতিহত করবে।[৩৮২]

অর্থাৎ, জনমণ্ডলী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে এবং প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের দৃঢ় বন্ধনে একে অপরের সঙ্গে থাকবে।[৩৮৩]

তা ছাড়া নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখাপেক্ষীদের সাহায্য করার এবং আমরা যে সমাজে বাস করি তার সদস্যদের প্রতি দায়িত্বশীলতার অনুভূতিকে নিজের ওপর সদকা বলে গণ্য করেছেন। আবু যর রা. থেকে বর্ণিত,

«عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ.
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ أَتَصَدَّقُ وَلَيْسَ لَنَا أَمْوَالٌ؟ قَالَ: لِأَنَّ مِنْ

---

৩৮০. *বুখারি*, কিতাব : আল-মাযালিম, বাব : লা ইয়াযলিমুল মুসলিমু আল-মুসলিম ওয়া লা ইয়ুসলিমুহু, হাদিস নং ২৩১০; *মুসলিম*, কিতাব : আল-বির্‌রু ওয়াস-সিলাতি ওয়াল-আদাব, বাব : তাহরিমুয-যুলম, হাদিস নং ২৫৮০।

৩৮১. আল-মিনহাজ, *শারহু সহিহ মুসলিম*, খ. ১৬, পৃ. ১৩৫।

৩৮২. মুহাম্মাদ আবু যাহরাহ, *আত-তাকাফুলুল-ইজতিমায়ি ফিল-ইসলাম*, পৃ. ৭।

৩৮৩. আবদুল আল আহমাদ আবদুল আল, *আত-তাকাফুলুল-ইজতিমায়ি ফিল-ইসলাম*, পৃ. ১৩।

أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ ... وَتَهْدِي الْأَعْمَى وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، كُلُّ ذٰلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ...»

সূর্য উদিত হয় এমন প্রত্যেক দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর তার নিজের জানের সদকা রয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি কোথা থেকে সদকা করব, আমাদের তো সম্পদ নেই? তিনি বললেন, কেননা, সদকার প্রকারসমূহের মধ্যে এগুলোও রয়েছে ... তুমি অন্ধকে পথ দেখিয়ে দেবে, বধির ও বোবাকে শুনিয়ে দেবে (কথাবার্তা বুঝিয়ে দেবে) যাতে সে বুঝতে পারে, কেউ তার প্রয়োজনে নির্দেশনা চাইলে তুমি তাকে পথ দেখিয়ে দেবে যা তোমার জানা আছে, সাহায্যপ্রার্থী আর্তমানবের সাহায্যে দৌড়ে যাবে, তোমার দুই হাত লাগিয়ে দুর্বলকে সাহায্য করবে—এগুলোর প্রত্যেকটি তোমার পক্ষ থেকে তোমার জানের ওপর সদকা।[৩৮৪]

এ সকল মূল্যবোধ শ্রেষ্ঠ সভ্যতার আলামত বলে বিবেচিত। ইসলাম এই ক্ষেত্রে যাবতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও মতাদর্শ থেকে অগ্রগামী; কারণ, অন্যরা এসব কাজের প্রতি অনেক পরে গুরুত্ব দিয়েছে। তা না হলে কে কবে অন্ধকে পথ দেখিয়ে দেওয়া এবং বধির ও বোবাকে কথা শোনানোর কথা শুনেছে?!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের প্রয়োজন পূরণে সামর্থ্যবানদের শৈথিল্য প্রদর্শনের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আমর ইবনে মুররা রা. মুআবিয়া রা.-কে বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ»

---

৩৮৪. *আহমাদ*, হাদিস নং ২১৫২২, শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। ইবনে *হিব্বান*, হাদিস নং ৩৩৭৭; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৭৬১৮; নাসায়ি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ৯০২৭।

যেকোনো নেতা (রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত) মুখাপেক্ষী ও অভাব-অনটনগ্রস্ত লোকদের মুখের ওপর তার দরজা বন্ধ করে রাখে (তার কাছে আসতে বাধা প্রধান করে), আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন ও অভাব-অনটনের সময় আসমানের দরজাসমূহ বন্ধ করে রাখবেন।[৩৮৫]

বর্ণনাকারী বলেন, এই হাদিস শুনে মুআবিয়া রা. মানুষের প্রয়োজন পূরণে একজন লোক নিযুক্ত করলেন।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আবু তালহা আল-আনসারি (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا مِن امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِن امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلاَّ نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ»

যেকোনো মুসলিম তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের এমন জায়গায় সাহায্য পরিত্যাগ করবে যেখানে তার সম্মানের লাঘব হচ্ছে বা ইজ্জতহানি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এমন জায়গায় তার সাহায্য পরিত্যাগ করবেন যেখানে সে সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর যেকোনো মুসলিম তার কোনো মুসলিম ভাইকে এমন জায়গায় সাহায্য করবে যেখানে সে অসম্মানিত হচ্ছে বা অপদস্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন যেখানে সাহায্যপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে।[৩৮৬]

পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টি দৃঢ়ীকরণে মুসলিম ফকিহগণের আশ্চর্যজনক বক্তব্য রয়েছে। তারা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমকে ক্ষতি থেকে বাঁচানো ওয়াজিব।

---

৩৮৫. *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৩৩২; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৮০৬২; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ১৫৬৫।

৩৮৬. তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ৪৭৩৫; *আল-আওসাত*, হাদিস নং ৮৬৪২; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৮৮৪; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৬৪১৫; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৭৬৩২।

বিপদ্গ্রস্ত, জলে নিমজ্জিত, অগ্নিদগ্ধ মানুষকে তাৎক্ষণিক উদ্ধারের জন্য নামাজ ভেঙে দেওয়া ওয়াজিব। অর্থাৎ, ধ্বংসাত্মক যেকোনো আপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে। কোনো ব্যক্তি যদি অপরের সাহায্য ছাড়াই বিপদ্গ্রস্তকে বিপদ থেকে উদ্ধারের সক্ষমতা রাখে, তাহলে তার জন্য বিপদ্গ্রস্তকে উদ্ধার করা ফরজে আইন। যদি ঘটনাস্থলে অন্য সক্ষম ব্যক্তি থাকে তাহলে তা ফরজে কেফায়া। এ ব্যাপারে ফকিহগণের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই।[৩৮৭]

এসব কারণেই পারস্পরিক সহযোগিতা ইসলামি সমাজের একটি মৌলিক ভিত্তি। বিপদ ও সংকট দূরীকরণে সাহায্য-সহযোগিতার অনেক পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। সাহায্য এগিয়ে দেওয়া, সুরক্ষা প্রদান করা, সমবেদনা জানানো, পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এগুলো করা যায়। যাতে নিরুপায় ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ হয়, দুশ্চিন্তাগ্রস্তের দুশ্চিন্তা দূর হয়, আক্রান্তের ক্ষত নিরাময় হয় এবং দেহ সব ধরনের ব্যাধি ও অসুস্থতা থেকে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

---

৩৮৭. আশ-শিরবিনি আল-খাতিব, *মুগনিল মুহতাজ*, খ. ৪, পৃ. ৫; ইবনে কুদামা, *আল-মুগনি*, খ. ৭, পৃ. ৫১৫ এবং খ. ৮, পৃ. ২০২।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

সুবিচার ও ইনসাফ

ইসলাম যে-সকল মৌলিক মানবিক মূল্যবোধের প্রবর্তন করেছে সুবিচার তার অন্যতম। সুবিচারকে ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের উপাদান সাব্যস্ত করেছে। কুরআনুল কারিম মানুষের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকে নবী-রাসুল প্রেরণ ও আসমানি কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য বলে স্থির করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

নিশ্চয় আমি আমার রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার (ইনসাফ) প্রতিষ্ঠা করে।[৩৮৮]

ইনসাফ ও সুবিচারই যে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নবী-রাসুল প্রেরণ ও আসমানি কিতাব নাযিলের প্রধান উদ্দেশ্য তা এই মূল্যবোধকে সবচেয়ে বেশি জোরদার করেছে। ইনসাফের সঙ্গেই কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে এবং রাসুলদের প্রেরণ করা হয়েছে। ইনসাফের কারণেই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী টিকে আছে।[৩৮৯]

যাদের মধ্যে আমরা বিচার করব তাদের প্রতি বিদ্বেষাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সুবিচার করা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

৩৮৮. সুরা হাদিদ : আয়াত ২৫।
৩৮৯. ড. ইউসুফ আল-কারযাবি, *মালামিহুল মুজতামাইল মুসলিম আল্লাযি নুনশিদুহু*, পৃ. ১৩৩।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।[৩৯০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

হে মুমিনগণ, আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।[৩৯১]

ইবনে কাসির[৩৯২] বলেছেন, কোনো গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ বা শত্রুতা যেন তোমাদেরকে তাদের মধ্যে সুবিচার পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে। বরং বন্ধু হোক বা শত্রু, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো।[৩৯৩]

ইসলামে সুবিচার কখনো ভালোবাসা বা শত্রুতার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সুবিচারের ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদা ও বংশগৌরবের কারণে পার্থক্য করা হয় না, সম্পদ ও প্রতিপত্তির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হয় না। একইভাবে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। বরং ইসলামের ভূমিতে

---

৩৯০. সুরা নিসা : আয়াত ১৩৫।

৩৯১. সুরা মায়িদা : আয়াত ৮।

৩৯২. ইবনে কাসির : আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসির আদ-দিমাশকি (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০২-১৩৭৩ খ্রি.)। হাদিসের হাফিয, ঐতিহাসিক, ফকিহ। সিরিয়ার বুসরার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, হুসাইনি, *যাইলু তাযকিরাতিল হুফফায*, পৃ. ৫৭-৫৮।

৩৯৩. ইবনে কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, খ. ২, পৃ. ৪৩।

বসবাসকারী মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই সুবিচার ভোগ করে থাকে। চাই পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা থাকুক বা শত্রুতা।

উসামা ইবনে যায়দ রা. বনু মাখযুম গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত নারীর জন্য মধ্যস্থতা করতে চেষ্টা করেন। তাকে চুরির অপরাধে হাত কাটার দণ্ড থেকে বাঁচাতে চান। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে রাজা-প্রজাসহ সমাজের প্রত্যেক সদস্যের মাঝে সমতার ঘোষণা দিয়ে ইসলামের মানহাজ ও সুবিচার ব্যাখ্যা করেন । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

হে জনমণ্ডলী, জেনে রাখো, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এই আচরণের কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত লোক চুরি করত, তাকে তারা ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোনো অসহায় দুর্বল লোক চুরি করত, তারা তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তাহলে নিশ্চয় আমি তার হাত কেটে দিতাম।[৩৯৪]

ইমাম আহমাদ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা খাইবারকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য গনিমত হিসেবে দিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদেরকে ওখানেই থাকার অনুমতি দিলেন এবং খাইবারের সম্পদ তার ও তাদের মধ্যে বণ্টিত হবে বলে স্থির করে দিলেন। (ফলের মৌসুম এলে) তিনি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.-কে পাঠালেন। তিনি ইহুদিদের জন্য খাইবারের খেজুরবাগানের ফলের

---

৩৯৪. *বুখারি*, কিতাব : আল-আম্বিয়া, বাব : তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকিমের অধিবাসীরা... (সুরা কাহফ : আয়াত ৯), হাদিস নং ৩২৮৮; *মুসলিম* : কিতাব : আল-হুদুদ, বাব : কাতউস সারিকিশ-শারিফি ওয়া গাইরিহি, হাদিস নং ১৬৮৮।

পরিমাণ অনুমান করলেন।[৩৯৫] তারপর তাদের বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়, তোমরা আমার কাছে সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত, তোমরা আল্লাহ তাআলার নবীদের হত্যা করেছ এবং আল্লাহর ওপর মিথ্যাচার করেছ। কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার ঘৃণা তোমাদের প্রতি সামান্য অবিচার করতে আমাকে প্ররোচিত করছে না। আমি খেজুরের পরিমাণ বিশ হাজার ওয়াস্‌ক[৩৯৬] অনুমান করেছি। তোমরা যদি চাও তা নিতে পারো। আর নিতে না চাইলে আমি নেব। ইহুদিরা বলল, এই সুবিচারের দ্বারা আকাশসমূহ ও জমিন টিকে আছে। আমরা তা গ্রহণ করলাম।[৩৯৭]

ইহুদিদের প্রতি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.-এর ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের প্রতি জুলুম করেননি। বরং তিনি তাদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের প্রতি সামান্যতম অবিচারও করবেন না। তারা খেজুরের বণ্টিত দুটি অংশের যেকোনোটি গ্রহণ করতে চাইলে গ্রহণ করুক।

এটাই ইসলামের ইনসাফ ও সুবিচার, এটাই জমিনের ওপর আল্লাহর মানদণ্ড। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে দুর্বলকে তার অধিকার প্রদান করা হয় এবং মজলুমের প্রতি, তার প্রতি যে জুলুম করেছে তার বিরুদ্ধে সুবিচার করা হয়। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে হকদার ব্যক্তি খুব সহজ পদ্ধতিতে ও সহজ পন্থায় তার অধিকার পেতে পারে। মুসলিম সমাজে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস থেকেই এই মূল্যবোধের বিস্তার ও উৎকর্ষ ঘটেছে। মুসলিম সমাজে বসবাসকারী সব শ্রেণির মানুষের সুবিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং সুবিচারে স্বস্তি পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

ইসলাম মানুষের সঙ্গে সুবিচার করতে নির্দেশ দিয়েছে। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গেই, যেমন আমরা প্রথমোক্ত আয়াতগুলোতে দেখেছি। এই সুবিচার কোনো খাতির বোঝে না, সুতরাং তা ভালোবাসা বা ঘৃণা ও শত্রুতার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কারণ, ইসলাম প্রথমে নিজের থেকেই ইনসাফ শুরু

---

৩৯৫. خرص : গাছের ওপর খেজুর বা ফল অনুমানভিত্তিক পরিমাপ করা। দেখুন, আল-আজিম আবাদি, *আওনুল মাবুদ*, খ. ৪, পৃ. ৩৪৪, ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব* خرص মূলধাতু, খ. ৭, পৃ. ২১।

৩৯৬. ওয়াস্‌ক = ৬০ সা, সা = ৪ মুদ, মুদ = ৮১৭.৬৫ গ্রাম।-অনুবাদক

৩৯৭. *আহমাদ*, হাদিস নং ১৪৯৯৬; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫১৯৯; শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ।

করতে নির্দেশ দিয়েছে। নিজের হক, রবের হক ও অন্য মানুষদের হকের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছে। আবুদ দারদা রা. তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে ধারাবাহিকভাবে রোযা ও কিয়ামুল লাইলে (রাত জেগে ইবাদত) মশগুল থেকে তার হক ক্ষুণ্ণ করতে চাইলে সালমান আল-ফারসি রা. তাকে বললেন,

«إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ»

নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার প্রতিপালকের হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার নিজেরও (শরীরেরও) হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার পরিবারেরও হক রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেককে তার প্রাপ্য হক দাও।[৩৯৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালমান আল-ফারসি রা.-এর এসব কথা শুনে তাকে সত্যায়ন করলেন।

ইসলাম অনুরূপভাবে কথার ক্ষেত্রে ইনসাফ রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾

যখন তোমরা কথা বলবে ন্যায্য বলবে, স্বজনদের সম্পর্কে হলেও।[৩৯৯]

যেমন আল্লাহ তাআলা বিচারে ইনসাফ করতে নির্দেশ দিয়েছেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে।[৪০০]

---

৩৯৮. *বুখারি*, কিতাব : আস-সাওম, বাব : মান আকসামা আলা আখিহি লি-ইয়ুফতিরা ফিত-তাতাওয়ুয়ি ওয়া লাম ইয়ারা আলাইহি কাযা ইযা কানা আওফাকা লাহু, হাদিস নং ১৮৩২; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৪১৩।

৩৯৯. সুরা আনআম : আয়াত ১৫২।

৪০০. সুরা নিসা : আয়াত ৫৮।

একইভাবে সন্ধির ক্ষেত্রেও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছেন,

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে, আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।[৪০১]

ইসলাম যে মাত্রায় সুবিচার ও ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছে এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে, তারচেয়ে অধিক মাত্রায় জুলুমকে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং একে প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ করেছে। চাই তা নিজের প্রতি জুলুম হোক, বা অন্যদের প্রতি। বিশেষ করে দুর্বলদের ওপর শক্তিমানদের জুলুম এবং দরিদ্রদের ওপর ধনীদের জুলুম এবং শাসিতদের ওপর শাসকদের জুলুমকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। মানুষ যত দুর্বল হবে তার প্রতি জুলুমের ভয়াবহতা ও পাপও তত তীব্র হবে। হাদিসে কুদসিতে রয়েছে (আল্লাহ তাআলা বলেন),

«يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا»

হে আমার বান্দারা, আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের মধ্যেও জুলুম হারাম সাব্যস্ত করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর জুলুম করো না।[৪০২]

---

৪০১. সুরা হুজুরাত : আয়াত ৯।

৪০২. *মুসলিম*, আবু যর রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-বির্‌রু ওয়াস-সিলাতু ওয়াল-আদাব, বাব : তাহরিমুয-যুলম, হাদিস নং ২৫৭৭; *আহমাদ*, হাদিস নং ২১৪৫৮; বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৪৯০; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৬১৯; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৭০৮৮ ও *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১১২৮৩।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে বলেন,

«وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ»

এবং বেঁচে থাকবে উৎপীড়িতের বদদোয়া থেকে। কেননা, উৎপীড়িতের বদদোয়া এবং আল্লাহর মধ্যে কোনো আড়াল নেই।[৪০৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

«ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ : الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ : وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ»

তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না : রোযাদারের দোয়া, যখন সে ইফতার করে; ন্যায়বিচারক শাসকের দোয়া এবং মাজলুমের দোয়া। আল্লাহ তার দোয়া মেঘের ওপর উঠিয়ে নেন এবং তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং রব বলেন, আমার ইজ্জত-সম্মানের কসম, নিশ্চয় আমি তোমাকে সাহায্য করব, যদিও কিছু সময় পরে হয়।[৪০৪]

ইনসাফ ও সুবিচার এমনই হয়। এটাই ইসলামি সমাজে আসমানের মানদণ্ড।

---

৪০৩. *বুখারি*, কিতাব : আল-মাগাযি, বাব : বা'সু আবি মুসা ওয়া মুআয ইলাল ইয়ামান কাবলা হাজ্জাতিল ওয়াদা, হাদিস নং ৪০০০; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : আদ-দুআ ইলাশ-শাহাদাতাইন ওয়া শারায়িয়িল-ইসলাম, হাদিস নং ২৭।

৪০৪. *তিরমিযি*, কিতাব : আদ-দাওয়াত, বাব : আল-আফউ ওয়াল-আফিয়া, হাদিস নং ৩৫৯৮, ইমাম তিরমিযি বলেছেন, এটা হাসান হাদিস। *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৭৫২; *আহমাদ*, হাদিস নং ৮০৩০। শুআইব আরনাউত বলেছেন, এটি সহিহ হাদিস।
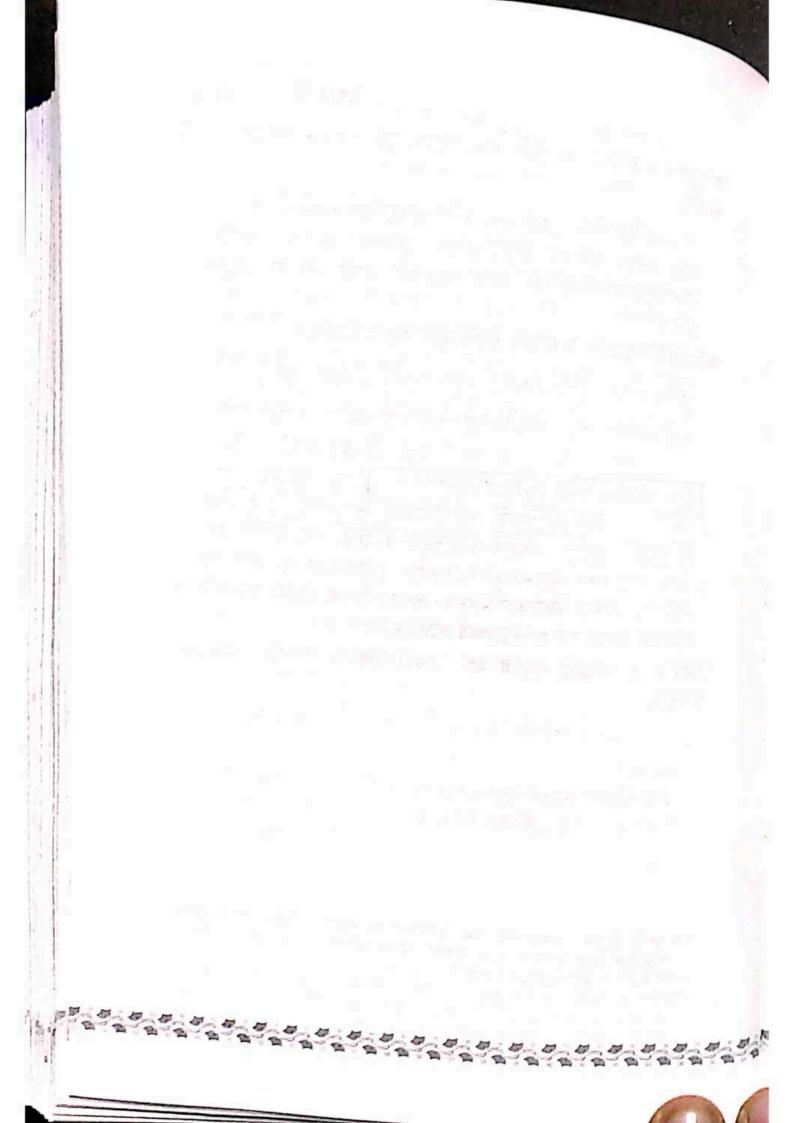
চতুর্থ অনুচ্ছেদ

দয়া

আল্লাহর কিতাব কুরআনই হলো মুসলিমদের সংবিধান এবং শরিয়তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আল্লাহর কিতাবে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই যা চোখে ভেসে ওঠে তা এই যে, সুরা তাওবা ব্যতীত সব সুরাই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' দ্বারা শুরু হয়েছে। এতে আল্লাহর দুটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে : রহমান (পরম করুণাময়) ও রহিম (দয়ালু)। কারও কাছেই এটা অস্পষ্ট থাকার কথা নয় যে, প্রতিটি সুরা এই দুটি সিফাত বা গুণ দ্বারা শুরু করার বিষয়টি ইসলামি শরিয়ায় দয়ার গুরুত্বকেই প্রতীয়মান করে। এটাও কারও অজানা থাকার কথা নয় যে, রহমান ও রহিম শব্দ দুটির অর্থের মধ্যে নৈকট্য রয়েছে। শব্দ দুটির পার্থক্যের ক্ষেত্রে আলেমগণের ব্যাপক আলোচনা ও বিভিন্ন মত রয়েছে।[৪০৫]

এই সম্ভাবনাও ছিল যে আল্লাহ তাআলা রহমত গুণটির সঙ্গে তাঁর অন্য একটি গুণ যুক্ত করতে পারতেন। যেমন : আযিম (মহান), হাকিম (প্রজ্ঞাময়), সামি (সর্বশ্রোতা), বাসির (সর্বদ্রষ্টা) ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা রহমত গুণটির সঙ্গে ভিন্নার্থক গুণবাচক শব্দও ব্যবহার করতে পারতেন, যা পাঠকের কাছে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো এবং রহমত গুণটিও অস্পষ্ট থাকত না। যেমন : জাব্বার (প্রতাপশালী), মুনতাকিম (শাস্তিদাতা), কাহহার (প্রবল)। কিন্তু দুটি পারস্পরিক (অর্থগতভাবে) নিকটবর্তী এই দুটি সিফাতকে কুরআনুল কারিমের প্রত্যেক সুরার শুরুতে একসঙ্গে ব্যবহার করার দ্বারা একটি স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, তা হলো দয়া। গুণটি কোনোরকম বিরোধ ব্যতিরেকে অন্য সকল গুণ থেকে অগ্রবর্তী। দয়ার ভিত্তিতে সকল কার্য পরিচালনা করা এমন একটি মৌলিক নীতি যা কখনো বিনষ্ট হবে না এবং অন্য নীতিসমূহের সামনে নড়বড়ে হবে না।

---

৪০৫. ইবনে হাজার আসকালানি, *ফাতহুল বারি*, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯।

কুরআনুল কারিমের সুরাবিন্যাসে প্রথম যে সুরাটি আমরা দেখতে পাই তাই উপর্যুক্ত মর্মার্থকে শক্তিশালী করে, স্পষ্ট করে।[৪০৬] তা হলো সুরা আল-ফাতিহা। সুরাটি অন্যান্য সুরার মতো বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু হয়েছে, এতে রহমান ও রহিম দুটি সিফাত রয়েছে। তারপর সুরার আয়াতের মধ্যেও দেখতে পাই যে রহমান ও রহিম সিফাত দুটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই সুরাটি দিয়ে কুরআনুল কারিমের সূচনা করাতেও স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। তা ছাড়া আমাদের জানা আছে যে, সুরা আল-ফাতিহা হলো সেই সুরা, যা প্রতিদিনের প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করা মুসলিমের জন্য আবশ্যক। তার অর্থ এই যে, একজন মুসলিম (নামাযের প্রত্যেক রাকাতে) রহমান শব্দটি কমপক্ষে দুইবার উচ্চারণ করে এবং রহিম শব্দটি কমপক্ষে দুইবার উচ্চারণ করে। বান্দা নামাযের প্রত্যেক রাকাতে এই চারবার আল্লাহ তাআলার দয়া স্মরণ করে। অর্থাৎ, একজন মুসলিমের ওপর দৈনিক সতেরো রাকাত ফরজ নামাযে রহমত বা দয়া শব্দটি ৬৮ বার উচ্চারিত হয়। এ থেকে এই মহান গুণটি, অর্থাৎ রহমত গুণটি উদ্‌যাপনের একটি চমৎকার চিত্র আমরা পাই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানে উচ্চারিত রাব্বুল আলামিনের সিফাত বর্ণনাকারী অনেক হাদিস থেকে এ বিষয়টির ব্যাখ্যা আমরা পাই। যেমন : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ»

আল্লাহ তাআলা গোটা মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্বে এ কথা লিখে রেখেছেন যে, 'আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর সর্বদাই

---

৪০৬. কুরআনুল কারিমের সুরাসমূহের বিন্যাস একটি ঐশী বিষয়; অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহি নাযিল করে আমাদের সামনে আজ কুরআনের যে সুরাবিন্যাস রয়েছে তা জানিয়েছেন। অথচ কুরআনের আয়াতসমূহ ও সুরাসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিন্যাসে নাযিল হয়েছে। আবু আব্দুল্লাহ আয-যারকাশি, *আল-বুরহান ফি উলুমিল-কুরআন*, খ. ১, পৃ. ২৬০।

অগ্রগামী'; এই বাক্য তাঁর কাছে আরশের ওপর লিখিতভাবে রয়েছে।[৪০৭]

এতে এই স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে, দয়া ক্রোধের ওপর অগ্রবর্তী এবং কোমলতা কঠোরতার ওপর অগ্রবর্তী।

অধিকন্তু নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানবতার ও বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।[৪০৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বে, সমানভাবে তাঁর সাহাবিদের ও শত্রুদের সঙ্গে আচার-আচরণে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়ার গুণ অর্জন করতে ও এই শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধে সজ্জিত হতে উদ্বুদ্ধ করে বলেন,

«لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ»

যে লোক মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।[৪০৯]

এখানে 'নাস' বা মানুষ শব্দটি ব্যাপকার্থক, এটি প্রত্যেক মানব সদস্যকে বোঝায়। লিঙ্গ, বর্ণ ও ধর্মের কোনো পার্থক্য নেই। এ ব্যাপারে আলেমগণ

---

৪০৭. *বুখারি*, কিতাব : আত-তাওহিদ, বাব : আল্লাহ তাআলার বাণী, 'বস্তুত তা সম্মানিত কুরআন, সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।' (সুরা বুরুজ : আয়াত ২১-২২), হাদিস নং ৭১১৫, উদ্ধৃত বাক্য *বুখারির*; *মুসলিম*, কিতাব : আত-তাওবাহ, বাব : সিআতু রহমাতিল্লাহি তাআলা, হাদিস নং ২৭৫১। অন্য একটি রেওয়ায়েতে سبقت (অগ্রগামী) শব্দের বদলে غلبت (প্রাধান্য লাভ করেছে) শব্দ এসেছে। *বুখারি*, কিতাব : বাদউল খালক, হাদিস নং ৩০২২।

৪০৮. সুরা আম্বিয়া : আয়াত ১০৭।

৪০৯. *বুখারি*, কিতাব : আত-তাওহিদ, বাব : মা জাআ ফি দুআইন-নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতাহু ইলা তাওহিদিল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা, হাদিস নং ৬৯৪১; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ফাযায়িল, বাব : রহমাতুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আস-সিবয়ানা ওয়াল-ইয়ালা ওয়া তাওয়াদুউ ওয়া ফাদলু যালিকা, হাদিস নং ২৩১৯।

বলেছেন, এখানে দয়ার বিষয়টি ব্যাপক, তা শিশুদের ও অন্যদের স্নেহ-মমতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।[৪১০]

ইবনে বাত্তাল বলেছেন, এই হাদিসে সৃষ্টিজগতের সকলের সঙ্গে দয়াপূর্ণ আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং মুমিন, কাফের ও চতুষ্পদ জন্তুও এর অন্তর্ভুক্ত। চতুষ্পদ জন্তু নিজের মালিকানাধীন হোক, বা মালিকানা ছাড়া হোক। চতুষ্পদ জন্তুকে খাদ্য ও পানি দান, তাদের ওপর বেশি বোঝা না চাপানো ও প্রহারে সীমালঙ্ঘন না করাও তাদের প্রতি দয়ার অন্তর্ভুক্ত।[৪১১]

অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কসম করে বলেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا يَضَعُ اللهُ رَحْمَتَهُ إِلا عَلَى رَحِيمٍ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كُلُّنَا يَرْحَمُ ، قَالَ : لَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ يَرْحَمُ النَّاسَ كَافَّةً»

যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আল্লাহ দয়ালু লোক ব্যতীত কাউকে তাঁর রহমত দেন না। সাহাবা কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের প্রত্যেকেই তো দয়ালু (মানুষের প্রতি দয়া করে)। তিনি বললেন, তোমাদের কারও তার সঙ্গীর প্রতি দয়ালু হওয়ার দ্বারা তো জগতের সকল মানুষের প্রতি দয়া করা হয় না।[৪১২]

মুসলিম সকল মানুষের প্রতি দয়াশীল—শিশু, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মুসলিম ও অমুসলিম সকলের প্রতি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন,

«ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ»

---

[৪১০]. নববি, *আল-মিনহাজ ফি শারহি সাহিহ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, খ. ১৫, পৃ. ৭৭।
[৪১১]. মুবারকপুরি, *তুহফাতুল আহওয়াযি বি-শারহি জামেইত-তিরমিযি*, খ. ৬, পৃ. ৪২।
[৪১২]. *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ৪২৫৮; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ১১০৬০।

দুনিয়ায় যারা রয়েছে তাদের প্রতি দয়া করো, আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।[৪১৩]

এখানে 'مَنْ' বা যারা শব্দটি জমিনে যারা রয়েছে তাদের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে।

মুসলিমদের সমাজে দয়া এমনই হয়ে থাকে। এটা আচরণগত সক্রিয় মূল্যবোধ, যার মূলে রয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের হৃদ্যতা ও মমত্ববোধ। বরং এই দয়া ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-নির্বিশেষে সকল মানুষকে ছাড়িয়ে মূক প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু, গবাদি পশু, পাখি, বৃক্ষ ও তৃণলতার প্রতি বিস্তৃত!

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন, একটি নারী জাহান্নামে প্রবেশ করেছে এ কারণে যে, সে একটি বিড়ালের সঙ্গে নির্মম আচরণ করেছিল এবং তার প্রতি দয়া দেখায়নি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ»

এক মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, তাকে খাবারও দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি যে জমিনের ঘাস-লতা-পাতা খেয়ে বেঁচে থাকবে।[৪১৪]

একইভাবে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা একটি লোককে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যে লোকটি একটি কুকুরের প্রতি দয়া দেখিয়েছিল এবং তাকে পানি পান করিয়ে তৃপ্ত করেছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ؛ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ

---

৪১৩. *তিরমিযি*, আমর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-বিরর ওয়াস-সিলাহ, বাব : মা জাআ ফি রহমাতিল মুসলিমিন, হাদিস নং ১৯২৪; *আহমাদ*, হাদিস নং ৬৪৯৪; *হাকিম*, হাদিস নং ৭২৭৪। ইমাম তিরমিযি বলেছেন, এটা হাসান সহিহ হাদিস।

৪১৪. *বুখারি*, কিতাব : বাদউল খালক, বাব : খামসুন মিনাদ-দাওয়াব ইয়ুকতালনা ফিল-হারাম, হাদিস নং ৩১৪০; *মুসলিম*, কিতাব : আত-তাওবাহ, বাব : সিআতু রহমাতিল্লাহি তাআলা ওয়া আন্নাহা সাবাকাত গাদাবাহু, হাদিস নং ২৬১৯।

هٰذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي - فَمَلَأَ خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»

এক লোক রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা পেল। সে কূপে নেমে পানি পান করল। কূপ থেকে বের হয়ে সে দেখতে পেল একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। সে ভাবল, কুকুরটারও আমার মতো পিপাসা লেগেছে। সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে মুখ দিয়ে সেটি কামড়ে ধরে উপরে উঠে এলো এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ তাআলা লোকটির আমল কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবা কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের সওয়াব হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করাতে সওয়াব রয়েছে।[৪১৫]

বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের উদ্দেশে ঘোষণা করেছিলেন যে, এক ব্যভিচারিণীর জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছিল, যার হৃদয় একটি কুকুরের প্রতি দয়ায় শিহরিত হয়ে উঠেছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا، فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ»

পিপাসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে একটি কুকুর একটি কূপের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বনি ইসরাইলের এক দুশ্চরিত্রা নারী তা দেখতে পেল। সে তার পাদুকা খুলে কূপ থেকে পানি তুলে

৪১৫. *বুখারি*, কিতাব : আল-মুসাকাত ওয়াশ-শুরব, বাব : ফাদলু সাকয়িল মা, হাদিস নং ২২৩৪; *মুসলিম*, কিতাব : আস-সালাম, বাব : ফাদলু সাকিল বাহাইমিল-মুহতারামাহ ওয়া ইতআমিহা, হাদিস নং ২২৪৪।

কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[৪১৬]

মানুষ তো হতবিহ্বল হয়ে পড়ে যে, ব্যভিচারের পাপের বিপরীতে একটি কুকুরের পরিতৃপ্তি কী! কিন্তু কর্মের পেছনে রহস্য লুকিয়ে আছে। তা হলো মানুষের হৃদয়গত দয়া ও প্রেম এবং সেই আলোকে তার কাজকর্ম। মনুষ্য সমাজে এর মূল্য ও প্রভাব পরিপূর্ণভাবেই রয়েছে।

ইসলাম যে দয়া নিয়ে এসেছে তার প্রেক্ষিতে মূক প্রাণীর প্রতিও দয়া করতে আহ্বান জানিয়েছে। এগুলোকে যেন ক্ষুধার্ত না রাখা হয় এবং এগুলোর ওপর যেন মাত্রাতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া না হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দুর্বল শীর্ণ উটের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পূর্ণ দয়া ও মমতার সঙ্গে বলেছিলেন,

«اتَّقُوا اللهَ فِي هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ ... فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً»

তোমরা এই সকল বোবা প্রাণীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা সেগুলোর ওপর আরোহণ করো সুন্দরভাবে এবং সেগুলোকে খাও সুন্দরভাবে।[৪১৭]

একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, নিশ্চয় আমি ছাগল জবাই করার সময় তার প্রতি দয়া করি। জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ»

ছাগলের প্রতি যদি তুমি দয়া দেখাও আল্লাহও তোমার প্রতি দয়া দেখাবেন।[৪১৮]

---

৪১৬. *বুখারি*, কিতাব : আল-আম্বিয়া, বাব : 'তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকিমের অধিবাসীরা... (সুরা কাহফ : আয়াত ৯), হাদিস নং ৩২৮০; *মুসলিম* : কিতাব : আস-সালাম, বাব : ফাদলু সাকিল বাহাইমিল-মুহতারামাহ ওয়া ইতআমিহা, হাদিস নং ২২৪৫।

৪১৭. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-জিহাদ, বাব : মা ইয়ুমারু বিহি মিনাল-কিয়াম আলাদ-দাওয়াব ওয়াল-বাহায়িম, হাদিস নং ২৫৪৮; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৭৬৬২, শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ, এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, অর্থাৎ সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী। *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫৪৬।

৪১৮. *আহমাদ*, হাদিস নং ১৫৬৩০; *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ৭৫৬২, তিনি বলেছেন, এটা সহিহ হাদিস, যদিও তা *বুখারি* ও *মুসলিমে* সংকলিত হয়নি। তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ১৫৭১৬।

ইসলাম কেবল চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি দয়া দেখানোর নির্দেশ দেয়নি, বরং ছোট ছোট পাখি, যেগুলোর দ্বারা মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর মতো উপকৃত হয় না সেগুলোর প্রতিও দয়া দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে। আপনি দেখবেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চড়ুইয়ের ব্যাপারেও বলেন,

«مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ يَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ»

> কেউ অনর্থক একটি চড়ুইও হত্যা করলে সে আল্লাহ তাআলার কাছে কিয়ামতের দিন অভিযোগ জানাবে, বলবে, হে আমার প্রতিপালক, অমুক লোক আমাকে অনর্থক হত্যা করেছে, সে আমাকে কোনো উপকারের জন্য হত্যা করেনি।[৪১৯]

ইতিহাস-লেখকেরা বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইবনুল আস রা. মিশর বিজয়ের সময় যে তাঁবু স্থাপন করেছিলেন তার উপরে একটি কবুতর বাসা বেঁধেছিল। আমর রা. তাঁবু ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় সফরের সময় তা দেখতে পেলেন। তিনি তাঁবু খুলে ফেলে কবুতরটিকে কষ্ট দিতে চাইলেন না। তাঁবুটি যেভাবে ছিল সেভাবেই রেখে দিলেন। ধীরে ধীরে তার চারপাশে মানুষের বসবাস বাড়তে থাকল। একসময় তা শহরে পরিণত হলো এবং তার নাম হয়ে গেল ফুসতাত (তাঁবু)।

ইবনে আবদুল হাকাম[৪২০] খলিফায়ে রাশেদ উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ.-এর জীবনচরিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি প্রয়োজন ছাড়া ঘোড়া ছোটাতে নিষেধ করেছেন। তিনি আস্তাবলের প্রধানের কাছে চিঠি লিখে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন কাউকে ভারী লাগামের সঙ্গে ঘোড়ায় না চড়ায় এবং কেউ যেন লোহার তীক্ষ্ণ ফলাবিশিষ্ট চাবুকের (বা লাঠির) দ্বারা ঘোড়াকে খোঁচা না দেয়। তিনি মিশরের আমিরের উদ্দেশে চিঠি লিখেছেন এই মর্মে যে, আমার কাছে সংবাদ এসেছে, মিশরে বোঝা বহনকারী

---

৪১৯. *নাসায়ি*, শারিদ ইবনে সুওয়াইদ থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ৪৪৪৬; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৯৪৮৮; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫৯৯৩; তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, খ. ৬, পৃ. ৪৭৯, শাওকানি বলেছেন, এই হাদিস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার কোনো কোনোটিকে ইমামগণ সহিহ বলেছেন। *আস-সাইলুল-জাররার*, খ. ৪, পৃ. ৩৮০।

৪২০. ইবনে আবদুল হাকাম (১৮৭-২৫৭ হি.) : আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম। ইতিহাসবিদ ও মালেকি মাযহাবপন্থী ফকিহ। মিশরে জন্ম ও মৃত্যু। দেখুন, খায়রুদ্দিন আয-যিরিকলি, খ. ৩, পৃ. ২৮২।

উটদের একেকটির ওপর এক হাজার রিতল বোঝা চাপানো হয়। আমার এই চিঠি তোমার কাছে পৌছার পর আমি যেন শুনতে না পাই কোনো উটের ওপর ছয়শ রিতলের বেশি চাপানো হয়েছে।[৪২১]

ইসলামি সমাজে দয়ার স্বরূপ এমনই। তা এ সমাজের সদস্যবৃন্দ ও তাদের বংশধরদের অন্তরে বদ্ধমূল। আপনি দেখবেন যে, তারা দুর্বলের প্রতি কোমলহৃদয়, দুঃখীর প্রতি সহানুভূতিশীল, অসুস্থের প্রতি সমবেদনাপূর্ণ, মুখাপেক্ষীর প্রতি দরাজদিল। এমনকি তা মূক প্রাণী হলেও...। এমন সজীব দয়াপূর্ণ হৃদয়সমূহের ফলেই সমাজ পবিত্র থাকে, অপরাধ থেকে মুক্ত থাকে এবং চারপাশে যারা ও যা-কিছু রয়েছে সকলের জন্য কল্যাণ, সদাচার ও শান্তির উৎসে পরিণত হয়।

---

[৪২১]. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম, *সিরাতু উমর ইবনে আবদুল আযিয*, খ. ১, পৃ. ১৪১।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুসলিম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ইসলামি সভ্যতায় রাষ্ট্রনীতিসমূহ কেবল ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে মুসলিমদের ও অমুসলিমদের সমস্যাবলির সমাধানকল্পেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা অপরাপর জাতি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক-ব্যবস্থাপনায়ও গুরুত্ব আরোপ করেছে। এখানে কিছু নীতি ও আদর্শ রয়েছে, যার ওপর এই সম্পর্কসমূহের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এসব নীতি শান্তির অবস্থায় ও যুদ্ধাবস্থায় সমানভাবে প্রযোজ্য। এখানেও ইসলামি সভ্যতার মাহাত্ম্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং তার মানবিকতার ঝান্ডা পতপত করে উড়েছে।

নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহে আমরা সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইসলামে শান্তিই মূলনীতি

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : অমুসলিমদের সঙ্গে সন্ধি

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামে যুদ্ধের কারণ ও উদ্দেশ্য

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ইসলামে যুদ্ধের নৈতিকতা

প্রথম অনুচ্ছেদ

ক. ইসলামে শান্তিই মূলনীতি

ইসলামে সত্যিকার অর্থে শান্তিই মূলনীতি। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি ঈমানদার ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাসী বান্দাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

> হে মুমিনগণ, তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৪২২]

এখানে ﴿السِّلْمِ﴾ মানে ইসলাম।[৪২৩] সিল্‌ম বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে এ কারণে যে তা মানুষের জন্য শান্তি। তা মানুষের জন্য অন্তরে শান্তি, ঘরে শান্তি, সমাজে শান্তি, চারপাশে যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে শান্তি—এটা শান্তির ধর্ম।

এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, ইসলাম শব্দটি সিল্‌ম ﴿السِّلْمِ﴾ শব্দ থেকে নির্গত এবং শান্তিই ইসলামি নীতিমালার প্রধান নীতি। তা কেবল সাধারণভাবে প্রধান নীতি নয়, বরং তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তা (সালাম বা শান্তি) মূলধাতুর বিবেচনায় স্বয়ং ইসলাম নামটিরই সমর্থক।[৪২৪]

শান্তিই হলো ইসলামের মৌলিক অবস্থা। যা সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে সহযোগিতা, পরিচিতি ও কল্যাণ-বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়।

---

৪২২. সুরা বাকারা : আয়াত ২০৮।

৪২৩. ইবনে কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, খ. ১, পৃ. ৫৬৫।

৪২৪. মুহাম্মাদ আস-সাদিক আফিফি, *আল-ইসলামু ওয়াল-আলাকাতুদ-দাওলিয়্যা*, পৃ. ১০৬; যাফির আল-কাসিমি, *আল-জিহাদু ওয়াল-হুকুকুদ-দাওলিয়্যা ফিল-ইসলাম*, পৃ. ১৫১।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম-অমুসলিম মানবিকতার ক্ষেত্রে ভ্রাতৃতুল্য।[৪২৫] কারণ, স্বাভাবিক অবস্থায় মুসলিম-অমুসলিদের মধ্যে নিরাপত্তা বজায় থাকবে; এই নিরাপত্তা কোনো চুক্তি বা বিনিময়ের জন্য নয়। বরং এই ভিত্তিতে যে, শান্তিই মূলনীতি। মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা যদি এই ভিত্তি ভেঙে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।[৪২৬]

তখন মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হলো অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে ও অমুসলিম জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখা। যাতে মানব-ভ্রাতৃত্ব অটুট থাকে এবং এই পবিত্র আয়াতের অর্থ বাস্তবিক হয়ে ওঠে,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾

হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে আমি তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।[৪২৭]

সুতরাং জাতি-গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি ও ধ্বংসের জন্য নয়। বরং তা পারস্পরিক পরিচিতি, প্রীতি ও ভালোবাসার প্রয়োজনে।[৪২৮]

কুরআনের একাধিক আয়াত উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। এসব আয়াতে অমুসলিমদের সঙ্গে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি তারা শান্তি ও সমঝোতার জন্য ঝোঁক দেখায় ও প্রস্তুতি নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

---

৪২৫. মাহমুদ শালতুত, *আল-ইসলাম আকিদাতান ও শারিআতান*, পৃ. ৪৫৩।
৪২৬. সুবহি আস-সালিহ, *আন-নুযুমুল ইসলামিয়্যা নাশআতুহা ওয়া তাতওয়ুরুহা*, পৃ. ৫২০।
৪২৭. সুরা হুজুরাত : আয়াত ১৩।
৪২৮. জাদুল-হাক্ক, *মাজাল্লাহ আল-আযহার*, পৃ. ৮১০, ডিসেম্বর ১৯৯৩ খ্রি.।

তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৪২৯]

এই আয়াত সুনিশ্চিত আকারে প্রমাণ পেশ করছে যে, মুসলিমরা যুদ্ধ নয় শান্তিই ভালোবাসে এবং তারা শান্তির দিকটিই প্রধান্য দেয়। শত্রুরা যদি শান্তি ও সন্ধির প্রতি ঝোঁক দেখায়, মুসলিমরা তাতেই সন্তুষ্ট হয়, যতক্ষণ না এ ধরনের প্রচেষ্টার আড়ালে মুসলিমদের অধিকার বিনষ্ট হয় অথবা তাদের অভিপ্রায়ের মূল্য দেওয়া না হয়।

সুদ্দি[৪৩০] ও ইবনে যায়দ[৪৩১] বলেছেন, আয়াতটির অর্থ এই যে, তারা যদি আপনাদের সন্ধির প্রতি আহ্বান জানায় আপনি তাদের ডাকে সাড়া দিন।[৪৩২] এই আয়াতের পরবর্তী আয়াত জোরালোভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের আগ্রহের কথা জানিয়ে দেয়, এমনকি শত্রুরা শান্তির কথা প্রকাশ্যে বলে বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটি গোপন করলেও। আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্মানিত রাসুলকে সম্বোধন করে বলেন,

﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾

তারা যদি আপনাকে প্রতারিত করতে চায় তাহলে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি আপনাকে তাঁর নিজের সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।[৪৩৩]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আপনার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট।[৪৩৪]

---

৪২৯. সুরা আনফাল : আয়াত ৬১।

৪৩০. সুদ্দি : ইসমাইল ইবনে আবদুর রহমান আস-সুদ্দি, মৃ. ১২৮ হি./৭৪৫ খ্রি.। তাবেয়ি। হিজাযের বংশোদ্ভূত এবং কুফায় বসবাস। তার ব্যাপারে ইবনে তাগরি বারদি বলেছেন, তাফসির, মাগাযি (যুদ্ধ-ইতিহাস) ও জীবনচরিত রচয়িতা। ঘটনা ও দিনপঞ্জি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ইমাম ছিলেন। দেখুন, ইবনে তাগরি বারদি, *আন-নুজুমুয-যাহিরাহ*, খ. ১, পৃ. ৩৯০।

৪৩১. ইবনে যায়দ : আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম, মৃ. ১৭০ হি./৭৮৬ খ্রি.। ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *আন-নাসিখ ওয়াল-মানসুখ* এবং *আত-তাফসির*। খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলের শুরুর দিকে ইনতেকাল করেছেন। দেখুন, ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, খ. ১, পৃ. ৩১৫।

৪৩২. কুরতুবি, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৪, পৃ. ৩৯৮-৩৪৪।

৪৩৩. সুরা আনফাল : আয়াত ৬২।

৪৩৪. কুরতুবি, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৪, পৃ. ৪০০।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তিকে মুসলিমদের কাঙ্ক্ষিত ও আল্লাহর কাছে একান্ত প্রার্থিত বিষয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দোয়ায় বলতেন,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّىٓ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ»

হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও স্বস্তি প্রার্থনা করি।[৪৩৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا»

হে লোকসকল, শত্রুর মোকাবিলার আকাঙ্ক্ষা করো না, বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা করো। তবে (শত্রুর বিরুদ্ধে) লড়াই সংঘটিত হলে ধৈর্যধারণ করো।[৪৩৬]

এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ শব্দটি পর্যন্ত ঘৃণা করতেন। হাদিসে এসেছে,

«أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا: حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا: حَرْبٌ وَمُرَّةُ»

আল্লাহ তাআলার কাছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান নামই সর্বাধিক প্রিয়। এবং (অর্থ ও বাস্তবতার দিক থেকে) হারিস ও হাম্মাম সর্বাধিক সত্য নাম এবং সবচেয়ে মন্দ নাম হারব ও মুররাহ।[৪৩৭]

---

৪৩৫. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : মা ইয়াকুলু ইযা আসবাহা, হাদিস নং ৫০৭৪; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩৮৭১; *আহমাদ*, হাদিস নং ৪৭৮৫, শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ এবং তার বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৯৬১; বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ১২০০; তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ১৩২৯৬; নাসায়ি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১০৪০১।

৪৩৬. বুখারি, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : কানান-নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইযা লাম ইয়ুকাতিলু আওয়ালান নাহারি আখখারাল কিতাল.., হাদিস নং ২৮০৪; *মুসলিম*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : কারাহিয়াতু তামান্নি লিকাইল-আদুওবি ওয়াল-আমরি বিস-সাবরি ইনদাল লিকা, হাদিস নং ১৭৪২।

৪৩৭. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ফি তাগরিরিল আসমা, হাদিস নং ৪৯৫০; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ৩৫৬৮; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৯০৫৪; বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৮১৪।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩৮. অমুসলিমদের সঙ্গে সন্ধি

শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানকল্পেই অন্যদের সঙ্গে মুসলিমদের সন্ধিগুলো হয়েছিল। এসব সন্ধির আওতায় দুটি দল, মুসলিম ও অন্যরা, শান্তি বা যুদ্ধবিরতি বা মৈত্রীর অবস্থায় থেকেছে।

যেহেতু সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো শান্তি, তাই সন্ধিগুলো হয়েছিল আকস্মিক আপতিত যুদ্ধের সমাপ্তিতে ও সার্বক্ষণিক শান্তির অবস্থা ফিরিয়ে আনতে অথবা সেগুলো ছিল শান্তির অবস্থাকে আরও জোরালো ও শান্তিস্তম্ভগুলোকে আরও দৃঢ় করার জন্য। যাতে সন্ধির পর শত্রুতার কোনো সম্ভাবনাই না থাকে। তবে সন্ধিভঙ্গের কারণ ঘটলে ভিন্ন কথা।[৪৩৮]

দীর্ঘ যুগ-যুগান্তর ধরে ইসলামি রাষ্ট্রগুলো অনৈসলামি রাষ্ট্রগুলোর সন্ধি ও মৈত্রীচুক্তি বাস্তবায়ন করে এসেছে। এসব সন্ধি ও মৈত্রীচুক্তিতে কিছু কর্তব্য, নীতি, শর্ত ও আদর্শ ছিল। ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে এগুলো উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছে।

শুরুর দিকে সন্ধি ও মৈত্রীচুক্তিগুলো ছিল মূলত সমঝোতা, প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার, ইসলামি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি ও যুদ্ধ উভয় অবস্থায় এসব প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল। শেষ পর্যায়ে সন্ধিগুলোর নামকরণ করা হয় শান্তিচুক্তি বা যুদ্ধবিরতি চুক্তি বা সমঝোতা চুক্তি। এগুলোর দাবি ছিল যুদ্ধ পরিত্যাগে সকলের সঙ্গে আপস-মীমাংসা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

> তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবেন।[৪৩৯]

---

৪৩৮. মুহাম্মাদ আবু যাহরাহ, *আল-আলাকাতুদ-দাওলিয়্যা ফিল-ইসলাম*, পৃ. ৭৯।

৪৩৯. সুরা আনফাল : আয়াত ৬১।

ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে যেসব সন্ধি ও মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত বা বাস্তবায়িত হয়েছে তার অন্যতম হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদিনায় আগমনের পর ইহুদিদের সঙ্গে তাঁর চুক্তি। এই চুক্তির কিছু শর্ত নিম্নরূপ :

- ইহুদিরা যতদিন মুসলিমদের সঙ্গে মিলেমিশে যুদ্ধ করবে ততদিন তারা যুদ্ধের ব্যয়ও নির্বাহ করবে।
- বনু আওফের ইহুদিরা মুমিনদের সঙ্গে একই উম্মত গণ্য হবে।
- ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম এবং মুসলিমদের জন্য তাদের ধর্ম। তাদের নিজেদের ও গোলামদের জন্য এ কথা প্রযোজ্য হবে। তবে যে লোক জুলুম বা অপরাধ করবে সে তার নিজেকে ও নিজ পরিবার-পরিজন ছাড়া আর কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।
- বনু নাজ্জারের ইহুদিরা বনু আওফের ইহুদিদের মতো অধিকার লাভ করবে।
- বনু হারিসের ইহুদিরা বনু আওফের ইহুদিদের সম-অধিকার লাভ করবে।
- বনু সাইদার ইহুদিরাও বনু আওফের ইহুদিদের সমান অধিকার পাবে।
- বনু জুশামের ইহুদিরাও বনু আওফের ইহুদিদের মতো অধিকার লাভ করবে।
- বনু আওসের ইহুদিরাও বনু আওফের ইহুদিদের মতো অধিকার পাবে।
- বনু শাতিবার ইহুদিদের জন্যও বনু আওফের ইহুদিদের সমান অধিকার থাকবে।
- ইহুদিদের শাখাগোত্রগুলোও তাদের মূল গোত্রের লোকদের সমান অধিকার লাভ করবে।
- ইহুদিদের ওপর তাদের নিজেদের ব্যয়ভার অর্পিত হবে এবং মুসলিমদের ওপর তাদের নিজেদের ব্যয়ভার অর্পিত হবে।
- যে-কেউ এই চুক্তিতে সম্মত কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে তার বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করবে এবং তাদের মধ্যে

পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও কল্যাণ কামনার সম্পর্ক থাকবে। বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে, বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।

- কোনো পক্ষ তার মিত্রপক্ষের অপকর্মের জন্য দায়ী হবে না এবং অত্যাচারিত সাহায্যের হকদার গণ্য হবে।
- কোনো পক্ষের আশ্রিত ব্যক্তি আশ্রয়দাতার সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে, যে আশ্রিত কোনো ক্ষতিসাধন করবে না এবং অপরাধ করবে না।
- এ চুক্তিনামায় যা-কিছু রয়েছে তার প্রতি সর্বাধিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়।
- এই চুক্তির সকল পক্ষ ইয়াসরিব আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করবে।
- তাদেরকে সন্ধির জন্য আহ্বান জানানো হলে তারা সন্ধিবদ্ধ হবে। অনুরূপ তারা সন্ধির জন্য আহ্বান জানালে মুমিনদেরও সন্ধির আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। তবে কেউ ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তার ব্যাপারে এ কথা প্রযোজ্য হবে না।
- প্রত্যেক পক্ষকে তার নিজের দিকের প্রতিরোধের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।
- জুলুমকারী বা অপরাধী ছাড়া কেউ চুক্তিনামার প্রতিবন্ধক হবে না।
- যে ব্যক্তি সদাচার করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, নিশ্চয় আল্লাহ তার সহায় রয়েছেন।[৪৪০]

এই চুক্তিনামা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, তা ছিল ইহুদিদের ও মুসলিমদের মধ্যে শান্তির অবস্থাকে স্থিতিশীল করার জন্য। তা ছাড়া এটি ছিল তাদের মধ্যে যুদ্ধ না ঘটার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা। চুক্তির শর্তগুলো থেকে স্পষ্টই জানা যাচ্ছে যে, তা ছিল উত্তম প্রতিবেশিত্ব নিশ্চিত করা ও ইনসাফের স্তম্ভগুলোকে দৃঢ়মূল করার জন্য। এটাও দেখা যাচ্ছে যে, চুক্তিতে মজলুম ও অত্যাচারিতদের সাহায্য করার ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য

---

৪৪০. ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৫০৩-৫০৪; ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৩২২-৩২৩।

রয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠা, ইনসাফের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখা এবং দুর্বলকে সাহায্য করার জন্য এটা ছিল একটি নিরপেক্ষ ন্যায্য চুক্তি।

সিরাতের গ্রন্থগুলো এ ধরনের চুক্তিনামার উদাহরণের কয়েকটি ভান্ডার উপস্থিত করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানের খ্রিষ্টানদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন তা তার মধ্যে অন্যতম। তাতে বলা হয়েছে,

«وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا جِوَارُ اللهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَأَرْضِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَغَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَعَشِيرَتِهِمْ ... ، وكلما تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ...،»

> নাজরান ও তাদের পার্শ্ববর্তী লোকদের জন্য রয়েছে আল্লাহর আশ্রয় ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিম্মা (নিরাপত্তা)—তাদের নিজেদের ওপর ও তাদের সম্প্রদায়ের ওপর, তাদের ভূমি ও সম্পদের ওপর, তাদের অনুপস্থিত ও উপস্থিত সদস্যবর্গের ওপর এবং তাদের পরিবার-পরিজনের ওপর... এবং কম বা বেশি যা-কিছু তাদের আয়ত্তাধীন রয়েছে সেগুলোর ওপর...।[৪৪১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু দামরাহ[৪৪২]-এর সঙ্গে অনুরূপ চুক্তি করেছিলেন। সে সময় তাদের নেতা ছিলেন মাখশি ইবনে আমর দামরি। বনু মুদলিজের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুরূপ চুক্তি ছিল। বনু মুদলিজের লোকেরা ইয়ানবু এলাকায় বসবাস করত। হিজরি দ্বিতীয় বছরের জুমাদাল উলায় এই চুক্তি হয়েছিল।[৪৪৩] জুহাইনার গোত্রগুলোর সঙ্গেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুক্তি করেছিলেন। তারা ছিল কয়েকটি বড় গোত্র, মদিনা মুনাওয়ারার দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত।[৪৪৪]

---

৪৪১. বাইহাকি, *দালাইলুন নুবুওয়া*, বাব : ওয়াফদু নাজরান, খ. ৫, পৃ. ৪৮৫; আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*, পৃ. ৭২; ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ২৮৮।

৪৪২. বনি দামরাহ গোত্র : আদনান বংশোদ্ভূত একটি আরব গোত্র। মদিনার পশ্চিম দিকে ওয়াদান এলাকায় তারা বসবাস করত।

৪৪৩. ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৩, পৃ. ১৪৩।

৪৪৪. ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ২৭২।

ইসলামি মৈত্রীচুক্তির আরেকটি উদাহরণ হলো উমর ইবনুল খাত্তাব রা. কর্তৃক ইলিয়ার (বাইতুল মুকাদ্দাসের) অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধি।[৪৪৫]

এ সকল চুক্তি ও অন্যান্য চুক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিমরা তাদের চারপাশের প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রশান্ত ও স্বস্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করার চেষ্টা করেছে। তারা কখনোই যুদ্ধের চেষ্টা করেনি, বরং সর্বদাই শান্তিকে যুদ্ধের ওপর এবং মিল-মুহাব্বতকে ঝগড়া-বিবাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে।

ইসলাম চুক্তি ও সন্ধির জন্য কিছু শর্ত ও নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, যাতে সেগুলো শরিয়ত ও যে উদ্দেশ্যে শরিয়ত প্রবর্তিত হয়েছে তার অনুকূল হয়।

আল-ইমামুল আকবার শাইখ মাহমুদ শালতুত রহ.[৪৪৬] বলেছেন, ইসলাম মুসলিমদের জন্য তাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে সন্ধি ও চুক্তি করার অধিকার প্রদানের পাশাপাশি তা শুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত দিয়েছে। শর্ত তিনটি নিম্নরূপ :

প্রথম শর্ত : চুক্তিতে ইসলামের মৌলিক আইন ও তার সর্বজনীন শরিয়ত লঙ্ঘিত হবে না। সর্বজনীন শরিয়তের কারণেই ইসলামি স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান রয়েছে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য রয়েছে, তিনি বলেন,

«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»

যেকোনো শর্ত, যা আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল।[৪৪৭]

---

৪৪৫. চুক্তিটির শর্তসমূহ ও বক্তব্য জানতে দেখুন, তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৪৪৯-৪৫০।

৪৪৬. মাহমুদ শালতুত (১৩১০-১৩৮৩ হি./১৮৯৩-১৯৬৩ খ্রি.) : মিশরীয় ফকিহ ও মুফাসসির। বুহাইরায় জন্ম এবং আল-আযহারে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। শরিয়া অনুষদের ডিন ছিলেন। পরবর্তী সময়ে (১৯৫৮ খ্রি.) শাইখুল আযহার মনোনীত হন। মৃত্যু পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন।

৪৪৭. *বুখারি*, কিতাব : আশ-শুরুত, বাব : আল-মাকাতিবু ওয়া মা লা ইয়াহিল্লু মিনাশ-শুরুতিললাতি তুখালিফু কিতাবাল্লাহ, হাদিস নং ২৫৮৪; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ইত্ক, বাব : ইনমাউল ওয়ালা লি-মান আতাকা, হাদিস নং ১৫০৪; *ইবনে মাজাহ*, আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ২৫২১।

তার অর্থ এই যে, আল্লাহর কিতাব যেসব শর্ত প্রত্যাখ্যান করে বা স্বীকার করে না সেগুলো বাতিল।

এই শর্তের মধ্য দিয়ে ইসলাম এমন চুক্তির বৈধতা স্বীকার করেনি যার ফলে ইসলামের স্বতন্ত্র সত্তা ঝুঁকির মুখে পড়ে এবং শত্রুদের জন্য ইসলামের বিভিন্ন দিকের ওপর আক্রমণ করার দরজা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। অথবা মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে ও তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে তাদের শক্তি দুর্বল করে দেয়।

২. **দ্বিতীয় শর্ত :** চুক্তির ভিত্তি হবে উভয় পক্ষের সম্মতি। উভয় পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে চুক্তি লিখিত হবে না। এই শর্তের আলোকে ইসলামে এমন চুক্তির কোনো মূল্য নেই যার ভিত্তি হলো জোরজবরদস্তি, প্রতাপ ও ষড়যন্ত্র। প্রত্যেক চুক্তির স্বভাবই এই শর্তটি নির্দেশ করে। যেকোনো পণ্যের বিনিময় চুক্তিতে ক্রয় বা বিক্রয়ে অবশ্যই (উভয় পক্ষের) সম্মতি থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾

কিন্তু তোমাদের পরস্পর সম্মত হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।[৪৪৮]

তাহলে কীভাবে সম্মতি ব্যতিরেকে সন্ধি ও মৈত্রীচুক্তি বৈধ হবে? অথচ তা উম্মাহর জীবন ও মৃত্যুর চুক্তি।

৩. **তৃতীয় শর্ত :** চুক্তির উদ্দেশ্যগুলো হবে স্পষ্ট এবং রূপরেখা হবে পরিষ্কার। কর্তব্যাবলি ও অধিকারসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে, যাতে কোনো অপব্যাখ্যার বা শর্ত লঙ্ঘনের বা শব্দ নিয়ে ছিনিমিনির সুযোগ না থাকে। সভ্য হয়ে ওঠা রাষ্ট্রগুলো, যারা দাবি করে যে তারা শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে, তাদের চুক্তিসমূহ যে ব্যর্থতা ও অকৃতকার্যতার শিকার হয়েছে এবং ধারাবাহিক বিশ্ব-বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে, তা উপর্যুক্ত পন্থা অবলম্বনের ফলেই হয়েছে। অর্থাৎ, চুক্তির রূপদানে ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এ ধরনের চুক্তির ব্যাপারে সতর্ক করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

৪৪৮. সুরা নিসা : আয়াত ২৯।

﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ أَيْمَـٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا۟ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾

পরস্পর প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না, করলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে।[৪৪৯]

এখানে (دَخَلًا) দাখাল-এর অর্থ হলো নিপুণ প্রতারণা। যে কাজেই এমন প্রতারণা থাকে তা ফলপ্রসূ হয় না।[৪৫০]

চুক্তি রক্ষা করার আবশ্যকতার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহে জোরালো বক্তব্য এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকার পূরণ করো।[৪৫১]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟﴾

তোমরা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করো।[৪৫২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا﴾

এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ করো, নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।[৪৫৩]

---

৪৪৯. সুরা নাহল : আয়াত ৯৪।
৪৫০. তাওফিক আলি ওয়াহবাহ, *আল-মুআহাদাতু ফিল ইসলাম*, পৃ. ১০০-১০১।
৪৫১. সুরা মায়িদা : আয়াত ১।
৪৫২. সুরা আনআম : আয়াত ১৫২।
৪৫৩. সুরা ইসরা বা বনি ইসরাইল : আয়াত ৩৪।

এগুলো ছাড়াও বহু আয়াত রয়েছে যা দৃঢ়ভাবে চুক্তি রক্ষার নির্দেশ দেয়।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু হাদিসও রয়েছে। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا»

চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে পাক্কা মুনাফিক। স্বভাব চারটি এই : এক. সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে; দুই. সে ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে; তিন. যখন সে চুক্তি করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে; এবং চার. যখন কারও সঙ্গে কলহ করে, অশ্লীল ব্যবহার করে। যার মধ্যে এই চারটি স্বভাবের একটি থাকবে তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাব থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিহার করে।[৪৫৪]

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের একটি করে নিশানা থাকবে।[৪৫৫]

এই হাদিসও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَه حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُه أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ»

---

৪৫৪. *বুখারি*, কিতাব : আল-জিযয়া ওয়াল-মুওয়াদাআ, বাব : ইসমু মান আহাদা সুম্মা গাদারা, হাদিস নং ৩০০৭; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : বায়ানু খিসালিল-মুনাফিক, হাদিস নং ৫৮।

৪৫৫. *বুখারি*, কিতাব : আল-জিযয়া ওয়াল-মুওয়াদাআ, বাব : ইসমুল গাদির লিল-বাররি ওয়াল-ফাজির, হাদিস নং ৩০১৫; *মুসলিম*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : তাহরিমুল-গাদর, হাদিস নং ১৭৩৫।

যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তার উচিত সে যেন তা ভঙ্গও না করে এবং তা শক্তও না করে, যে পর্যন্ত না চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। অথবা প্রতিপক্ষকে স্পষ্টভাবে চুক্তিভঙ্গের সংবাদ জানিয়ে না দেয়।[৪৫৬]

(অর্থাৎ, প্রতিপক্ষকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবে যে, আমাদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল এখন থেকে তা আর অবশিষ্ট থাকল না।)

সুনানে আবু দাউদে রয়েছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

যে ব্যক্তি এমন কোনো লোকের ওপর জুলুম করে, যার সঙ্গে তার সন্ধি হয়েছে, অথবা তার কোনোপ্রকার ক্ষতি সাধন করে অথবা সাধ্যের অতিরিক্ত তাকে কষ্ট দেয় কিংবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তার কাছ থেকে কোনো জিনিস আদায় করে, কিয়ামতের দিন আমি (এমন মাজলুমের পক্ষ থেকে) প্রতিবাদ করব।[৪৫৭]

ফকিহগণ যদিও মনে করেন যে আমির সৎ হোক বা পাপী, তার নেতৃত্বে জিহাদ করা যায়, কিন্তু তাদের অধিকাংশই এই মত পোষণ করেন যে, যে আমির চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে দায়িত্বশীল নন বা তা গুরুত্বের সঙ্গে নেন না; তার নেতৃত্বে জিহাদ করা যায় না। যদিও তা আধুনিক সভ্যতায় রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপন্থী। কারণ অবস্থার পরিবর্তনের ফলে চুক্তি ভঙ্গ করা বৈধ হবে না। মুসলিমরা যদি বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে তাদের নিজেদের কর্তব্য পালনে অক্ষম হয়ে পড়ে, তাদের জন্য আবশ্যক হবে অপর পক্ষের কর্তব্যসমূহের প্রতি সযত্ন থাকা।

---

৪৫৬. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-জিহাদ, আল-ইমাম ইয়াকুনু বাইনাহু ওয়া বাইনাল আদুওবি আহদ, হাদিস নং ২৭৫৯; *তিরমিযি*, আমর ইবনে আবাসা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ১৫৮০; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৯৪৫৫।

৪৫৭. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-খারাজ, বাব : তা'শিরু আহলিল জিম্মাহ ইযাখতালাফু বিত-তিজারাত, হাদিস নং ৩০৫২।

এই প্রসঙ্গে একটি বিখ্যাত ঘটনা বর্ণনা করা যায়। মুসলিম সেনাপতি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. হিমস জয় করে নিলেন, সেখানকার অধিবাসীদের থেকে জিযয়াও গ্রহণ করলেন। পরে তিনি হিমস ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন। এজন্য হিমসের বাসিন্দাদের থেকে যে জিযয়া গ্রহণ করেছিলেন তা ফিরিয়ে দিলেন। তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, আমরা তোমাদের মাল ফিরিয়ে দিলাম। কারণ আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, বিশাল সেনাবাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য সমবেত হয়েছে। তোমরা আমাদের ওপর শর্ত দিয়েছিলে যে আমরা তোমাদের রক্ষা করব; কিন্তু আমরা তা পারলাম না...। তাই তোমাদের থেকে যা গ্রহণ করেছিলাম তা ফিরিয়ে দিলাম। তোমরা আমাদের যেসব শর্ত দিয়েছ তা মান্য করব এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যা লিখিত হয়েছে তা পালন করব, যদি আল্লাহ আমাদের তাদের ওপর বিজয়ী করেন।[৪৫৮]

ইসলামি ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। অবস্থার পরিবর্তন ও জাতীয় স্বার্থের ভিন্নতা ইসলামে চুক্তি ভঙ্গকে বৈধ করে না। মুসলিমরা যদি অপর পক্ষের বিপরীতে নিজেদেরকে শক্তিকেন্দ্রে প্রত্যক্ষ করে তবুও চুক্তি ভঙ্গ করা বৈধ হবে না। এ ব্যাপারটিকে জোরালোভাবে সমর্থন করে কুরআনে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾

তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখন পরস্পর অঙ্গীকার করো এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের জামিন করে দৃঢ় শপথ করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন।[৪৫৯]

৪৫৮. আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*, পৃ. ৮১।

৪৫৯. সুরা নাহল : আয়াত ৯১।

এ বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে যে, মুসলিমদের ওপর চুক্তি রক্ষার কঠোর নির্দেশ এসেছে এমন সময়ে ও এমন পরিবেশে যখন চুক্তি রক্ষার কোনো নীতি বা রীতি ছিল না।[৪৬০]

ইসলামি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি রক্ষার জন্য যে-সকল চুক্তি স্বাক্ষর করে তাতে এটাই হলো ইসলামের বিধান। আমরা চুক্তি পালন করতে ও চুক্তির শর্তসমূহ মান্য করতে আদিষ্ট, আমাদের থেকে এটাই চাওয়া হয়েছে। আমাদেরকে চুক্তি ভঙ্গ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে শত্রুরা চুক্তি ভঙ্গ করলে ভিন্ন কথা। কিন্তু যতক্ষণ না তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতা শুরু করবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হলো চুক্তি রক্ষা করা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾

> তবে মুশরিকদের যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করবে।[৪৬১]

শাইখ মাহমুদ শালতুত বলেছেন, চুক্তি রক্ষা করা একটি আবশ্যক দ্বীনি দায়িত্ব। আল্লাহর হক হিসেবে মুসলিমরা এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তা ছাড়া কোনো ধরনের চুক্তি লঙ্ঘন বিশ্বাসঘাতকতা ও খিয়ানত বলে বিবেচিত হবে।[৪৬২]

এসব দিক বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় চুক্তির আইন প্রণয়নে ইসলাম (মুসলিমরা) অন্য সকল জাতি থেকে অগ্রগামী হয়ে আছে। বরং ইনসাফ ও শত্রুর সঙ্গে উদারতা প্রদর্শনে ইসলাম অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই অগ্রগামিতা কেবল দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ছিল না, বরং

---

[৪৬০]. সালেহ ইবনে আবদুর রহমান আল-হুসাইন, *আল-আলাকাতুদ-দাওলিয়্যা বাইনা মানহাজিল-ইসলাম ওয়াল-মানহাজিল হাদারিল মুআসির*, পৃ. ৫১।

[৪৬১]. সুরা তাওবা : আয়াত ৪।

[৪৬২]. মাহমুদ শালতুত, *আল-ইসলাম আকিদাহ ওয়া শারিআহ*, পৃ. ৪৫৭।

প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের শুরু থেকে খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে, তার পরবর্তী ইসলামি যুগসমূহে মুসলিমরা তাদের শত্রুদের সঙ্গে যেসব চুক্তি কার্যকর করেছে তা উপর্যুক্ত বক্তব্যের উজ্জ্বল প্রমাণ।

দূতদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে : এ ব্যাপারে ইসলামি শরিয়ার স্পষ্ট বিধান রয়েছে। দ্ব্যর্থহীন নুসুস ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে যে, কোনো অবস্থাতেই দূতদের হত্যা করা বৈধ নয়। ইসলামি শরিয়ার ফকিহগণ মুসলিমদের ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) জন্য দূতদের নিরাপত্তা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা উপভোগের নিশ্চয়তা ও পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের সুযোগদান বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন।[৪৬৩]

ব্যক্তি হিসেবে দূতের সুরক্ষার অর্থ হলো তাকে বন্দি হিসেবে গ্রেপ্তার করা বৈধ নয়। একইভাবে দূতের অনিচ্ছায় তাকে তার রাষ্ট্রের হাতে রাষ্ট্রের দাবি অনুযায়ী সোপর্দ করা যাবে না, এমনকি দারুল ইসলাম যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হলেও। কারণ তাকে তার রাষ্ট্রের কাছে সোপর্দ করার অর্থ হলো তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। তা ছাড়া সে দারুল ইসলামে নিরাপত্তা ভোগ করছে।[৪৬৪]

দূতের যে দায়িত্ব তা পারস্পরিক সমঝোতায়, চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং যুদ্ধ বন্ধে বড় ভূমিকা পালন করে। এ কারণে তার জন্য সব পথ খোলা থাকা উচিত, তার সব প্রয়োজন পূরণ করা উচিত। এটা কেবল তার ব্যক্তির জন্য নয়, বরং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনের জন্যও। সে তার প্রেরকের প্রতিনিধিত্ব করছে। তার ভিন্ন মত থাকতে পারে; কিন্তু সে এই দায়িত্ব পালনে রাজি হয়েছে। যার কাছে দূত প্রেরণ করা হয়েছে তার এসব অবস্থা বিবেচনায় আনা উচিত।

আবু রাফে রা. থেকে বর্ণিত, একবার (কোনো এক কাজে) কুরাইশরা আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠিয়েছিল। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখতেই ইসলামের সত্যতা ও মহত্ত্ব আমার অন্তরের মধ্যে গেঁথে গেল। ফলে আমি

---

৪৬৩. ইবনে হাযম, আল-মুহাল্লা, খ. ৪, পৃ. ৩০৭।

৪৬৪. আবদুল কারিম যাইদান, আশ-শারিআতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-কানুনুদ দুয়ালিল আম, পৃ. ১৬৯।

বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর কসম! আমি আর তাদের (কুরাইশদের) কাছে কখনো ফিরে যাব না। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«إِنِّي لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلَكِنِ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الآنَ فَارْجِعْ»

আমি চুক্তি ভঙ্গ করতে চাই না এবং কোনো দূতকেও আটক করি না। তবে তুমি এখন চলে যাও। তোমার অন্তরের মধ্যে এখন যা-কিছু আছে (ইসলাম কবুল করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা) তা যদি বহাল থাকে তাহলে আবার ফিরে আসবে।[৪৬৫]

হাইসামি[৪৬৬] তার কিতাব *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*-এ 'দূতদের হত্যায় নিষেধাজ্ঞা' শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন এবং এতে একাধিক হাদিস সংকলন করেছেন। তার মধ্যে এক হাদিস নিম্নরূপ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, যখন ইবনে নাওয়াহা নিহত হলো তখন তিনি বলেছেন,

«جَاءَ ابْنُ النَّوَّاحَةِ وَابْنُ أُثَالٍ رَسُولَا مُسَيْلِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللهِ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا»

ইবনে নাওয়াহা ও ইবনে উসাল নামক দুই ব্যক্তি (নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার) মুসাইলামার দূত হয়ে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন, তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর রাসুল? তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুসাইলামা আল্লাহর

---

৪৬৫. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-জিহাদ, বাব : আল-ইমাম ইয়ুসতাজান্নু বিহি ফিল-উহুদ, হাদিস নং ২৭৫৮; *আহমাদ*, হাদিস নং ২৩৯০৮। শুআইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

৪৬৬. ইবনে হাজার আল-হাইসামি : আবুল হাসান আলি ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান আশ-শাফিয়ি আল-মিসরি, (৭৩৫-৮০৭ হি./১৩৩৫-১৪০৫ খ্রি.)। হাফিযে হাদিস, মুহাদ্দিস। সর্বাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ২৬৬।

রাসুল। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি কোনো দূতকে হত্যা করা আমার নিয়ম থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের হত্যা করতাম।[৪৬৭]

হাইসামি বলেছেন, এই ঘটনার পর থেকে এই রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, দূতকে হত্যা করা যায় না।[৪৬৮]

এভাবে ইসলাম দূতদের জন্য সভ্য মানবিক আইন প্রণয়নে পশ্চিমা সমাজগুলো থেকে চৌদ্দশ বছর এগিয়ে রয়েছে। ওইসব সমাজ নিকট অতীতকালেও এসব আইন ও নীতি স্বীকার করেনি![৪৬৯]

---

৪৬৭. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-জিহাদ, বাব : আর-রুসুল, হাদিস নং ২৭৬১; *আহমাদ*, হাদিস নং ৩৭০৮। শুআইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। *দারেমি*, হাদিস নং ২৫০৩। হুসাইন সালিম আসাদ বলেছেন, হাদিসটির সনদ হাসান, কিন্তু হাদিসটি সহিহ।

৪৬৮. *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, খ. ৫, পৃ. ৩৭৮।

৪৬৯. সুহাইল হুসাইন আল-কাতলাবি, *দিবলুমাসিয়্যাতুন-নাবিয়্যি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : দিরাসাহ মুকারানাহ বিল-কানুনিদ দাওলিল মুআসির*, পৃ. ১৮২।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৮. ইসলামে যুদ্ধের কারণ ও উদ্দেশ্য

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, ইসলামে শান্তিই মূলনীতি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের শিক্ষা দিয়েছেন, দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, তাদের উদ্দেশে বলেছেন,

«لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ»

তোমরা শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা কামনা করো না এবং আল্লাহর কাছে স্বস্তি প্রার্থনা করো।[৪৭০]

মুসলিম কুরআনুল কারিম ও নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহের মধ্য দিয়ে যে তরবিয়ত ও নৈতিক শিক্ষা পেয়েছে তাতে স্বাভাবিকভাবেই সে হত্যা ও রক্তপাত অপছন্দ করে। এ কারণেই তারা কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে না। বরং তারা যুদ্ধ ও রক্তপাত এড়ানোর জন্য সর্ব পন্থায় সর্বাত্মক চেষ্টা করে। কুরআনুল কারিমের আয়াতসমূহ এ বিষয়টিকে জোরালোভাবে প্রমাণ করে। কিতাল বা যুদ্ধের অনুমোদন তখনই দেওয়া হয়েছে যখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা হয়েছে। সে সময় নিজেদের জান ও দ্বীন বাঁচানো অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। তা না করা হলে চরিত্রে ভীরুতার কলঙ্ক লাগত, মনোবল নিস্তেজ হয়ে পড়ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ○ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ﴾

---

৪৭০. *বুখারি*, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : কানান-নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইযা লাম ইয়ুকাতিল আওয়ালান নাহারি আখখারাল কিতাল হাত্তা তাযুলাশ শামস, হাদিস নং ২৮০৪; *মুসলিম*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : কারাহিয়াতু তামান্নি লিকাআল-আদুওবি ওয়াল-আমর বিস-সাবরি ইনদাল লিকা, হাদিস নং ১৭৪২।

> যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয় তাদের সাহায্য করতে সক্ষম, তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।[৪৭১]

আয়াতের কিতাল বা যুদ্ধের কারণ স্পষ্ট। তা এই যে, মুসলিমদের ওপর জুলুম করা হয়েছে এবং তাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

> যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।[৪৭২]

কুরতুবি বলেছেন, এটিই প্রথম আয়াত যা কিতালের নির্দেশের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এতে কোনো মতবিরোধ নেই যে, হিজরতের পূর্বে কিতাল নিষিদ্ধ ছিল। তার দলিল হলো আল্লাহর এই বাণী,

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা।[৪৭৩]

এবং আল্লাহর বাণী,

﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ﴾

সুতরাং তাদের ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো।[৪৭৪]

---

৪৭১. সুরা হজ : আয়াত ৩৯-৪০।
৪৭২. সুরা বাকারা : আয়াত ১৯০।
৪৭৩. সুরা হা-মিম আস-সাজদা : আয়াত ৩৪।
৪৭৪. সুরা মায়িদা : আয়াত ১৩।

অনুরূপ যত আয়াত মক্কায় নাযিল হয়েছে তাও এর দলিল। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরতের পর কিতালের নির্দেশ পান।[৪৭৫]

লক্ষণীয় যে, এখানে যুদ্ধের নির্দেশ এসেছে কেবল তাদেরই প্রতিহত করার জন্য যারা মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছে। যারা যুদ্ধে জড়ায়নি তাদের ব্যাপারে যুদ্ধের নির্দেশ আসেনি। ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾—'কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না' এই নিষেধাজ্ঞার দ্বারা এটাই দৃঢ়ভাবে বোঝানো হয়েছে।

তারপর মুমিনদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।[৪৭৬]

আল্লাহ তাআলা সীমালঙ্ঘন পছন্দ করেন না, তা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে হলেও। এতে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার পথ সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছে। এটা বিশ্ব-মানবতার প্রতি বড় দয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾

তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করো যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে।[৪৭৭]

এখানে কিতাল শর্তযুক্ত, আমাদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সেনাসমাবেশ ও যুদ্ধ অনুযায়ীই তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সেনাসমাবেশ ও যুদ্ধ হবে।[৪৭৮] আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে লড়াই করার কারণ হলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সর্বাত্মকভাবে লড়াই করা। সুতরাং মুসলিমদের জন্য স্পষ্ট কারণ ব্যতীত যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ নয়। যেমন মুসলিমদের সম্পদ লুণ্ঠন করা, তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া, অথবা কারও প্রতি জুলুম করা।

---

৪৭৫. কুরতুবি, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১, পৃ. ৭১৮।
৪৭৬. সুরা বাকারা : আয়াত ১৯০।
৪৭৭. সুরা তাওবা : আয়াত ৩৬।
৪৭৮. কুরতুবি, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৪, পৃ. ৪৭৪।

মুসলিমরা এই জুলুম দূর করতে চাইবে। অথবা, মুশরিকরা যদি মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন প্রচারে বাধা দেয় এবং এই দ্বীন অন্য কারও কাছে পৌছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহলেও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে।

পূর্বোক্ত আয়াতের মতো আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

> তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসুলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় করো? আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন যদি তোমরা মুমিন হও।[৪৭৯]

'যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মক্কার কাফেররা। তাদের কারণে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। তাই বের করার বিষয়টি তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মদিনা থেকে বের করে এনেছিল। হাসান বসরি রহ. উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ﴿وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾—'তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।' অর্থাৎ, তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। তারা বনু খুযাআর বিরুদ্ধে বনু বকরকে সাহায্য করেছে। কেউ বলেছেন, বদরের দিন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবসায়িক কাফেলার উদ্দেশে বেরিয়েছিলেন। তারা কাফেলাকে যখন নিরাপদ ও অক্ষত পেল, তারা মক্কায় চলে যেতে পারত। কিন্তু তারা বদরে পৌছে সেখানে মদ পান করার জন্য গোঁ ধরে...। কেউ বলেছেন, তাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বের করে দেওয়ার

---

৪৭৯. সুরা তাওবা : আয়াত ১৩।

অর্থ এই যে, তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হজ, ওমরা ও তাওয়াফ করতে বাধা দিয়েছিল। এভাবে তারা বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেছিল।[৪৮০]

কখন তারা শুরু করেছিল তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলা যায় যে, মুসলিমদের কাছে কিতাল বা যুদ্ধের কারণ স্পষ্ট। তা এই যে, তাদের শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল।

এসব কারণেই মুসলিমদের যুদ্ধ করতে হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে মুসলিমরা যে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছিল তা এ কথারই সত্যায়ন করে। মুসলিমরা দেশ বিজয়ে প্রথমে লড়াই শুরু করেনি এবং বিজিত দেশের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি। মুশরিকদের মধ্যে যারা তাদের মোকাবিলা করেছে তাদের সবাইকে হত্যাও করেনি। মুসলিমরা কেবল বিজিত দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছে। অন্য মুশরিকদের তাদের ধর্মীয় শান্ত অবস্থাতেই থাকতে দিয়েছে।

আমরা দেখি যে, যুদ্ধের এসব কারণ ও হেতুকে কোনো লেখকই অস্বীকার করেননি। কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তিও এ ব্যাপারে কোনো অভিযোগ তোলেননি। কারণ শত্রুদের প্রতিহত করা এবং জানমাল, পরিবার-পরিজন, স্বদেশ ও দ্বীন রক্ষার্থেই এমন যুদ্ধ করতে হয়। যে-সকল মুমিনকে কাফেররা তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে তাদের দ্বীন ও বিশ্বাসের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানও যুদ্ধের অন্যতম কারণ। দাওয়াতের সুরক্ষাও জরুরি, যাতে সকল মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া যায়। শেষে চুক্তি ভঙ্গকারীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যও যুদ্ধ জরুরি।[৪৮১] দুনিয়াতে কে আছে যে যুদ্ধের এ সকল কারণ ও উদ্দেশ্য অস্বীকার করতে পারবে?

---

৪৮০. কুরতুবি, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৪, পৃ. ৪৩৪।
৪৮১. আনওয়ার আল-জুনদি, *বি-মাযা ইনতাসারাল মুসলিমুন*, পৃ. ৫৭-৬২।

ঘ. ইসলামে যুদ্ধের নৈতিকতা

শান্তির সময়ে সব জাতিই সচ্চরিত্রতা, সহানুভূতি, দুর্বলের প্রতি দয়া, প্রতিবেশী ও নিকটজনদের সঙ্গে উদার আচরণ অবলম্বন করতে পারে, এমনকি বর্বর ও অসভ্য হলেও। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে সদাচার, শত্রুর প্রতি সহানুভূতিশীলতা, নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের প্রতি দয়া, পরাজিতদের প্রতি উদারতা অবলম্বন সব জাতি করতে পারে না। সব যুদ্ধকালীন সেনাপতি এসব গুণে গুণান্বিত হতে পারে না। রক্তের দৃশ্যমানতা রক্তকে টগবগিয়ে তোলে। শত্রুতা বিদ্বেষ, ক্রোধ ও ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। বিজয়ের নেশা বিজয়ীদের মাতাল করে ফেলে। ফলে তারাও প্রতিশোধ নেওয়ার বিভিন্ন বীভৎস পন্থা অবলম্বন করে। এটিই পৃথিবীর প্রাচীন কালের ও আধুনিক কালের ইতিহাস। বরং কাবিল কর্তৃক তার ভাই হাবিলের রক্তপাত ঘটানো থেকে শুরু করে এটাই মানবজাতির ইতিহাস। কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে,

﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

> যখন তারা উভয়ে কুরবানি করেছিল (আল্লাহর দরবারে কুরবানির বস্তু পেশ করেছিল।) তখন একজনের কুরবানি কবুল হলো এবং অন্যজনের (কুরবানি) কবুল হলো না। (যার কুরবানি কবুল হলো না) সে বলল, আমি তোমাকে হত্যা করবই। অপরজন বলল, অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকিদের কুরবানি কবুল করেন।[৪৮২]

এখানেই ইতিহাস আমাদের সভ্যতার সামরিক ও বেসামরিক নায়কদের এবং বিজয়ী ও শাসক নেতৃবৃন্দের মস্তকে অমরত্বের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

---

৪৮২. সুরা মায়িদা : আয়াত ২৭।

কারণ তারা অন্য সব সভ্যতার মহামতিদের থেকে অনন্য, তারা বিভীষিকাপূর্ণ যুদ্ধেও এবং প্রতিশোধ, জিঘাংসা ও রক্তপাতে প্ররোচনা দানকারী উত্তেজক সময়েও ইনসাফপূর্ণ মানবিকতা ও মহানুভবতা প্রদর্শন করেছেন। আমি হলফ করছি, ইতিহাস যদি যুদ্ধকালীন নৈতিকতার ইতিবৃত্তে এসব অলৌকিক ঘটনার বিবরণ সত্যতার সঙ্গে উপস্থিত না করত, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তাহলে অবশ্যই আমি বলতাম এগুলো রূপকথা ও কল্পকাহিনি ছাড়া কিছু নয়, যার ছায়া পর্যন্ত দুনিয়াতে নেই।[৪৮৩]

ইসলামে শান্তিই মূলনীতি এবং ইসলামে কিছু কারণ ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে যুদ্ধের বৈধতা দেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা তা উল্লেখ করেছি। একইভাবে ইসলাম যুদ্ধকে শর্তহীন বা নীতিহীন রাখেনি। যুদ্ধকে তার সঙ্গে জুড়ে থাকা নানা ঘটনা থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নীতিমালা প্রস্তুত করেছে। এভাবে যুদ্ধবিগ্রহকে নৈতিকতামণ্ডিত করেছে, যুদ্ধে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগ রাখেনি। ইসলাম সীমালঙ্ঘনকারী ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী জালিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈধতা দিয়েছে, শান্তিকামী নিরপরাধ মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈধতা দেয়নি। যুদ্ধকালীন নৈতিক শর্তাবলির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের হত্যা করা নিষিদ্ধ : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের সেনাপতিদের তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা আল্লাহ তাআলার পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। এভাবে তাদের যুদ্ধকালীন নীতি-আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাপতিদের শিশুহত্যা পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোনো সেনাদলের বা যুদ্ধাভিযানের আমির মনোনীত করেছেন, তাকে বিশেষভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের এবং তার সঙ্গে যে-সকল মুসলিম রয়েছে তাদের কল্যাণকামী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সেনাপতিদের উদ্দেশে যা বলতেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো,

«وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا...»

---

[৪৮৩]. মুস্তফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৭৩।

এবং কোনো শিশুকে হত্যা করো না...।[৪৮৪]

আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً وَلاَ صَغِيرًا وَلاَ امْرَأَةً...»

(সাবধান!) অতিবৃদ্ধ, ছোট শিশু এবং কোনো নারীকে হত্যা করো না...।[৪৮৫]

২. **উপাসকদের হত্যা নিষিদ্ধ :** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সেনাদের প্রেরণ করার সময় তাদের বলতেন,

«لَا تَقْتُلُوا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ»

উপাসনালয়ে যারা রয়েছে তাদের হত্যা করো না।[৪৮৬]

মুতার উদ্দেশে প্রেরিত সেনাবাহিনীর প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ নির্দেশ ছিল নিম্নরূপ,

«اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اُغْزُوا وَ لاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُوْا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا، أوِ امْرَأَةً وَلاَ كَبِيرًا فَانِيًا وَلا مُنْعَزِلاً بِصَوْمَعَةٍ»

তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধে বের হও, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যুদ্ধলব্ধ সম্পদে খিয়ানত করো না, প্রতারণা করো না, মৃতদেহের বিকৃতি সাধন করো না, কোনো শিশুকে, নারীকে, অতিবৃদ্ধকে হত্যা করো না, উপাসনালয়ে আশ্রয় গ্রহণকারী কাউকে হত্যা করো না।[৪৮৭]

---

[৪৮৪]. *মুসলিম*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : তা'মির আল-ইমাম আল-উমারা আলাল-বুউস ওয়া ওয়াসিয়্যাতিহি ইয়্যাহুম বি-আদাব আল-গাযবি ওয়া গাইরুহু, হাদিস নং ১৭৩১।

[৪৮৫]. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-জিহাদ, বাব : দুআ আল-আদুওবি, হাদিস নং ২৬১৪; ইবনে আবি শাইবা, খ. ৬, পৃ. ৪৮৩; বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১৭৯৩২।

[৪৮৬]. *আহমাদ*, হাদিস নং ২৭২৮; আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*, পৃ. ২১২।

[৪৮৭]. ইমাম মুসলিম হাদিসটি আহলে মুতার ঘটনা উল্লেখ করা ছাড়াই তার *জামে সহিহে* সংকলন করেছেন। কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : তা'মিরুল ইমামিল উমারা আলাল বুউস ওয়া ওয়াসিয়্যাতিহি ইয়্যাহুম বি-আদাবিল গাযবি ওয়া গাইরুহু, হাদিস নং ১৭৩১; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৬১৩; *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৪০৮; *বাইহাকি*, হাদিস নং ১৭৯৩৫।

৩. **প্রতারণা নিষিদ্ধ :** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাভিযান প্রেরণ করতেন সেনাদের প্রতি এই নির্দেশ দিয়ে,

«وَلاَ تَغْدِرُوا»

তোমরা প্রতারণা করো না।[৪৮৮]

এই বিশেষ নির্দেশ মুসলিমদের সঙ্গে মুসলিমদের আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ছিল না। বরং যে শত্রুরা তাদের জন্য ওত পেতে আছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সমবেত হয়েছে এবং তারা যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের প্রতারণা না করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে! এ বিষয়টির গুরুত্ব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এত বেশি ছিল যে, তিনি নিজেকে প্রতারকদের থেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেছেন। এমনকি প্রতারক মুসলিম হলেও এবং প্রতারিত কাফের হলেও। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَمَّنَ رَجُلا عَلَى دَمِهِ فَأَنَا بَرِيءٌ مِّنَ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا»

কেউ কাউকে রক্তের (হত্যা না করার) নিরাপত্তা দেওয়ার পর তাকে হত্যা করলে আমি ওই হত্যাকারী থেকে দায়মুক্ত, নিহত ব্যক্তি কাফের হলেও।[৪৮৯]

ওয়াদা রক্ষা ও প্রতিশ্রুতি পূরণের মূল্য সাহাবিদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তার শাসনামলে একবার শুনলেন যে, একজন মুজাহিদ প্রতিপক্ষের এক অশ্বারোহী যোদ্ধাকে নিরাপত্তা দিয়ে বললেন, তোমার কোনো ভয় নেই। তারপর তাকে হত্যা করলেন। উমর রা. ওই বাহিনীর সেনাপতিকে লিখলেন, আমার নিকট খবর এসেছে যে, তোমাদের কোনো কোনো লোক কাফেরদের অনুসন্ধানে থাকে কোনো কাফের যখন পাহাড়ে পলায়ন করে ও নিজেকে রক্ষা করার

---

৪৮৮. *মুসলিম*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : তা'মিরুল ইমামিল উমারা আলাল বুউস, হাদিস নং ১৭৩১; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৬১৩; *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৪০৮; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২৮৫৭।

৪৮৯. বুখারি, *আত-তারিখুল কাবির*, খ. ৩, পৃ. ৩২২; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫৯৮২; *বাযযার*, হাদিস নং ২৩০৮; তাবারানি, *আল-কাবির*, হাদিস নং ৬৪ এবং *আস-সাগির*, হাদিস নং ৩৮; তায়ালিসি, *মুসনাদ*, হাদিস নং ১২৮৫; আবু নুআইম, *হিলয়াতুল আওয়ালিয়া*, খ. ৯, পৃ. ২৪, রিফাআ ইবনে শাদ্দাদ থেকে আস-সুদ্দির সূত্রে বর্ণিত।

চেষ্টা করে, সে তাকে বলে, ভয় পেয়ো না। কিন্তু হাতের নাগালে পাওয়ামাত্র তাকে হত্যা করে ফেলে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আমার কাছে কেউ এমন কাজ করেছে বলে যেন খবর না আসে। তাহলে আমি তার শিরশ্ছেদ করব।[৪৯০]

৪. জমিনে অরাজকতা সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ : মুসলিমদের যুদ্ধ ধ্বংসাত্মক ছিল না, দুনিয়াটাকে বিরান করার জন্য ছিল না। অথচ এখনকার যুদ্ধগুলো এই উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। অমুসলিম যুদ্ধবাজরা প্রতিপক্ষের জীবনের সবকিছু তছনছ করে দিতে বদ্ধপরিকর। মুসলিমরা বরং সব জায়গায় জনপদ ও জনপদবাসীদের রক্ষা করতে দৃঢ় ইচ্ছুক ছিলেন, এমনকি তা তাদের শত্রুদের দেশে হলেও। আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর বক্তব্য থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। শামের উদ্দেশে প্রেরিত সেনাবাহিনীকে তিনি যে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন,

«لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ»

তোমরা জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না।

এ বিষয়টি সকল প্রশংসনীয় কাজের ধারক। ফ্যাসাদ সৃষ্টি না হলে সবকিছু ঠিকঠাক সুন্দর থাকে। তাঁর আরও নির্দেশ ছিল,

«وَلَا تُغْرِقُنَّ نَخْلًا وَلَا تُحْرِقُنَّهَا، وَلَا تَعْقِرُوا بَهِيمَةً، وَلَا شَجَرَةً تُثْمِرُ وَلَا تَهْدِمُوا بَيْعَةً»

তোমরা খেজুরগাছ কেটো না, জ্বালিয়ে দিয়ো না; কোনো চতুষ্পদ জন্তুর পা কেটে দিয়ো না; কোনো ফলদার গাছ কেটো না, কোনো উপাসনালয় ধ্বংস করো না।[৪৯১], [৪৯২]

---

৪৯০. *আল-মুআত্তা*, ইয়াহইয়া আল-লাইসি থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ৯৬৭; বাইহাকি, *মা'রিফাস সুনান ওয়াল-আসার*, হাদিস নং ৫৬৫২।

৪৯১. বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১৭৯০৪; তাহাবি, *শারহু মুশকিলিল আসার*, খ. ৩, পৃ. ১৪৪; ইবনে আসাকির, *তারিখে দিমাশক*, খ. ২, পৃ. ৭৫।

৪৯২. তবে মুসলিমের ১৭৪৬ নং বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, উবনে উমর রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু নাযিরের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে কাফেরদের গাছ জ্বালিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকার বক্তব্য চূড়ান্ত নয়। এ কারণে ফকিহদের মাঝেও এ বিষয়ে ভিন্ন দুটি মত পাওয়া যায়।-সম্পাদক

জমিনে ফ্যাসাদ ও অরাজকতা সৃষ্টি না করার বিশেষ নির্দেশ প্রদানের উদ্দেশ্য যে কী তা উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট। অর্থাৎ, সেনাপতি যেন এ কথা মনে না করে যে, কোনো জাতির প্রতি শত্রুতার ফলে কোনো ধরনের অরাজকতা বৈধ হয়ে গেছে। কারণ অরাজকতা তার যত ধরন ও রূপ আছে সবসহ ইসলামে প্রত্যাখ্যাত ও নিষিদ্ধ।

৫. বন্দিদের জন্য খরচ করা : বন্দিদের জন্য খরচ করা এবং তাদের সহায়তা করার ফলে মুসলিমরা সওয়াবের হকদার হবে। কারণ, বন্দিরা দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত এবং পরিবার-পরিজন ও নিজেদের জাতি-গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন। তাদের সহায়তা প্রাপ্তির প্রয়োজন তীব্র। কুরআনুল কারিম বন্দিদের প্রতি সদাচার ও অনুগ্রহকে এতিম ও মিসকিনদের প্রতি সদাচার ও অনুগ্রহের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

আহারের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা মিসকিন, এতিম ও বন্দিকে আহার দান করে।[৪৯৩]

৬. মৃতদেহের বিকৃতি সাধন বা বিকলাঙ্গ করা নিষিদ্ধ : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃতদেহের বিকৃতি সাধন করতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ»

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিনতাই করতে ও জীবকে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন।[৪৯৪]

ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ»

---

৪৯৩. সুরা আদ-দাহর : আয়াত ৮।

৪৯৪. *বুখারি*, কিতাব : আল-মাযালিম, বাব : আন-নুহবা মিন গাইরি ইযনি সাহিবিহি, হাদিস নং ২৩৪২; তায়ালিসি, *মুসনাদ*, হাদিস নং ১০৭০; বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১৪৪৫২।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সদকা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং (কোনো জীবকে) বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করতেন।[৪৯৫]

উহুদের যুদ্ধে মুশরিকরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হামযার মৃতদেহের বিকৃতি সাধন করেছিল, তারপরও তিনি তাঁর নীতি-আদর্শ পরিবর্তন করেননি। বরং তিনি মুসলিমরা যেন শত্রুদের মৃতদেহের বিকৃতি না ঘটায় তার জন্য তাদের উদ্দেশে ভয়ংকর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ وَمُمَثِّلٌ مِنَ الْمُمَثِّلِينَ»

কিয়ামতের দিন যারা সবচেয়ে কঠিন শাস্তি পাবে তারা হলো : এক. যে লোককে কোনো নবী হত্যা করেছেন, দুই. যে লোক কোনো নবীকে হত্যা করেছে, তিন. পথভ্রষ্ট ইমাম (যে অন্যদের পথভ্রষ্ট করে) এবং চার. দেহের বিকৃতি সাধনকারী।[৪৯৬]

মুসলিমরা তাদের কোনো শত্রুকে বিকলাঙ্গ করেছিলেন বলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনেতিহাসে একটি ঘটনাও বর্ণিত হয়নি।

মুসলিমদের কাছে এগুলোই হলো যুদ্ধের নীতি। এসব নীতির ফলে বিবাদের সময়ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় না, আচার-আচরণে ইনসাফ ব্যাহত হয় না এবং যুদ্ধে ও যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মানবিকতা অটুট থাকে।

---

৪৯৫. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-জিহাদ, বাব : আন-নাহয়ু আনিল-মুসলাহ, হাদিস নং ২৬৬৭; *আহমাদ*, হাদিস নং ২০০১০; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫৬১৬; আবদুর রাজ্জাক, *মুসনাদ*, হাদিস নং ১৫৮১৯।

৪৯৬. *আহমাদ*, হাদিস নং ৩৮৬৮, শুআইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ১০৪৯৭; বাযযার, *মুসনাদ*, হাদিস নং ১৭২৮।

তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞান-সংস্থা

ইসলামি সভ্যতা বিশ্বের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা ও সংস্থা উপহার দিয়েছে। এসব ব্যবস্থা ও সংস্থা কর্মনৈপুণ্যে, শৃঙ্খলায় ও মানবজাতিকে যা-কিছু নতুন তা উপহারদানে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইসলামি জ্ঞান-সংস্থা ইসলামি সভ্যতার অন্যতম আলোকোজ্জ্বল কীর্তি। পরিকল্পনায় ও ব্যবস্থাপনায় যেমন, তেমনই অনুশীলন ও প্রায়োগিক দিক থেকেও। তাই এই গৌরবদীপ্ত জ্ঞান-সংস্থা প্রসঙ্গে একটি অধ্যায় রচনা করা আমাদের জন্য আবশ্যক। নিম্নবর্ণিত পরিচ্ছেদগুলোতে তা বিবৃত হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম এবং জ্ঞানের নতুন দর্শন

ইসলামপূর্ব যুগে বিশ্ব কয়েকটি সভ্যতা পেয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল অবদানের জন্য এসব সভ্যতা বিখ্যাত হয়ে আছে। যেমন রোমান সভ্যতা, পারস্যসভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা ইত্যাদি। তবে ইসলাম জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে মৌলিক নীতি ও তাৎপর্য যোগ করেছে তা জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি বিশ্বের দর্শনে রূপান্তর ঘটিয়েছে। নিম্নবর্ণিত দুটি অনুচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : জ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিরোধ নেই
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : জ্ঞান সবার জন্য

প্রথম অনুচ্ছেদ

জ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিরোধ নেই

জিবরাইল আলাইহিস সালাম প্রথম যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নাযিল হলেন তখন যে সত্য প্রতিভাত হলো তা চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দিলো যে, নতুন দ্বীন (ইসলাম)-এর ভিত্তি হলো জ্ঞান। এখানে কোনোভাবেই ভ্রান্তি ও সন্দেহের কোনো স্থান নেই। ওহিরূপে প্রথম নাযিল হলো পাঁচটি আয়াত। আয়াতগুলো মোটামুটি একটি বিষয় নিয়েই আলোচনা করল, তা হলো জ্ঞান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ○ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ○ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

> পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড (আলাক) থেকে। পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।[৪৯৭]

এই পন্থায় প্রথম কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়া একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। তার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হাজার হাজার বিষয় থেকে একটি বিষয় বেছে নিয়েছেন এবং তার দ্বারা কুরআন শুরু করেছেন। অথচ যাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হচ্ছে সেই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন উম্মি, পড়তেও জানতেন না এবং লিখতেও জানতেন না। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, এই প্রথম বিষয়টিই (অর্থাৎ, জ্ঞান) এই দ্বীন বোঝার চাবিকাঠি, দুনিয়া বোঝারও

---

৪৯৭. সুরা আলাক : ১-৫

চাবিকাঠি, এমনকি যে আখিরাতে সকল মানুষ প্রত্যাবর্তন করবে সেই আখিরাত বোঝারও চাবিকাঠি।

আরও বিস্ময়কর এ কারণে যে, কুরআন নাযিল হওয়ামাত্রই এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে যে ব্যাপারে সেই সময় আরবরা কোনো গুরুত্ব দিত না। বরং রূপকথা, কল্পকাহিনি ও কুসংস্কারই তাদের আগাগোড়া জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। তাই জ্ঞানের সব ক্ষেত্রে তারা ছিল ভিখিরি। তবে অলংকারশাস্ত্র ও কাব্যের কথা ভিন্ন। এই ময়দানে তারা ছিল শ্রেষ্ঠ। তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। এ কারণে কুরআন নাযিল হয়ে–এবং এটি অতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার–তারা যে বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সে বিষয়ে তাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। তাদের উদ্দেশে ঘোষণা দিয়েছে যে, কুরআন সব ক্ষেত্রে জ্ঞানের ও জ্ঞানগত উৎকর্ষের আহ্বান জানায় সেই পন্থাতেই, তারা যাতে সিদ্ধহস্ত।

সেই যুগে ইসলামের আবির্ভাব ছিল বাস্তবিক অর্থেই জ্ঞান-বিপ্লব। সেই পরিবেশ জ্ঞানাত্মার অনুকূল ছিল না, উপযোগীও ছিল না। এমনকি কুরআনের প্রথম বাণী অবতীর্ণ হওয়ার আগের সময়টা পরিচিতি পেয়েছে 'জাহিলিয়া' নামে! ইসলামপূর্ব যুগ অজ্ঞতার বিশেষণেই বিশেষিত। তারপর জ্ঞানের সূচনা এবং দুনিয়াকে অলৌকিক হেদায়েতের আলোয় আলোকিত করার জন্য ইসলামের আবির্ভাব ঘটল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

> তবে কি তারা জাহিলি যুগের বিধিবিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানদানে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?[৪৯৮]

সুতরাং এই ধর্মে অজ্ঞতা, ধারণা, সন্দেহ ও সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

এই অলৌকিক কিতাব (কুরআন)-এর কেবল সূচনাতেই জ্ঞান, জ্ঞানের মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি, বরং এই অবিনশ্বর সংবিধানে জ্ঞানই সুদৃঢ় নীতি। কুরআনের কোনো সুরাই জ্ঞানের

---

৪৯৮. সুরা মায়িদা : আয়াত ৫০।

আলোচনামুক্ত নয়, সব সুরাতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জ্ঞানের কথা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলার কিতাবে জ্ঞান শব্দটি বা জ্ঞানজাত শব্দ কতবার এসেছে তা গুনতে গিয়ে আমি বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছি। কুরআনে জ্ঞান শব্দটি এসেছে ৭৭৯ বার! এটি কোনো অতিরঞ্জন নয়, সত্যিই। অর্থাৎ, গড়ে প্রতি সুরায় ইলম বা জ্ঞান শব্দটি প্রায় সাতবার এসেছে!

এই সংখ্যা ইলম (জ্ঞান) ও আইন-লাম-মিম ধাতুজাত শব্দের সমষ্টি। অন্যথায়, কুরআনে আরও অসংখ্য শব্দ রয়েছে যেগুলো জ্ঞান বোঝায় বা জ্ঞান নির্দেশ করে, যদিও তা ইলম শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ : ইয়াকিন (দৃঢ়বিশ্বাস), হুদা (পথনির্দেশ), আকল (বুদ্ধি, বিবেক), ফিকর (চিন্তা), নযর (দর্শন), হিকমাহ (প্রজ্ঞা), ফিকহ (উপলব্ধি), বুরহান (যুক্তি), দলিল (প্রমাণ), হুজ্জাহ (যুক্তি, প্রমাণ), আয়াত (নিদর্শন), বাইয়িনাহ (প্রমাণ, সাক্ষ্য) এবং অন্যান্য সমার্থবোধক শব্দ, যেগুলো জ্ঞান বোঝায় এবং জ্ঞানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহে (হাদিসসমূহে) ইলম শব্দটি কতবার এসেছে তা গণনা করা দুঃসাধ্য।

আরও লক্ষণীয় যে, কুরআনের প্রথমবার নাযিল হওয়ার মুহূর্তেই যে জ্ঞানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা নয়, বরং মানব-সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই জ্ঞানের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনুল কারিমের আয়াতসমূহে তা বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আদমকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে জমিনের প্রতিনিধি বানিয়েছেন। তিনি ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন আদমকে সিজদা করতে, এর মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করেছেন ও তার মর্যাদা উঁচুতে তুলে ধরেছেন। আর আল্লাহ তাআলা এই সম্মান, মর্যাদা ও উচ্চগৌরবের কারণ আমাদের ও ফেরেশতাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তা হলো ইলম বা জ্ঞান। তা বিবৃত করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ

فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ○ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾

স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন (এমন সৃষ্টিকে প্রতিনিধি বানাতে চাচ্ছেন) যে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার (জন্য) সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।[৪৯৯] তিনি বললেন, আমি জানি যা তোমরা জানো না। (সেই রহস্যের প্রতি আমার লক্ষ রয়েছে। সে সম্পর্কে তোমরা কোনো খবর রাখো না। এরপর আল্লাহ যা-কিছু ইচ্ছা করেছিলেন তা অস্তিত্বপ্রাপ্ত হলো এবং প্রকাশ পেল।) আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম[৫০০] শিক্ষা দিলেন। (এই অভ্যন্তরীণ উন্নতি লাভ করলেন যে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে সৃষ্টিজগতের যাবতীয় বস্তুর নাম জেনে নিলেন।) তারপর তিনি ওই সমুদয় (বস্তুকে) ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা (তোমাদের সন্দেহের ক্ষেত্রে) সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও।[৫০১] তারা বলল, আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। (ফেরেশতারা যখন এভাবে নিজেদের অক্ষমতা ও অপারগতা স্বীকার করে নিলো) তখন তিনি বললেন, হে আদম, তাদেরকে এ সকল (বস্তুর) নাম বলে দাও। সে তাদেরকে এই সকলের নাম

---

৪৯৯. খলিফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী তা জানার জন্য ফেরেশতাগণ এ কথা বলেছিলেন।-অনুবাদক

৫০০. বস্তুজগতের জ্ঞান।-অনুবাদক

৫০১. সত্যবাদী হও তোমাদের বক্তব্যে।-অনুবাদক

বলে দিলে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত করো বা (তোমাদের অন্তরে) গোপন রাখো তাও আমি জানি? আর (দেখুন,) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো, তখন (সঙ্গে সঙ্গে) ইবলিস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে নির্দেশ অমান্য করল ও অহংকার করল। (সিজদার জন্য ইবলিসের ঘাড় নত হলো না।) এবং সে কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে গেল।[৫০২]

এসব কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা অতিরঞ্জন গোছের কিছু নয়। তিনি একটি হাদিসে ইঙ্গিত করেছেন যে, এই গোটা দুনিয়ার কোনো মূল্য নেই, এমনকি তা অভিশপ্ত, যদি না তা ইলম ও আল্লাহর যিকির দ্বারা সজ্জিত হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اَلدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ وَمَا وَالاَهُ، أَوْعَالِمًا أَوْمُتَعَلِّمًا»

আল্লাহর যিকির এবং তাঁর আদেশপালন ও নিষেধ পরিহারকরণ এবং আলেম ও তালিবুল ইলম ব্যতীত দুনিয়া অভিশপ্ত, দুনিয়াতে যা রয়েছে তাও অভিশপ্ত।[৫০৩]

ইসলামি রাষ্ট্রে এ সবকিছুর (জ্ঞানের প্রতি এমন গুরুত্বারোপ ও জ্ঞানকে মহিমাময় করে তোলার) সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ময়দানে ব্যাপক উদ্যোগ ও কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ইতিহাসে এমন উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতার নজির নেই। ফলে মুসলিম জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের হাতে সভ্যতার ব্যাপক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। মানবজাতির উত্তরাধিকার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভান্ডারে সমৃদ্ধ হয়েছে। গোটা পৃথিবী তার কাছে ঋণী হয়েছে।

---

৫০২. সুরা বাকারা : আয়াত ৩০-৩৪।

৫০৩. *তিরমিযি*, কিতাব : আয-যুহদ, বাব : হাওয়ানুদ-দুনিয়া আলা আল্লাহ, হাদিস নং ২৩২২, তিনি বলেছেন, এটি হাসান গরিব হাদিস। *দারেমি*, হাদিস নং ৩২২; তাবারানি, *আল-আওসাত*, হাদিস নং ৪০৭২; *বাযযার*, হাদিস নং ১৭৩৬; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ১৭০৮।

আমরা ইসলামে জ্ঞানের অবস্থান ও বিকৃত খ্রিষ্টধর্মে জ্ঞানের অবস্থান কী তা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি। আমরা দেখব যে মধ্যযুগে চার্চ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রোমে খ্রিষ্টীয় চার্চের সূচনাকাল থেকেই তা নিজেকে গ্রিক ও রোমান সংস্কৃতি ও সভ্যতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। গোথদের[৫০৪] আক্রমণের ফলে রোমান সভ্যতা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। প্রাচ্যীয় ক্যাথলিক চার্চ তার পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে পৌত্তলিক দার্শনিক ও জ্ঞানীদের ওপর প্রচণ্ড জুলুম ও অত্যাচার শুরু করেছিল। এথেন্সের শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ করে দেয়। আলেকজান্দ্রিয়ায় গ্রিক দর্শনের ওপর লৌহ দুরমুশ মেরেছিল। চার্চ মনে করল যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার পথ একটিই, তা হলো ঈশ্বরের পথ। আর পবিত্র গ্রন্থের (বাইবেল) বাইরে সত্য খোঁজা এবং পার্থিব বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষানিরীক্ষা করা মানেই গোমরাহি ও পথভ্রষ্টতা।[৫০৫]

এ সত্যটিকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন জার্মান প্রাচ্যবিদ সিগরিড হুংকে[৫০৬]। তিনি ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানের অবস্থান কী এবং মধ্যযুগে ইউরোপীয় পশ্চিমাঞ্চলে খ্রিষ্টধর্মের দৃষ্টিতে জ্ঞানের অবস্থান কী ছিল তার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি বিবরণ দিয়েছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে প্রত্যেক মুমিনকে—সে পুরুষ হোক বা নারী—জ্ঞান অর্জন করতে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। জ্ঞান অর্জনকে তিনি একটি ধর্মীয় অবশ্যকর্তব্য বলে স্থির করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অনুসারীদের সৃষ্টিজগৎ ও তার বিস্ময়কর বস্তুরাশি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা ও জ্ঞান অর্জনকে মহান স্রষ্টার কুদরত ও ক্ষমতাকে চেনার উপায় বিবেচনা করেছেন। তা ছাড়া তিনি তাঁর অনুসারীদের আর সব জাতির জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেও

---

৫০৪. গোথ : প্রথম দিকের জার্মান জনগোষ্ঠী। এরা দুটি শাখায় বিভক্ত ছিল, ভিজিগোথ (Visigoths) ও অস্ট্রোগোথ (Ostrogoths)। পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতনে ও মধ্যযুগীয় ইউরোপের বিকাশে তাদের ভূমিকা রয়েছে।-অনুবাদক

৫০৫. নাদিয়া হুসনি, *আল-ইলম ওয়া মানাহিজুল-বাহস*, পৃ. ১৩।

৫০৬. ড. সিগরিড হুংকে (Sigrid Hunke 1913-1999) : জার্মান নারী প্রাচ্যবিদ। হামবুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও সাংবাদিকতা অধ্যয়ন করেন। ১৯৪১ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বেশ কয়েকটি আরব রাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *Allahs Sonne über dem Abendland: Unser arabisches Erbe* (1960). বইটির আরবি অনুবাদ : *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*।

নির্দেশ দিয়েছেন। সিগরিড হুংকে তার এই আলোচনার শেষে বলেছেন, তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে গিয়ে সেন্ট পল (Paul the Apostle) বলেছেন, ঈশ্বর কি পার্থিব জ্ঞানকে নির্বুদ্ধিতা ও আহাম্মকি বলে আখ্যায়িত করেননি?[৫০৭]

সেন্ট অগাস্টিন[৫০৮] জ্ঞানের বলয় নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, ঈশ্বর ও (পবিত্র) আত্মা সম্পর্কিত জ্ঞানই আমি চাই। সত্যের অনুসন্ধানের অর্থই হলো ঈশ্বর সম্পর্কে অনুসন্ধান। এর জন্য বাইরের কোনো সাহায্য বা উপকরণের দরকার পড়ে না। এই জ্ঞানের একমাত্র উৎস হলো পবিত্র কিতাব (বাইবেল)।[৫০৯]

সিগরিড হুংকে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা দিয়েছেন, কীভাবে তারা (চার্চ-কর্তৃপক্ষ) এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে নতুন জ্ঞানগত চিন্তার অধিকারী বা দাবিদার যে-কাউকে পথভ্রষ্ট কাফের বলে আখ্যায়িত করত। যেমন পৃথিবীর গোলাকার হওয়া। হুংকে তার বক্তব্যের সপক্ষে চার্চের দীক্ষাগুরু লাকতানতিয়াসের[৫১০] বাণীর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। যে-কতিপয় বিজ্ঞানী দাবি করতেন যে পৃথিবী গোলাকার তাদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে লাকতানতিয়াস বলেন, এটা কি বোধগম্য? বিশ্বাসযোগ্য? এটা কি বোধগম্য যে মানুষ এই পর্যায়ের পাগল হয়ে যেতে পারে? তাদের মগজে কীভাবে এটা ঢুকল যে পৃথিবীর অন্যপাশে শহর-নগর ও গাছপালা ঝুলে

---

৫০৭. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৩৬৯।

৫০৮. আউরেলিয়ুস আউগুস্তিনুস বা সেন্ট অগাস্টিন (Augustine of Hippo: জন্ম ১৩ নভেম্বর ৩৫৪ খ্রি., মৃত্যু ২৮ আগস্ট ৪৩০ খ্রি.) প্রাচীন যুগের খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ, চার্চ পদ্ধতির লাতিন গুরুদের অন্যতম এবং সম্ভবত স্বয়ং যিশুর কথিত শিষ্য সেন্ট পলের পরেই খ্রিষ্টধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। তিনি রোমান অধ্যুষিত উত্তর আফ্রিকাতে বড় হয়েছেন এবং সেখানকার হিপ্পো রেগিয়ুস (বর্তমানে আলজেরিয়ার আন্নাবা শহর) নামক নগরীর বিশপ ছিলেন। তার রচিত বহু বইয়ের মধ্যে বিখ্যাত হলো *The City of God* এবং *Confessions.* বই দুটি বাইবেলের ভাষ্য হিসেবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং মধ্যযুগীয় ও এমনকি আধুনিক খ্রিষ্টীয় চিন্তাধারারও ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।

৫০৯. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৩৭০।

৫১০. Lucius Caecilius Firmianus Lactantius (২৫০-৩২৫ খ্রি.) : প্রাচীন খ্রিষ্টীয় লেখক এবং প্রথম খ্রিষ্টান রোম সম্রাট প্রথম কনস্টান্টাইন (বা মহান কনস্টান্টাইন)-এর উপদেষ্টা ছিলেন।

আছে এবং মানুষের পা তাদের মাথার উপরে উঠে গেছে।[৫১১] যে-কেউ প্রাকৃতিক ঘটনাবলির জ্ঞানগত ব্যাখ্যা গ্রহণ করবে বা মেনে নেবে সে অভিশপ্ত। নক্ষত্রের আবির্ভাব ও নদীর জোয়ারভাটার প্রাকৃতিক কার্যকারণ ব্যাখ্যা করলে সে ঈশ্বরের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাবে। এমনকি ভাঙা পায়ের চিকিৎসা এবং নারীর গর্ভপাতের বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ ব্যাখ্যা করলে সেও ধর্মচ্যুত। এগুলো হলো ঈশ্বরের পক্ষ থেকে বা শয়তানের পক্ষ থেকে শাস্তি অথবা এমন অলৌকিক ব্যাপার যা আমাদের বোধগম্যতার বাইরে![৫১২]

এ কারণে ইউরোপে ধর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হয়। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জ্ঞানান্দোলন ও জ্ঞানচাঞ্চল্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও জ্ঞানের জাগরণ এবং চার্চের বিরুদ্ধে বিপ্লব সূচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই অবস্থাই বিরাজমান থাকে।

কোপার্নিকাস[৫১৩] ১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পৃথিবী ঘোরে এবং সূর্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র, পৃথিবী নয়। অথচ ইতিপূর্বে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, পৃথিবীই বিশ্বজগতের কেন্দ্র এবং ঘোরে না। কোপার্নিকাসের এই সিদ্ধান্ত ইউরোপে দুর্যোগের সৃষ্টি করে। ইনজিল-ভিত্তিক সত্যের মানদণ্ডের বিচারে চার্চ এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে। চার্চ-কর্তৃপক্ষ মনে করে এই সিদ্ধান্ত তাদের বিশ্বাস-বিরোধী। কারণ, পৃথিবীকে বিশ্বজগতের কেন্দ্র না ধরে তাকে বিশ্বজগতে একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড (গ্রহ) হিসেবে বিবেচনা করা কেবল বৈজ্ঞানিক উদ্‌ঘাটন নয়, খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের মূলে কঠিন আঘাতও। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী ঈশ্বর পৃথিবীতে মানবমণ্ডলীর মুক্তির জন্য দেহলাভ করেছেন। এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না যে, এই পৃথিবী অন্য বড় বড় গ্রহনক্ষত্রের মাঝে একটি ছোট গ্রহ।

---

৫১১. পৃথিবীতে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে রয়েছে চিলি। বাংলাদেশ থেকে কল্পনা করলে বোঝা যায় চিলিতে ঘরবাড়ি ও গাছপালা যেন ঝুলে রয়েছে। আমাদের মাথা যেদিকে, সে দেশের মানুষের পা সেদিকে।-অনুবাদক

৫১২. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৩৭০।

৫১৩. ইউরোপের রেনেসাঁস যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস (Nicolaus Copernicus) পৃথিবীকে পরিক্রমণশীল গ্রহ হিসেবে দেখিয়ে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের আধুনিক ধারণার বিস্তার করেন। কোপার্নিকাস ১৪৭৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৪৩ সালের ২৪ মে তার মৃত্যু হয়।

আর এটা তো অকল্পনীয় যে পৃথিবী সূর্যের অনুগামী হয়ে তার চারপাশে ঘুরছে। এ কারণে পৃথিবীর কেন্দ্র হওয়ার ধারণা বোধগম্যভাবেই একজন ঈশ্বর বা দেবতার অনুকূলে ছিল, যিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে যাবতীয় বস্তু মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এখন এ সকল মানুষ অনুভব করছে যে তারা একটি ছোট গ্রহের ওপর টলমল করছে, যার ইতিবৃত্ত বিশ্বজগতের ইতিহাসের মধ্যে একটি ছোট্ট পরিচ্ছেদে সংকুচিত হয়ে পড়েছে...। মানুষ যখন নতুন চিন্তা ও সিদ্ধান্তের মর্মার্থ অনুধাবন করবে, তারা অবশ্যই এই বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন শুরু করবে যে, এই শৃঙ্খলিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা তার পুত্রকে এই ছোট আকারের গ্রহে আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। তাদের প্রশ্ন উত্থাপন অনিবার্য।

সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণা প্রদানকারী জ্যোতির্বিজ্ঞানী মানুষকে স্রষ্টা সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য করলেন। খ্রিষ্টধর্মীয় ঈশ্বরত্ব ধর্মের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল![৫১৪] কোপার্নিকাস নিপীড়ন ও নিগ্রহের শিকার হলেন এবং তীব্র জঘন্য বিরোধিতার মুখে টিকে থাকতে পারলেন না। এভাবে বহু বছর কেটে গেল। অবশেষে তার এক ভক্তের দুঃসাহসের ফলে তিনি তার বইটি (*On the Revolutions of Heavenly Spheres*) প্রকাশ করতে সক্ষম হন। এ বছরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অবশ্য তিনি বইটিতে বেশ কিছু পরিমার্জন ও সংশোধন করেন এবং স্বীকার করেন যে, তার সিদ্ধান্ত অনুমানভিত্তিক এবং তা ভ্রান্তির সম্ভাবনা রাখে।[৫১৫] কিন্তু কোপার্নিকাসের মৃত্যুর আশি বছর পর ব্রুনো[৫১৬] তার সিদ্ধান্তকে সত্য ধরে নিয়ে তা মেনে নেন। তিনি কোপার্নিকাসের সিদ্ধান্তকে আরও বিকশিত ও উৎকর্ষমণ্ডিত করেন এবং

---

[৫১৪]. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ২৭, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

[৫১৫]. প্রাগুক্ত, খ. ২৭, পৃ. ১৩১-১৩৪।

[৫১৬]. জিয়োর্দানো ব্রুনো (Giordano Bruno) : ১৫৪৮ সালে নেপলিসের নোলা শহরে (বর্তমানে ইতালি) জন্মগ্রহণ করেন। একাধারে তিনি ছিলেন দার্শনিক, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ, জ্যোতিষী ও মহাবিশ্বতত্ত্ববিদ। তিনি নিখুঁতভাবে নির্ণয় করেন যে সূর্য একটি উজ্জ্বল তারকা ছাড়া কিছু নয় এবং তা নিজ কক্ষপথে প্রতিনিয়ত আবর্তিত হচ্ছে। তিনি দাবি করেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী ছাড়াও এমন আরও অসংখ্য গ্রহ আছে যেখানে বুদ্ধিমান প্রাণীরা বসবাস করছে। তার চিন্তা ও মতাদর্শের কারণে রোমান ক্যাথলিক চার্চ নিযুক্ত তদন্ত-আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়। ১৬০০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। তিনি ত্রিশটিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রুনোকে 'বিজ্ঞানের শহিদ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

তার সঙ্গে নিজের মত যুক্ত করেন। ফলে হইচই শুরু হয়ে যায় এবং ইনকুইজিশন[৫১৭] বিচারসভা কোপার্নিকাসের গ্রন্থটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে[৫১৮] এবং ব্রুনোকে খোলা মাঠে পুড়িয়ে হত্যা করে।[৫১৯]

কোপার্নিকাসের চিন্তারাশি গ্যালিলিও গ্যালিলির[৫২০] চিন্তারাশির সূচনা ও ভিত্তি ছিল। এ কারণে চার্চ কর্তৃক গ্যালিলিকে তার সত্তর বছর বয়সে

---

৫১৭. নির্দয় ধর্মীয় বিচার (The Inquisition) : 'ইনকুইজিশন' শব্দের অর্থ 'বিচারের জন্য অনুসন্ধান' হলেও ইউরোপের ইতিহাসে ইনকুইজিশন বলতে ধর্মান্ধতার যুগে ধর্মীয় প্রতিপক্ষ অথবা ধর্মীয় গোঁড়া সংস্কার ও বিশ্বাসের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও নির্দয় বিচারব্যবস্থাকে বোঝায়। ইনকুইজিশন বা ধর্মীয় বিচারের সূচনা ঘটে ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে। খ্রিষ্টান যাজকগণ যাদেরকে অবিশ্বাসী বা খ্রিষ্টীয় ধর্মবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করত তাদের বিচার করার জন্য তদন্তকারী ও বিচারক নিযুক্ত করত। খ্রিষ্টীয় যাজকদের এই বিচারব্যবস্থা বিভিন্ন রাষ্ট্রের খ্রিষ্টান সম্রাটগণ অনুমোদন করেন। যারা খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে অন্যকোনো ধর্মীয় বিশ্বাস গ্রহণ করত তাদের বিরুদ্ধেও ইনকুইজিশন-ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হতো। গোড়ার দিকে ধর্মত্যাগী বা অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি ও ক্ষমা প্রার্থনা আদায় ছাড়া দৈহিকভাবে নিপীড়ন করা না হলেও ক্রমান্বয়ে কারাগারে বন্দি করে রাখা, নির্মম নির্যাতন ও অত্যাচার, অভিযুক্তকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে হত্যা করা 'ইনকুইজিশন'-এর অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিচারব্যবস্থায় অভিযোগ প্রমাণের জন্য কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন হতো না। দুজন লোকের গোপনীয় অভিযোগের ভিত্তিতে যেকোনো নাগরিককে এই ধর্মীয় তদন্ত-আদালতের কাছে সোপর্দ করে তাকে দণ্ডিত করা যেত। 'ইনকুইজিশন' চরম রূপ গ্রহণ করে স্পেনে, পঞ্চদশ শতকে। স্পেনীয় 'ইনকুইজিশন'-এর প্রধান লক্ষ্য ছিল ওইসব ব্যক্তি যারা খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করত বা ইহুদিধর্মে বিশ্বাস করত। স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ড ও রানি ইসাবেলা যাকে প্রথম ইনকুইজিটার বা প্রধান বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন সে তার কার্যকালে দুহাজার লোককে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করেছিল। 'ইনকুইজিশন'-এর আতঙ্কে মধ্যযুগের ইউরোপে জ্ঞানবিজ্ঞানের গবেষকগণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে বা মতামত প্রকাশ করতে সাহস পেতেন না। এই সময়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অনেক চিন্তাবিদ ও মুক্তবুদ্ধির মানুষকে এই ধর্মীয় বিচারের যূপকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। তাদের মধ্যে ইউরোপীয় পুনর্জাগরণের অন্যতম পুরোধা জিয়োর্দানো ব্রুনোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার যুক্তিবাদী ও স্বাধীন মতামতের জন্য তাকে ইনকুইজিশনের হুকুমে ১৬০০ সালে রোম শহরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।-অনুবাদক

৫১৮. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ২৭, পৃ. ১৩৮।

৫১৯. প্রাগুক্ত, খ. ২৭, পৃ. ২৮৮-৩০০, ব্রুনো ভুক্তি।

৫২০. রেনেসাঁস যুগের ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি (Galileo Galilei)-কে আধুনিক পরীক্ষণ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। তিনি ১৫৬৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ইতালির পিসা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ২০ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা অবস্থাতেই তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'দোলকের নিয়ম' আবিষ্কার করেন। শুরুতে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করলেও শেষে গণিত ও পদার্থবিদ্যাই তার বিষয় হয় এবং ২৫ বছর বয়সে তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রাচীন গ্রিক আমল থেকেই বদ্ধমূল ধারণা ছিল, একই উচ্চতা থেকে ফেললে হালকা বস্তুর আগে ভারী বস্তু মাটিতে পড়বে। গ্যালিলিও পড়ার গতির ত্বরণ সম্পর্কে তার নির্ভুল ধারণা থেকে দেখান যে নিচে পড়ার গতি ওজনের ওপর নির্ভর করে না। গ্যালিলিও

বিচারের মুখোমুখি করে অপমান-অপদস্থ করা হয়, যাতে তিনি তার যাবতীয় চিন্তা ও সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ সময়ের জন্য তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং সাত বছরব্যাপী প্রতিদিন সাতটি Book of Psalms পড়তে বাধ্য করা হয়।[৫২১]

এটা হলো সিন্ধু থেকে বিন্দু। এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। চার্চ কর্তৃপক্ষ কেবল কোপার্নিকাস, ব্রুনো ও গ্যালিলির শাস্তিবিধান করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা সকল জ্ঞানী ব্যক্তিকে ইনকুইজিশন নামক বিচারসভার মুখোমুখি করে। ইনকুইজিশন তার দায়িত্ব যথার্থভাবেই পালন করে। এই বিচারসভা মাত্র ১৮ বছরে–১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত–দশ হাজার দুইশ বিশ ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যার নির্দেশ দেয় এবং তাদের জীবন্তই পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। ছয় হাজার আটশ ষাট ব্যক্তিকে শহরে চক্কর লাগানোর পর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাদেরকে এভাবেই ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়। তা ছাড়া, সাতানব্বই হাজার তেইশ ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তিতে দণ্ডিত করা হয়।[৫২২] গ্যালিলিও, জিয়োর্দানো ব্রুনো ও নিউটনের[৫২৩] গ্রন্থাবলি নিষিদ্ধ ঘোষণা

জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যাপক পরিবর্তন আনেন এবং বেশ কিছু উন্নত দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বৃহস্পতির চারটি চাঁদ তিনি আবিষ্কার করেন এবং শনিগ্রহের অদ্ভুত আকৃতিও তিনি প্রথম লক্ষ করেন। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী খ্রিষ্টান ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ তাকে নিজের মত প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে এবং বাকি জীবন তাকে নিজ বাড়িতে নজরবন্দি হয়ে থাকতে হয়। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং ১৬৪২ সালের ৮ জানুয়ারি তার মৃত্যু হয়। তিনি ফ্লোরেন্স নগরীতে সমাহিত হন।-অনুবাদক

[৫২১]. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ২৭, পৃ. ২৬৪-২৮০, গ্যালিলিও ভুক্তি।

[৫২২]. আল-ইমাম মুহাম্মাদ আবদুহু, আল-ইদতিহাদ ফিন-নাসরানিয়্যাহ ওয়াল-ইসলাম, *আল-মানার* সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ, ৫ম ভলিউম, পৃ. ৪০১।

[৫২৩]. স্যার আইজ্যাক নিউটন (১৬৪৩-১৭২৭ খ্রি.) প্রখ্যাত ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, প্রাকৃতিক দার্শনিক এবং আলকেমিস্ট। ১৬৮৭ সালে তার বিশ্বনন্দিত গ্রন্থ ফিলসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা (লাতিন ভাষায় : *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*, ইংরেজি ভাষায় : *Mathematical Principles of Natural Philosophy* প্রকাশিত হয়।) এতে তিনি সর্বজনীন মহাকর্ষ এবং গতির তিনটি সূত্র বিধৃত করেন। এই সূত্র ও মৌল নীতিগুলোই চিরায়ত বলবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। তার গবেষণার ফলে উদ্ভূত চিরায়ত বলবিজ্ঞান পরবর্তী তিন শতকজুড়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার জগতে একক আধিপত্য করেছে। তিনিই দেখিয়েছিলেন যে, পৃথিবী এবং মহাবিশ্বের সকল বস্তু একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। কেপলারের গ্রহীয় গতিসূত্রের সঙ্গে নিজের মহাকর্ষ-তত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার গবেষণার

করে ফরমান জারি করা হয়। নিউটনের অপরাধ ছিল তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (মহাকর্ষ সূত্র) কথা বলেছেন। বিচারসভা তাদের সব বই পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দেয়। কার্ডিনাল খিমনিস[৫২৪] গ্রানাডায় সত্যিই আট হাজার পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে দেন। কারণ এগুলোর বক্তব্য চার্চের মতামত ও সিদ্ধান্তের অনুকূলে ছিল না।[৫২৫]

ইউরোপ এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভয়ংকর অবস্থা দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীব্যাপী যাপন করেছিল। একে অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়, মধ্যযুগও বলা হয় একে। মধ্যযুগীয় বর্বরতা কথাটা এখান থেকেই এসেছে। এই যুগ প্রায় এক হাজার বছর পরিব্যাপ্ত ছিল। এই বাস্তবিকতা বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের (যেমন : দেকার্তে ও ভলতেয়ার) ও সাধারণ মানুষের মগজে একটি ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে, চার্চের কর্তৃত্ব ধ্বংস করা ছাড়া অথবা অন্তর থেকে ধর্মবোধকে সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া ব্যতীত জ্ঞানচর্চা ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনের কোনো আশা নেই। তা ছাড়া নাস্তিক্যবাদ বলতে যা বোঝায় তার সবকিছুকে বরণ করে নিতে হবে। বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা তাওরাত ও ইনজিলের মতো পবিত্র গ্রন্থাবলির বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতার প্রকাশ্য ঘোষণা দিলেন। কারণ, তাওরাত ও ইনজিল বৈজ্ঞানিক সত্য-বিরোধী বিষয়ে পরিপূর্ণ। তাদের এই বিশ্বাসও জন্মেছিল যে, ধর্ম মানেই—যেমন তারা দেখেছিলেন—জ্ঞান ও জ্ঞানীদের বিনাশ এবং বুদ্ধি ও চিন্তার বন্ধ্যাত্ব। তারা ঐশী দলিল-প্রমাণের বিরুদ্ধে বুদ্ধি ও যুক্তিকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার আহ্বান জানাতে শুরু করলেন। তাদের বক্তব্যের ভিত্তি ছিল এই যে, বুদ্ধি ও যুক্তিই জ্ঞানগত সত্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে পারঙ্গম।

ফরাসি বিপ্লবের পর ফ্রান্সের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি চিন্তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের সমর্থন জোগায়। ১৭৯০ সালে তারা একটি ফরমান জারি করে। ফরমানটির উদ্দেশ্য ছিল চার্চ কর্তৃপক্ষের কোমর ভেঙে দেওয়া। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি যাজক-যাজিকাদের বরখাস্ত করে এবং

ফলেই সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণার পেছনে সামান্যতম সন্দেহও দূরীভূত হয় এবং বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়।-অনুবাদক

[৫২৪]. Francisco Jiménez de Cisneros.

[৫২৫]. মানি ইবনে হাম্মাদ, *আল-মাওসুউল মুইয়াসসারাহ ফিল-আদইয়ান ওয়াল-মাযাহিব ওয়াল-আহযাবিল মুআসিরাহ*, খ. ২, পৃ. ৬০৪।

চার্চ-কর্তৃপক্ষকে নাগরিক সংবিধান (Civil Constitution) মানতে বাধ্য করে। পোপের বদলে অ্যাসেম্বলি চার্চে কারা নিয়োগ পাবে তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯০৫ সালে ফরাসি সরকার রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ পৃথক করার আইন পাস করে এবং রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হবে বলে ঘোষণা দেয়। এটি ছিল চার্চের বিরুদ্ধে চরম আঘাত। তা চার্চ-বিরোধীদের সাহস জোগায়, তারা পবিত্র গ্রন্থ (বাইবেল) ও চার্চের স্বাধীন সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, উপর্যুক্ত আইন চার্চ কর্তৃপক্ষকে জাতি, রাষ্ট্র ও নতুন নাগরিক সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে বাধ্য করে। ধীরে ধীরে এমন আইন ইউরোপের সব রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে রাজনীতি ও জ্ঞান বিষয়ে চার্চের যে কর্তৃত্ব ছিল তার মূলোৎপাটন ঘটে। চার্চের ক্ষমতা চার দেয়ালের অভ্যন্তরে বন্দি হয়ে পড়ে। উপদেশবর্ষণ ও প্রার্থনাসংগীতেই তাদের সময় কাটে।[৫২৬]

কিন্তু দ্বীনে ইসলাম কখনোই চার্চের মতো ছিল না। কখনোই তা জ্ঞানচর্চায় মুসলিমদের পথে শত্রু বা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি। চাই তা চিন্তা ও গবেষণার দিক থেকে হোক বা প্রায়োগিক ও কার্যকরী দিক থেকে হোক। ইসলাম বরং মানুষকে জ্ঞানচর্চার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এবং উৎসাহিত করেছে। বুদ্ধি ও যুক্তির লাগাম খুলে দিয়েছে। স্বাধীন চিন্তা, দর্শন ও উপলব্ধির অবারিত সুযোগ দিয়েছে। এখানে প্রথা, অন্ধানুকরণ, প্রবৃত্তি ও ঝোঁক-প্রবণতার কোনো দখল ছিল না। তা কেন নয়, আল্লাহ তাআলা তো বুদ্ধি ও বিবেককে সম্বোধনের দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং একে দায়িত্ব আরোপের হেতু বানিয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামি চিন্তাধারা ও মধ্যযুগের খ্রিষ্টীয় চিন্তাধারার মধ্যে দীর্ঘতম ব্যবধান রয়েছে। ইসলামি চিন্তাধারা চিন্তাগত স্বাধীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এখানে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোনো ধরনের মধ্যস্থতা ব্যতীত সম্পর্ক বিদ্যমান। ইসলামি চিন্তাধারা বুদ্ধি ও যুক্তিকে মর্যাদা দিয়েছে। মধ্যযুগের খ্রিষ্টীয় চিন্তাধারা চিন্তার স্বাধীনতাকে বাজেয়াপ্ত করেছে এবং চার্চের পুরোহিতকে বান্দাদের ও তাদের প্রভুর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী স্থির করেছে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পশ্চিমে ইউরোপীয় সভ্যতার পর্যায়ক্রমিক বিকাশসূচনার আগে হাজার বছর সময়ের কেন প্রয়োজন

---

৫২৬. *আল-মাওসুউল মুইয়াসসারাহ ফিল-আদইয়ান ওয়াল-মাযাহিব ওয়াল-আহযাবিল মুআসিরাহ*, খ. ২, পৃ. ৬০৪-৬০৫।

পড়েছে। অথচ ইসলামি আরবি সভ্যতার দুই শতাব্দী বা তিন শতাব্দী পূর্বেই ইউরোপীয় সভ্যতার বিকশিত হওয়ার উপযুক্ত সুযোগ ছিল, তারপর সে তার বিপ্লব মুসলিমদের কাঁধের ওপর সংঘটিত করতে পারত।[৫২৭]

৫২৭. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৩৭২-৩৭৩।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

জ্ঞান সবার জন্য

ইসলামপূর্ব যুগে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ সাধারণ জনমানব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতেন। তাদের ও জনগণের মধ্যে ব্যবধান ছিল অলঙ্ঘনীয়। পারস্য বলি, রোম বলি বা গ্রিস বলি—সব জায়গাতেই জ্ঞানীরা সম্পূর্ণ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করতেন। তাদের নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক ও মুনাযারা অনুষ্ঠিত হতো এবং জ্ঞানের উত্তরাধিকার তাদের মধ্যেই বিরাজমান ছিল। অন্যদিকে সাধারণ জনগণ অজ্ঞতার অন্ধকারে বসবাস করত। জ্ঞানের কোনো শাখার সঙ্গে তাদের ন্যূনতম সংযোগ ছিল না। কিন্তু ইসলাম ভিন্ন জিনিস!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বাক্যে ঘোষণা করেছেন,

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

জ্ঞান অন্বেষণ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।[৫২৮]

ফলে জ্ঞান অর্জন একটি ধর্মীয় অবশ্যকর্তব্যে পরিণত হয়। বরং এটি জাতিগত দায়িত্বও, যা সকলের জন্য আবশ্যক। সকলের জন্য জ্ঞান অর্জন আবশ্যক হলে সবাইকে অবশ্যই শিক্ষার্থী ও জ্ঞান-অন্বেষক হতে হবে, এই ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নীতির বাস্তবিক অনুশীলন করেছেন। বদর যুদ্ধে মক্কার অনেক মুশরিক মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়েছিল। তিনি তাদের অভিনব মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, বন্দিদের যে-কেউ মদিনার দশজন নারী-পুরুষকে পড়া ও লেখা শেখালে মুক্তি পেয়ে যাবে। এটা ছিল উন্নত সভ্যতার চিন্তা,

---

৫২৮. *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২২৪; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ২৮৩৭; সুয়ুতি, *আল-জামেউস-সাগির*, হাদিস নং ৭৩৬০।

যা সে সময়ে পৃথিবীর কেউ আদৌ কল্পনা করেনি, এমনকি তার পরের কয়েক শতাব্দীতেও তা ভাবেনি।

ইসলাম তার অনুসারীদের জ্ঞান-সাধনাকে তাদের জীবনে মৌলিক বিষয় হিসেবে নিতে নির্দেশ দিয়েছে। তাদেরকে আলেমদের বা জ্ঞানীদের এই পর্যায়ের মর্যাদা দিতে আদেশ দিয়েছে, যে ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ»

যে ব্যক্তি ইলম তলব বা জ্ঞান-অন্বেষণের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তার দ্বারা তাকে বেহেশতের পথসমূহের একটি পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতারা ইলম তলবকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ডানা পেতে দেয়। তা ছাড়া যারা আলেম তাদের জন্য আসমানে ও জমিনে যারা রয়েছে তারা সবাই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া করতে থাকে, এমনকি মাছসমূহ পানির মধ্যে থেকেও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। আলেমদের ফজিলত (বে-ইলম) আবেদদের (সাধকদের) ওপর তেমনই যেমন পূর্ণচন্দ্রের ফজিলত তারকারাজির ওপর এবং আলেমরা হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ কোনো দিনার বা দিরহাম মিরাস (উত্তরাধিকার) রেখে যান না, তারা মিরাসরূপে রেখে যান শুধু ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম গ্রহণ করেছে সে পূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে।[৫২৯]

---

৫২৯. আবু দাউদ, কিতাব : আল-ইলম, বাব : আল-হাসসু আলা তালাবিল-ইলম, হাদিস নং ৩৬৪১; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৬৮২; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২২৩; *আহমাদ*, হাদিস নং ২১৭৬৩; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৮৮। শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি হাসান।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর জাতীয় জ্ঞান-আন্দোলন অব্যাহত ছিল। তার উজ্জ্বল ফল ও পরিণতি আমরা দেখতে পাই। ইউরোপীয়দের জন্য এসব ব্যাপার স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। জাতীয় জ্ঞান-আন্দোলনের তিনটি পরিণতির কথা উল্লেখ করব। ইসলামই এগুলোর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল।

১. **গণগ্রন্থাগার :** দ্বীনের অন্তস্তল থেকে যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা রয়েছে তাতে উদ্দীপিত হয়ে মুসলিমগণ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারা সেখানে বিনামূল্যে পড়াশোনা করতেন, বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি থেকে যা খুশি অনুলিপি করে নিতেন। শুধু তা-ই নয়, বড় বড় খলিফা ও আমির নানান দেশ থেকে বিদ্যার্থীদের এসব গ্রন্থাগারে আমন্ত্রণ জানাতেন, তাদের আতিথেয়তার ব্যবস্থা করতেন এবং তাদের জন্য বিশেষ অর্থভাণ্ডার থেকে ব্যয় নির্বাহ করতেন। ইসলামি বিশ্বের সব শহরেই এসব গ্রন্থাগার অনেক ছিল। এগুলোর মধ্যে বিখ্যাত হলো বাগদাদ গ্রন্থাগার, কর্ডোভা গ্রন্থাগার, সেভিল[৫৩০] গ্রন্থাগার, কায়রো গ্রন্থাগার, কুদ্স বা বাইতুল মুকাদ্দাস গ্রন্থাগার, দামেশক গ্রন্থাগার, ত্রিপোলি গ্রন্থাগার, মদিনা গ্রন্থাগার, সানআ গ্রন্থাগার, ফেজ গ্রন্থাগার ও কায়রাওয়ান গ্রন্থাগার।

২. **বড় বড় ইলমি মজলিস (জ্ঞানচর্চার আসর) :** ইসলামপূর্ব যুগে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার মতো কোনো আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন না। এই মহান দ্বীনের আবির্ভাবের পর ইসলামি বিশ্বের সব অঞ্চলে ইলমি মজলিসের বিস্তার ঘটে। কখনো কখনো এসব মজলিসে এত বেশি সংখ্যক মানুষের সমাগম হতো যে তা কল্পনাও করা যেত না। উদাহরণ হিসেবে ইবনুল জাওযির[৫৩১] মজলিসের কথা বলা যায়। ইবনুল জাওযির মজলিসে এক লাখেরও বেশি মানুষ উপস্থিত হতেন। তারা সবাই ছিলেন সাধারণ মানুষ। হাসান আল-বসরি, আহমাদ ইবনে হাম্বল, শাফিয়ি, আবু হানিফা, ইমাম মালিক—তাদের

---

৫৩০. স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহর।-অনুবাদক

৫৩১. ইবনুল জাওযি : আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ আল-কুরাশি আত-তাইমি (৫১০-৫৯২ হি.)। হাম্বলি মাযহাবপন্থী ফকিহ। ইতিহাসবিদ ও কোষগ্রন্থপ্রণেতা। জ্ঞানের বহু শাখায় তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাগদাদেই তার জন্ম এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ২১, পৃ. ৩৬৫।

প্রত্যেকের মজলিসেই বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত হতেন। কখনো কখনো একটি মসজিদে একই সময়ে একাধিক ইলমি মজলিস বসত। কোনোটা তাফসিরুল কুরআনের মজলিস, কোনোটা ফিকহের মজলিস, অন্যটা নবীজির হাদিসের মজলিস, চতুর্থটা আকিদার মজলিস হলে পঞ্চমটা চিকিৎসাবিদ্যার মজলিস।

৩. **জ্ঞানের জন্য ব্যয় করা সদকাও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় বলে বিবেচিত হতো :** এই চিন্তা ও অনুভূতি থেকে উম্মাহর ধনী মানুষেরা মাদরাসার শিক্ষার্থীদের জন্য ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করতেন। এমনকি তারা তালিবুল ইলম ও শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থাগার নির্মাণ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য বহু সম্পত্তি ওয়াকফ করেছেন। এভাবে জ্ঞানের জন্য ব্যয় করা কেবল বিদ্যার্থীদের জন্য নয়, অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষদের জন্যও কল্যাণের দ্বাররূপে উন্মোচিত হয়।

ইসলামি বিশ্বে জ্ঞান-সম্পৃক্ততা ছিল ব্যাপক। সকলের কাছেই জ্ঞানচর্চা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ ও অবশ্যকর্তব্য। এ কারণেই গ্রন্থাগারের বিস্তার ঘটে এবং বিপুল সংখ্যক ইলমি মজলিস ও জ্ঞানচর্চার আসর অনুষ্ঠিত হয়। অজ্ঞতা, মূর্খতা দূরীভূত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলাম এবং বিজ্ঞানীদের চিন্তার পরিবর্তন

আগের অধ্যায়ে আমরা জেনেছি যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সভ্যতাসমূহের বিপরীতে জ্ঞানের একটি নতুন দর্শন উপস্থিত করেছে। বিষয়টি এই পর্যায়েই থেমে থাকেনি। জ্ঞানের এই নতুন দর্শন মুসলিমদেরকে গবেষণা ও তত্ত্বালোচনার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের মৌল নীতিমালা প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করেছে। এটার অস্তিত্বও পূর্বে ছিল না!

নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহে আমরা সেসব মূলনীতির প্রতি আমাদের সাধ্যমতো ইঙ্গিত করার চেষ্টা করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতি

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : প্রায়োগিক দিক

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বিজ্ঞানী দল

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : জ্ঞানের আমানত
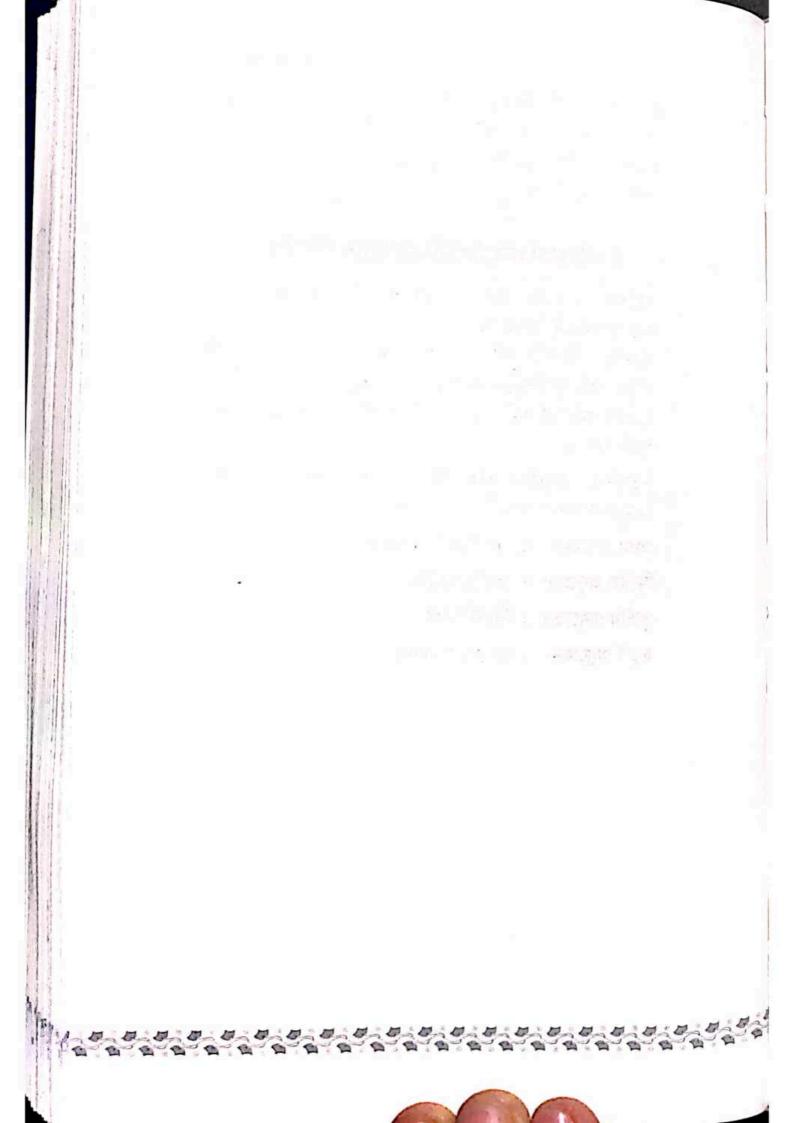
প্রথম অনুচ্ছেদ

পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতি

গবেষণার নিরিখে পরীক্ষাভিত্তিক জ্ঞান-পদ্ধতি বিশ্বের জ্ঞানযাত্রায় বিরাট ইসলামি সংযোজন বলে বিবেচিত হয়। এই জ্ঞান-পদ্ধতির ভিত্তি হলো অনুমান ও অনুসন্ধান, প্রমাণ, অভিজ্ঞতা ও উদাহরণ।

গ্রিক বা ভারতীয় বা অন্যদের যে জ্ঞান-পদ্ধতি ছিল মুসলিমদের জ্ঞান-পদ্ধতি তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এসব সভ্যতা অধিকাংশ সময়ই কিছু তত্ত্বসমূহ নির্ধারণ করে নিয়ে তাতেই ক্ষান্ত থেকেছে। সেগুলোকে প্রায়োগিকভাবে পরীক্ষা করে দেখার বা প্রমাণ করার চেষ্টা করেনি। এসবের সিংহভাগ ছিল তাত্ত্বিক দর্শন, সঠিক হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলোর কোনো প্রয়োগ ছিল না। ফলে শুদ্ধ তত্ত্ব ও ভ্রান্ত তত্ত্বের মধ্যে বিপজ্জনক সংমিশ্রণ ঘটে। মুসলিমগণ জ্ঞানগত দানসমূহ ও চারপাশের জাগতিক তথ্যসমূহ গ্রহণে পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এই প্রচেষ্টা থেকেই পরীক্ষামূলক জ্ঞান-পদ্ধতির নীতিমালার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমকালীন জ্ঞানযাত্রাও সেই নির্দেশনা অনুযায়ী অব্যাহত রয়েছে।

মুসলিমগণ পূর্ববর্তী তত্ত্বসমূহের ওপর পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তত্ত্বের প্রবক্তা যতই বিখ্যাত হোক তারা তা বিবেচনায় আনেননি। এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে অসংখ্য ভ্রান্তি উন্মোচিত হয়। অথচ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানী সম্প্রদায় এসব ভ্রান্তি যাপন করে আসছিলেন।

মুসলিম বিজ্ঞানীগণ পূর্ববর্তী তত্ত্বসমূহের সমালোচনা ও পরীক্ষানিরীক্ষা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন অনুমান স্থির করেছেন এবং সেগুলোকে পরীক্ষা করেছেন। সত্য ও বাস্তবের সঙ্গে অনুমানের নৈকট্য প্রমাণিত হলে তা তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। তারপর তারা এই তত্ত্বের পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। অবশেষে প্রমাণিত হয়েছে যে এটি সত্য ও বাস্তব, কোনো তত্ত্ব নয়। এই পন্থায় তারা ক্লান্তিহীনভাবে অসংখ্য পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ক্ষেত্রে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি তারা হলেন জাবির ইবনে হাইয়ান, আল-খাওয়ারিজমি, আল-রাযি, হাসান ইবনুল হাইসাম, ইবনে নাফিস এবং আরও অনেকে।

রসায়নবিদদের গুরু জাবির ইবনে হাইয়ান বলেছেন, এই শিল্পের মূল উৎকর্ষ হলো প্রয়োগ ও পরীক্ষা (এক্সপেরিমেন্ট)। কেউ (বৈজ্ঞানিক নীতি) প্রয়োগ ও পরীক্ষা না করলে সে কোনোকিছুতেই সফল হতে পারবে না।[৫৩২] *আল-খাওয়াসুল কাবির* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, এই গ্রন্থে আমরা বস্তুর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছি। আমরা কেবল এগুলো দেখেছি ও শুনেছি তা নয়, অথবা আমাদের বলা হয়েছে বা আমরা পড়েছি তাও নয়, বরং আমরা এগুলোর পরীক্ষা করেছি, অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। যা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে তা উপস্থাপন করেছি এবং যা ভ্রান্ত সাব্যস্ত হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করেছি। যে সিদ্ধান্ত বা ফলাফলে উপনীত হয়েছি সেটাও এই জাতির সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করেছি।[৫৩৩]

বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতিতে প্রায়োগিক পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতার কথা যিনি প্রথম বলেন তিনি হলেন জাবির ইবনে হাইয়ান। এ থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতির নীতিমালার ভিত প্রস্তুত হয়। একে 'পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতা' নামেও আখ্যায়িত করা হয়। জাবির বলতেন, যে বিজ্ঞানী পরীক্ষানিরীক্ষা (এক্সপেরিমেন্ট) করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেই প্রকৃত বিজ্ঞানী। যে বিজ্ঞানী পরীক্ষানিরীক্ষা (এক্সপেরিমেন্ট) করে না সে কোনো বিজ্ঞানী নয়। প্রতিটি আবিষ্কারককে পরীক্ষানিরীক্ষা করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। অভিজ্ঞতা অর্জনকারী আবিষ্কর্তা সফল হয় এবং অন্যরা ব্যর্থ হয়![৫৩৪]

জাবির ইবনে হাইয়ান পরীক্ষা (এক্সপেরিমেন্ট) ও অভিজ্ঞতাকে বৈজ্ঞানিক কর্মের ভিত্তি স্থির করেছেন এবং এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কার্যপ্রণালি প্রদান

---

৫৩২. জাবির ইবনে হাইয়ান, *কিতাব আত-তাজরিদ*, এরিক জন হোলমিয়ার্ড (Eric John Holmyard) কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত সংকলনগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। সংকলনগ্রন্থের নাম *The Alchemical Works of Geber*, অনুবাদক, রিচার্ড রাসেল, ১৬৭৮ সালে অনূদিত হলেও ১৯২৮ সালে প্যারিস থেকে মুদ্রিত হয়েছে। এটির ভূমিকা লিখেছেন টড প্রাটাম (Todd Pratum)।-অনুবাদক

৫৩৩. জাবির ইবনে হাইয়ান, *কিতাব আল-খাওয়াস*, পৃ. ২৩২।

৫৩৪. জাবির ইবনে হাইয়ান, *কিতাব আস-সাবয়িন*, পৃ. ৪৬৪।

করেছেন, যা তার পূর্বে গ্রিক বিজ্ঞানীরা পারেননি। তিনি কেবল চিন্তার ওপর নির্ভরশীল থাকেননি। কাদরি তাওকান বলেছেন, জাবির অন্যান্য বিজ্ঞানী থেকে অনন্য। কারণ তিনি যারা বৈজ্ঞানিক মূলনীতির আলোকে অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই বৈজ্ঞানিক মূলনীতির ভিত্তিতেই আমরা ল্যাবরেটরিজ ও পরীক্ষাগারে কাজ করে থাকি। তিনি যেমন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষা, অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনই ধীরতা-স্থিরতার সঙ্গে কাজ করতে, তাড়াহুড়া ও অস্থিরতা ত্যাগ করতেও আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রসায়নশাস্ত্রে নিযুক্ত বিজ্ঞানীর অবশ্যকর্তব্য হলো তত্ত্ব প্রয়োগ করা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা। এ ছাড়া যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা যাবে না।[৫৩৫]

সম্ভবত আল-রাযিই বিশ্বে প্রথম চিকিৎসক যিনি এই পরীক্ষামূলক পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি প্রাণীদের ওপর বিশেষ করে বানরের ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার করে তা মানুষের ওপর প্রয়োগ করার আগে প্রাণীদের ওপর প্রয়োগ করেছেন এবং এভাবে কল্যাণকর চিকিৎসাপদ্ধতি নির্বাচন করেছেন। এটি উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ইদানীংকালে এই পদ্ধতির স্বীকৃতি মিলেছে, এর আগে বিশ্ব তার স্বীকৃতি দেয়নি। আল-রাযি চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে গবেষণা-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন সে ব্যাপারে তিনি বলেছেন, আমরা যে ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছি তা যদি প্রচলিত তত্ত্বের বিপরীত হয় তাহলে ঘটনাটি মেনে নেওয়াই জরুরি, এমনকি প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের সমর্থন করতে গিয়ে সবাই প্রচলিত তত্ত্বকে গ্রহণ করে নিলেও।[৫৩৬] তিনি স্বীকারই করছেন যে, প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের মতামতের দ্বারা সকলেই বিভ্রমের শিকার হতে পারে এবং তারা তাদের তত্ত্ব গ্রহণ করে নিতে পারে। কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষার ফল (অভিজ্ঞতা) অনেক সময় তত্ত্বের বিপরীত হয়। এ কারণেই আমাদের জন্য আবশ্যক হলো তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করা—তা বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের হলেও—এবং অভিজ্ঞতা ও বাস্তবিক ঘটনাকে গ্রহণ করা এবং সেই ঘটনা বা অভিজ্ঞতার বিচার-বিশ্লেষণ করা ও তা থেকে উপকার লাভ করা।

---

৫৩৫. কাদরি তাওকান, *মাকামুল আকলি ইনদাল আরাব*, পৃ. ২১৭-২১৮।

৫৩৬. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ১, পৃ. ৭৭-৭৮।

বিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক (এক্সপেরিমেন্টাল) পদ্ধতি অবলম্বনের ফলেই ইবনুল হাইসামের গ্রন্থগুলোতে ইউক্লিড ও টলেমির তত্ত্বসমূহের প্রচুর সমালোচনা রয়েছে। যদিও প্রাচীন বিজ্ঞানে এই দুইজন সেরাদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনুল হাইসামের বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতি তার *আল-মানাযির* গ্রন্থের (Book of Optics) ভূমিকা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার চিন্তালব্ধ আদর্শ গবেষণা-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। ইবনুল হাইসাম বলেছেন, আমরা গবেষণার শুরুতে উপস্থিত বস্তুরাশি পরীক্ষানিরীক্ষা করি, স্পষ্ট দলিল-প্রমাণের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করি, আনুষঙ্গিক বিষয়াবলির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করি। দৃশ্যমান অবস্থায় বিশেষ কিছু চোখে পড়লে তা চয়ন করি, অর্থাৎ যা সাধারণ ও অপরিবর্তনশীল এবং স্পষ্ট অনুভবযোগ্য। তারপর পর্যায়ক্রমিক গবেষণায় ও পরিমাপ ব্যবহারে ধাপে ধাপে অগ্রসর হই, বস্তুর ভূমিকা পরীক্ষা করি, ফলাফল সংরক্ষণ করি। আমাদের সকল অনুসন্ধান, পরীক্ষানিরীক্ষা ও ফলাফল বিচারে ন্যায্যতা অবলম্বন করি, পক্ষপাত বা খেয়ালখুশির স্থান দিই না। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ও পরীক্ষিত সবকিছুতে সত্যকে খোঁজার চেষ্টা করি, প্রচলিত মতামতকে প্রাধান্য দিই না।[৫৩৭]

ইবনুল হাইসাম তার গবেষণায় অনুসন্ধান, অনুমান ও পরীক্ষানিরীক্ষার পন্থা অবলম্বন করেছেন। তার কোনো কোনোটির উদাহরণসহ বিবরণ দিয়েছেন তিনি। এগুলোই হলো আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল উপাদান। যে-সকল মুসলিম বিজ্ঞানী পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ভিত রচনা করেছেন ইবনুল হাইসাম তাদের অন্যতম। তিনি ফ্রান্সিস বেকন থেকে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে কেবল এগিয়েই নন, বরং তার চেয়ে অনেক বেশি উঁচু আসনে রয়েছেন। তার বোধশক্তি ফ্রান্সিস বেকনের চেয়ে ব্যাপক ছিল এবং চিন্তাও ছিল গভীর। যদিও ইবনুল হাইসাম ফ্রান্সিস বেকনের মতো তাত্ত্বিক দর্শনকে তেমন গুরুত্ব দেননি।

অধ্যাপক মুস্তাফা নাজিফ এর চেয়েও এগিয়ে গিয়ে বলেন, বরং ইবনুল হাইসাম প্রথমবার যা ধারণা করতেন তাতেই চিন্তার এতটাই গভীরতায় পৌঁছে যেতেন যে ওই বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে পারতেন। বিংশ শতাব্দীতে ম্যাক ও কার্ল পিয়ার্সন এবং অন্য আধুনিক বিজ্ঞানী-

---

৫৩৭. ইবনুল হাইসাম, *আল-মানাযির*, টীকা : আবদুল হামিদ সাবরাহ, পৃ. ৬২।

দার্শনিকেরা যা বলেছেন তা তিনি আগেই অনুধাবন করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঠিক প্রয়োগ এবং আধুনিক অর্থে ওই তত্ত্বের ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে অবগত ছিলেন।[৫৩৮]

বরং কতিপয় মুসলিম বিজ্ঞানী পরীক্ষানিরীক্ষাহীন অনভিজ্ঞতাপূর্ণ রচনাকে অযথার্থ গণ্য করেছেন। হিজরি অষ্টম শতাব্দীর (খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর) বিশিষ্ট রসায়নবিদ ছিলেন জালদাকি। তিনি প্রখ্যাত রসায়নজ্ঞ তুগরায়ি (মৃ. ৫১৩ হিজরি) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, তুগরায়ি ছিলেন প্রচণ্ড প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। কিন্তু তিনি সামান্যই পরীক্ষানিরীক্ষা (এক্সপেরিমেন্ট) করেছেন। এই কারণে তার রচনাবলি অযথার্থ ও অসূক্ষ্ম থেকে গেছে।[৫৩৯]

এভাবে মুসলিমগণ পরীক্ষামূলক (এক্সপেরিমেন্টাল) জ্ঞানপদ্ধতিতে উপনীত হয়েছিলেন। এর ফলেই বিশ্বমানবমণ্ডলী জানতে পেরেছে কীভাবে নির্ভরতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে জ্ঞানগত বাস্তবতায় পৌছানো যায়। যেখানে কল্পনা, ধারণা ও খেয়ালখুশির কোনো মূল্য নেই।

---

৫৩৮. কাদরি তাওকান, *মাকামুল আকলি ইনদাল আরাব*, পৃ. ২২৩।

৫৩৯. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ২১৮।

বিজ্ঞানী-পরিচিতি[৫৪০]

জাবির ইবনে হাইয়ান : আবু মুসা জাবির ইবনে হাইয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আল-কুফি (মৃ. ২০০ হিজরি/৮১৫ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন রসায়নবিদ ও দার্শনিক। সুফি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। কুফার বাসিন্দা হলেও খুরাসানি বংশোদ্ভূত। আরবের রসায়নবিদদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ। তিনি রসায়নবিদ্যা সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাতে রসায়ন ছাড়াও গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন, সংগীত ও সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা ছিল।[৫৪১]

আল-খাওয়ারিজমি : আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমি (১৬০-২৩২ হি./৭৭৬-৮৪৭ খ্রি.) ছিলেন গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও ইতিহাসবিদ। তিনি সংখ্যাকে পাটিগাণিতিক চরিত্র থেকে বীজগাণিতিক সমীকরণে এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বীজগণিত হলো ইসলামি সভ্যতায় তার শ্রেষ্ঠ অবদান। বীজগণিতকে আল-খাওয়ারিজমিই প্রথম গণিতশাস্ত্রের মধ্যে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে গড়ে তোলেন এবং এর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বীজগণিতের ভিত্তি স্থাপন করে আধুনিক গণিতের পথকে অনেকটাই সহজ করে তোলেন। তাকে গণিতের অন্যতম জনক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আল-খাওয়ারিজমিই প্রথম ইসলামি জগতে দশমিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। আরবি ভাষায় তার রচিত গ্রন্থাবলি প্রথমে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। পাশ্চাত্যসভ্যতায় ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমেই তার গবেষণার বিকাশ ঘটে। অ্যালগরিদমের উৎপত্তিই এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পাটিগণিতে আল-খাওয়ারিজমির অবদানের অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। তবে যে ল্যাটিন পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায় তাতে তার পাটিগণিত-বিষয়ক অধিকাংশ কাজই রয়েছে বলে মনে করা হয়। ১১২৬ সালে *'যিজ আস-সিন্দহিন্দ'*-এর স্প্যানিশ অনুবাদও করেন দার্শনিক

---

৫৪০. অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

৫৪১. দেখুন, ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৪৯৮-৫০৩; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ১০৩।

অ্যাডিলার্ড অব বাথ। এই অনুবাদের চারটি কপির দুটি ফ্রান্সে, একটি মাদ্রিদে ও একটি অক্সফোর্ডে সংরক্ষিত আছে।

যিজ আস-সিন্দহিন্দে মোট ৩৭টি অধ্যায় এবং ১১৬টি 'অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেবিল' বা জ্যোতির্বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় ছক রয়েছে। এসব সারণিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়াও বর্ষপঞ্জিকা-সম্পর্কিত তথ্যও রয়েছে। মূলত তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক সারণি তৈরি করার পদ্ধতিকে বলা হতো 'সিন্দহিন্দ'। এই সিন্দহিন্দের ওপর ভিত্তি করেই মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সারণি তৈরি করেছিলেন। আল-খাওয়ারিজমি তার ছকগুলোতে চন্দ্র-সূর্যের গতি ছাড়াও তখনকার সময়ে আবিষ্কৃত পাঁচটি গ্রহের গতি নিয়ে আলোচনা করেন। আল-খাওয়ারিজমির জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক কাজগুলোই পরবর্তীকালে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য পথিকৃৎ হয়ে থাকে।

ত্রিকোণমিতি নিয়ে আল-খাওয়ারিজমির কাজ কম হলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ত্রিকোণমিতিক ফাংশন সাইন ও কোসাইন-এর অনুপাত নির্ণয় করেন এবং তার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সারণিতে সেগুলো সংযুক্ত করেন। গোলকাকার ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে একটি বইও লেখেন।

আল-খাওয়ারিজমি *'কিতাব সুরাতুল-আরদ'* বা *পৃথিবীর চিত্র* গ্রন্থটি লেখেন ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে। 'জিয়োগ্রাফি' নামে পরিচিত এই বইটি টলেমির 'জিয়োগ্রাফি'-র ওপর ভিত্তি করে রচিত। বইটিতে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের ভিত্তিতে আবহাওয়া অঞ্চল ভাগ করা হয়েছে। টলেমির তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে রচনা করলেও তিনি টলেমির ভ্রান্তিগুলো সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। আল-খাওয়ারিজমি ভূমধ্যসাগর, আটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগর-সম্পর্কিত টলেমির ভুলগুলো সংশোধন করেন। *'কিতাব সুরাতুল-আরদ'*-এর একটি কপি বর্তমানে ফ্রান্সের স্ট্র্যাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

আল-রাযি : আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া আল-রাযি (২৫১-৩১৩ হি./৮৬৫-৯২৫ খ্রি.) ছিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানী। দুইশটির মতো গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন, যার প্রায় অর্ধেক চিকিৎসাশাস্ত্র-বিষয়ক। তার বহু গ্রন্থ লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়ে মধ্যযুগের বিজ্ঞানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তার লেখাতেই প্রথম বসন্ত রোগের আনুপূর্বিক চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিক বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন বাগদাদ শহরের প্রধান

হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক। প্লাস্টার অব প্যারিস জাতীয় পদার্থ তৈরি করে তার সাহায্যে ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়ার পদ্ধতির আবিষ্কর্তাও তিনি। রসায়নশাস্ত্রেও তার বিশেষ আগ্রহ ছিল, রসায়নবিদ্যার গোপন কথা নিয়ে তিনি বইও লিখেছিলেন। সংগীত-বিষয়েও তিনি একটি কোষগ্রন্থ রচনা করেন। তার জন্ম রায় শহরে এবং মৃত্যুবরণ করেন বাগদাদে।

আল-হাসান ইবনুল হাইসাম : আবু আলি আল-হাসান ইবনে আল-হাসান ইবনুল হাইসাম (৩৫৪-৪৩০ হি./৯৬৫-১০৩৯ খ্রি.) পশ্চিমা বিশ্বে তিনি আল-হাজেন নামে সমধিক পরিচিত। ইসলামি স্বর্ণযুগের তিনি ছিলেন একাধারে পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক। তাকে আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের জনক বলে আখ্যায়িত করা হয়। আবহাওয়াবিজ্ঞান ও চক্ষুবিজ্ঞানে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মূলত কায়রোতে বসে তিনি তার গবেষণার কাজ করছিলেন। ইবনুল হাইসাম ইউক্লিডের জ্যামিতির বিস্তৃত পর্যালোচনা করে দুটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি ইউক্লিডের '*এলিমেন্টস*' গ্রন্থের বিভিন্ন সংজ্ঞা, স্বতঃসিদ্ধ এবং সমান্তরাল রেখার তত্ত্ব ও স্বীকার্য নিয়ে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেন। তার শঙ্কুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ও ঘূর্ণায়মান বস্তুর আয়তন-সংক্রান্ত গবেষণাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শনেও তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি তার রচনায় আলোকবিজ্ঞানের যে পরিচিতি দিয়েছেন তা সেই সময়ের পক্ষে সবচেয়ে সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ বিবরণী। চোখের গঠন ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেছেন তাও যথেষ্ট আধুনিক। বিজ্ঞানের ইতিহাসেও তার আগ্রহ ছিল। তার লেখায় এমন একটি যন্ত্রের আলোচনা করা হয়েছে যার সাহায্যে আলোকিত বস্তুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। তিনি তুলাপাত্রসহ এমন একটি তুলারও বর্ণনা দিয়েছেন যা শতকরা ৯৯.৯ ভাগ নিখুঁত পরিমাপ দিতে পারত। যন্ত্রটি ব্যবহার করা হতো বিভিন্ন পদার্থের ঘনত্ব নির্ণয় করার জন্য। আল-হাইসামের দার্শনিক রচনা থেকে তার নিজের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা জ্ঞানপিপাসু, ধর্মপ্রাণ ও জীবনমুখী এক মানুষের।

ইবনে নাফিস (১২১৩-১২৮৮ খ্রি.) : আবুল হাসান আলাউদ্দিন আলি ইবনে আবুল হাযম আল-খালিদি আল-কারশি আদ-দিমাশকি। বিখ্যাত আরব বিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিদ। দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিশরের কায়রোতে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। তিনি প্রথম রক্ত-সঞ্চালন

সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা প্রদান করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়াও ব্যাকরণ, ফিকহ ও যুক্তিবিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন তিনি।

ইবনে সিনার চিকিৎসাবিশ্বকোষ আল-কানুনের Anatomy অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে নাফিস লেখেন *'শারহু তাশরিহি কানুন'* (شرح تشريح القانون)। এতে তিনি হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ভেতর দিয়ে রক্ত চলাচল সম্পর্কে গ্যালেন ও ইবনে সিনার তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেন। মানবদেহে বায়ু ও রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন ইবনে নাফিস। তিনি মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি, ফুসফুসের গঠনপদ্ধতি, শ্বাসনালি, হৃৎপিণ্ড, শরীরের শিরা-উপশিরায় বায়ু ও রক্তের প্রবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য দেন। ইবনে নাফিস *'আশ-শামিল ফিস-সানাআ আতিত-তিব্বিয়্যাহ'* নামে ৩০০ খণ্ডের এক বিশাল বিশ্বকোষ রচনার পরিকল্পনা করেন এবং খসড়াও তৈরি করেন। তিনি তার জীবদ্দশায় মাত্র ৮০ খণ্ড সমাপ্ত করে যেতে পেরেছিলেন। ইবনে নাফিস তার বিশ্বকোষের পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপি এবং সংগৃহীত সব গ্রন্থ আল-মানসুরি বিমারিস্তানে (হাসপাতালে) জমা দেন। এটি বর্তমানে 'কালাউন হাসপাতাল' নামে পরিচিত। ৮০ খণ্ডের মধ্যে মাত্র দুই খণ্ড এখন এই হাসপাতালে আছে, বাকি খণ্ডগুলো বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তার আরেকটি গ্রন্থ হলো *'বুগয়াতুত তালিবিন ওয়া হুজ্জাতুল মুতাতাব্বিন'*। এটি কয়েক শতাব্দীব্যাপী চিকিৎসাবিজ্ঞানের রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর তার আরেকটি কোষগ্রন্থ হলো *'আল-মুহাযযাব ফিল-কাহলিল মুজাররাব'*।

ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon 1561-1626) ইংরেজ আইনজ্ঞ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও নীতিজ্ঞ। বিজ্ঞানে বিপ্লবের কালে যাদের হাত দিয়ে বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক প্রায়োগিক দিকটির সমৃদ্ধি ঘটেছে বেকন তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রবক্তা। বেকন নিজেকে বিজ্ঞানী হিসেবে যতটা, তার চেয়ে বেশি সংস্কারের প্রবক্তারূপে দাবি করতেন। তিনি তার দার্শনিক সংস্কারের ঘোষণায় চারটি আদর্শের উল্লেখ করেন। তার প্রতি অভিযোগ রয়েছে যে,

তিনি তার লেখায় বিভিন্ন তত্ত্বের উৎস অকথিত রেখে নিজের মৌলিকতা অতিরঞ্জিত করেছেন। বেকনের জন্ম হয়েছিল অভিজাত পরিবারে। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন নিয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তখনই অ্যারিস্টটলের দর্শনের প্রতি তার বীতস্পৃহা জন্মে। ফ্রান্সে কিছুকাল কাটিয়ে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যোগ দেন ও নাইট উপাধি পান। তিনি ইংল্যান্ডের সলিসিটর জেনারেল, অ্যাটর্নি জেনারেল ও লর্ড চ্যান্সেলররূপে কাজ করেন এবং স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে ব্যারন উপাধি দেওয়া হয়। তার রচিত গ্রন্থ : *The Advancement and Proficience of Learning Divine and Human* (1605), *New Atlantis* (1626) ।

মুস্তাফা নাজিফ (১৮৯৩-১৯৭১ খ্রি.) মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের ওপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ওপর তার লেখা গ্রন্থ (علم الطبيعة) *ইলমুত তাবিআ* ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ওপর আরবিভাষায় লেখা এটি প্রথম গ্রন্থ। ১৯৩০ সালে তার আলোকবিজ্ঞানের ওপর ৮০০ পৃষ্ঠা সংবলিত বই প্রকাশিত হয়। এটিও আলোকবিজ্ঞানের ওপর আরবি ভাষায় প্রথম বই। মুস্তাফা নাজিফ ইবনুল হাইসামের রচনাবলি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন এবং রচনা করেন তার অবিস্মরণীয় গ্রন্থ (الحسن بن الهيثم: بحوثه وكشوفه البصرية) *আল-হাসান ইবনুল হাইসাম : বুহুসুহু ওয়া কুশুফুহুল বাসারিয়্যা*। তিনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিশরীয় বিজ্ঞানী। তার আগ্রহ ও গুরুত্বের বিষয় ছিল ইসলামি সভ্যতায় বৈজ্ঞানিক পুনর্জাগরণ। তিনি আরবি ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ।

কার্ল পিয়ারসন (Karl Pearson 1857-1936) ইংরেজ গণিতবিদ, জীববিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তিনি প্রথমে ফলিত গণিত ও বলবিদ্যার এবং পরে ইজেনিক্সের অধ্যাপক হিসেবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি হলেন জীবমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। '*বায়োমেট্রিকা*' নামে তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন। তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে : *Mathematical Contributions To The Theory of Evolution, Tables For Statisticians And Biometricians, The Grammar of Science*।

জালদাকি : ইযযুদ্দিন আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আইদামির আল-জালদাকি ছিলেন রসায়নবিদ ও দার্শনিক। তখনকার যুগে প্রখ্যাত রসায়নবিদদের অন্যতম। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

كنز الاختصاص في معرفة الخواص، البرهان في أسرار علم الميزان، كتاب المصباح في علم المفتاح، نهاية الطلب في شرح المكتسب وزراعة الذهب، لتقريب في أسرار التركيب في الكيمياء ।

তার অধিকাংশ গ্রন্থই বিশ্বের একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি খুরাসানের জালদাকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৪২ হিজরি/১৩৪১ খ্রিষ্টাব্দের পরে মৃত্যুবরণ করেন।[৫৪২]

তুগরায়ি : আবু ইসমাইল আল-হুসাইন ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইস্পাহানি (৪৫৩-৫১৩ হিজরি/১০৬১-১১১৯ হিজরি), তুগরায়ি নামে পরিচিত। কবি ও রসায়নবিদ। ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন। খলিফার প্রশাসনিক সচিব ছিলেন। রসায়ন ও জ্যোতির্বিদ্যা প্রসঙ্গে গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৫৪৩]

---

৫৪২. দেখুন, হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, খ. ২, পৃ. ১৫১২; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৫, পৃ. ৫।

৫৪৩. দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ১৮৫-১৯০; সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত*, খ. ১২, পৃ. ২৬৮-২৬৯।
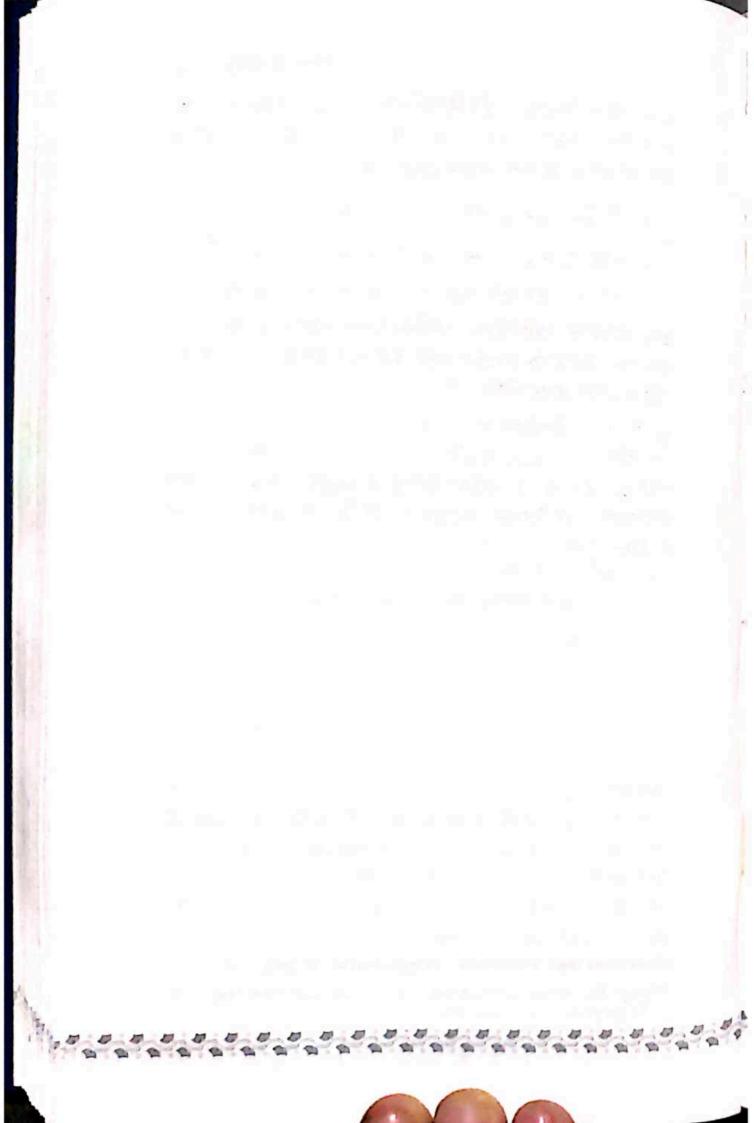
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

প্রায়োগিক দিক

'প্রায়োগিক দিক'-ও একটি নতুন পন্থা বলে পরিগণিত। মুসলিমদের যুগেই এই দিকটির বিকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে যখন গ্রিক ও ইউনানীয় সভ্যতার সঙ্গে মুসলিম সভ্যতার তুলনামূলক বিচার করা হয়েছে তখন এ দিকটি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

ইসলামপূর্ব প্রাচীন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলেন। এগুলোর মধ্যে অনেক তত্ত্ব কেবল সঠিকই ছিল না, বরং প্রতিভাদীপ্তও ছিল। তা সত্ত্বেও, এসব তত্ত্বের অধিকাংশই—শুদ্ধ ও যথার্থ হলেও—খণ্ডের পর খণ্ড শুধু কাগজের পৃষ্ঠাই ভরিয়ে তুলেছে, মানবজীবনের বাস্তবিকতায় তার কার্যকরী কোনো প্রয়োগ ঘটেনি। জ্ঞানবিজ্ঞানে এই দিকটিকেই আমরা প্রায়োগিক দিক বুঝিয়েছি। যার ফলে তত্ত্বগুলো বাস্তবিক রূপ নিয়ে মানুষের কাজে লাগে, তাদের উপকার সাধন করে। এমনকি তা তাদের বিনোদনের উপাদান হলেও।

মুসলিমদের আবির্ভাব ও বিশ্বজুড়ে তাদের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও সংস্কারকর্মের পর মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রতিটি সঠিক তত্ত্বকে উপকারী কার্যে রূপান্তরিত করেন। এতে মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

এই ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হলো মুসা ইবনে শাকিরের পুত্রদের উদ্ভাবনসমূহ। তারা সেচযন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন, পাহাড়ের উপরে পানি উত্তোলনের যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন এবং সূক্ষ্ম সময়দায়ক ঘড়ি আবিষ্কার করেছিলেন। অথচ তারা প্রাচীন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন। তা ছাড়া তারা নিজেরাই অনেক তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। অবশেষে এসব তত্ত্বের তাড়নাতে কেবল চিন্তাভাবনাতেই ক্ষান্ত না থেকে তারা সমাজের বরং গোটা মানববিশ্বের উপকার সাধনে সর্বতোভাবে ব্রতী হয়েছিলেন!

আয-যাহরাবিও মানবকল্যাণসাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি শল্যচিকিৎসার (অস্ত্রোপচারের) অসংখ্য যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছিলেন। উদাহরণত, তিনি তাত্ত্বিকভাবে জানতেন যে ওষুধ যখন সরাসরি রক্তের সঙ্গে মেশে তা অতি দ্রুত ক্রিয়া করে। এ ব্যাপারটিই তাকে ইনজেকশন আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করে। যাতে কার্যতই ওষুধ দ্রুততার সঙ্গে রক্তে পৌছানো যায়।[৫৪৪]

ইবনুল বাইতারও তত্ত্বের বেড়াজালে বন্দি না থেকে মানবকল্যাণে কাজ করেছিলেন। তিনি আশিটিরও বেশি ওষুধ আবিষ্কার করে চিকিৎসাশাস্ত্রের ময়দানে বিশাল অবদান রেখেছিলেন।[৫৪৫] জাবির ইবনে হাইয়ান কয়েকটি রাসায়নিক সমীকরণ (যৌগ) ব্যবহার করে বৃষ্টি-নিরোধক কোট (রেইন কোট) আবিষ্কার করেছিলেন। একইভাবে অগ্নি-নিরোধক কাগজও তৈরি করেছিলেন। এই কাগজ আগুনে জ্বলত না। অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এতে লেখা হতো।[৫৪৬]

আমরা অব্যবহিত পরেই মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রায়োগিক গবেষণার মূল্য বুঝতে পারি। যখন দেখি যে, গ্রিক ও ইউনানীয় জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা অসংখ্য দার্শনিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেছে, কিন্তু তারা তা বাস্তবিকতার বিচারে পরীক্ষানিরীক্ষা করেনি। ফলে এসব তত্ত্ব থেকে তারা নিজেরা যেমন উপকৃত হয়নি, মানুষও কোনো উপকার পায়নি।

---

৫৪৪. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৩১-৩৩২।

৫৪৫. মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ২, পৃ.৬৯২।

৫৪৬. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৪৭৫-৪৭৬।

বিজ্ঞানী-পরিচিতি[৫৪৭]

মুসা ইবনে শাকির : বানু মুসা নামে বিখ্যাত তিন প্রকৌশলীর পিতা। যৌবনে তিনি দস্যু ছিলেন। তারপর তওবা করে ফিরে আসেন এবং খলিফা মামুনের সেবাজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন। জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি ২০০ হিজরি/৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার ছেলেরা ছিল ছোট। তাদেরকে বাইতুল হিকমায় ভর্তি করানো হয়। তার তিন পুত্র :

১. আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে মুসা ইবনে শাকির : জ্যোতির্বিদ, প্রকৌশলী, ভূগোলবিদ ও শারীরবৃত্তবিদ।

২. আহমাদ ইবনে মুসা ইবনে শাকির : যন্ত্রপ্রকৌশলী।

৩. হাসান ইবনে মুসা ইবনে শাকির : প্রকৌশলী ও ভূগোলবিদ।[৫৪৮]

আয-যাহরাবি : আবুল আব্বাস খাল্‌ফ ইবনে আব্বাস আয-যাহরাবি আল-উন্দুলুসি (মৃ. ৪২৮ হি./১০৩৬ খ্রি.) ছিলেন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী। ইসলামি যুগের শ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসক। তাকে শল্যচিকিৎসার জনক বলে আখ্যায়িত করা হয়। ত্রিশ খণ্ডে রচিত (التصريف لمن عجز عن التأليف) *আত-তাসরিফু লি-মান আজাযা আনিত তালিফ* তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। শল্যচিকিৎসা বিষয়ে তিনিই প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই প্রথম রক্তক্ষরণ বা রক্তক্ষরণপ্রবণতার (হিমোফিলিয়া) পরম্পরীণ প্রকৃতি আবিষ্কার করেন।[৫৪৯]

ইবনুল বাইতার : জিয়াউদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ আল-মাকালি (৫৯৩-৬৪৬ হি./১১৯৭-১২৪৮ খ্রি.) ইবনুল বাইতার নামে পরিচিত ছিলেন। আন্দালুসীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তাকে উদ্ভিদতত্ত্ববিদদের

---

৫৪৭. অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

৫৪৮. দেখুন, ইবনুল আবারি, *মুখতাসারুদ দুওয়াল*, পৃ. ২৬৪; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৭, পৃ. ৩২৩।

৫৪৯. দেখুন, ইবনে বাশকুওয়াল, *আস-সিলাতু ফি তারিখিল উন্দুলুস*, খ. ১, পৃ. ২৬৪; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ৩১০।

গুরু মনে করা হয়। ফার্মাসিস্ট, ভেষজবিজ্ঞানী। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম। উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ে তার রচনাবলির সংকলন الجامع لمفردات الأدوية والأغذية বা الجامع في الأدوية المفردة। এটি লাতিন, ফরাসি, জার্মান ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি আন্দালুসের মাকালা শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন।[৫৫০]

---

৫৫০. দেখুন, ইবনে শাকির কুতুবি, *ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত*, খ. ২, পৃ. ১৫৯-১৬০।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বিজ্ঞানী দল

বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী দলও একটি নতুন মৌলিক বিষয়। মুসলিমগণ বিজ্ঞানী দল গঠনের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের চিন্তাপদ্ধতি ও গবেষণারীতিতে পরিবর্তন এনেছেন। ইতিহাসে মুসলিমরাই প্রথমবার পরিপূর্ণ বিজ্ঞানী দল গঠন করেছেন। এই দলে ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ের একাধিক বিজ্ঞানী। তারা অবশেষে আমাদের জন্য উপকারী আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতি উপহার দিয়েছেন। একাধিক বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীর সমন্বিত প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে এসব কাজ সম্ভব হতো না।

চিত্র নং-১
মুসা ইবনে শাকিরের পুত্রত্রয় রচিত 'আল-হিয়াল'

মুসা ইবনে শাকিরের পুত্ররা (মুহাম্মাদ, হাসান ও আহমাদ) ইতিহাস বিখ্যাত প্রথম বিজ্ঞানী দল। তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ছিলেন প্রকৌশল-বিজ্ঞানী, আহমাদ ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং হাসান ছিলেন যন্ত্রবিজ্ঞানী। তারা যৌথভাবে *'আল-হিয়াল'* (কৌশল) গ্রন্থটি[৫৫১] রচনা করেন। এতে আক্ষরিকভাবেই বিজ্ঞানী দলের আত্মার স্ফুরণ ঘটেছে এবং দলভিত্তিক সমন্বিত যৌথ কার্যাবলির নীতি বাস্তবিক রূপ লাভ করেছে। বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দলবদ্ধ কাজের সাক্ষ্য বহন করেছে। উপর্যুক্ত গ্রন্থ থেকে কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো।

মুহাম্মাদ, হাসান ও আহমাদ বলেছেন :

মডেল-১ : আমরা কীভাবে (কা'স্) বিকার[৫৫২] প্রস্তুত করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে চাই। এতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানীয় বা পানি ঢালা হয়। তারপর যদি এতে অতিরিক্ত সামান্য (মিসকাল) পরিমাণ পানীয় বা পানি ঢালা হয় তাহলে এতে যতটুকু আছে পুরোটাই উপচে পড়ে যায়।[৫৫৩]

মডেল-২ : খোলা নির্গমদ্বারযুক্ত পাত্র নির্মাণ করা হয় কীভাবে তা ব্যাখ্যা করতে চাই। এটিতে যতক্ষণ পানি ঢালা হয় ততক্ষণ নির্গমদ্বার দিয়ে কিছু বের হয় না, ঢালা বন্ধ করামাত্রই নির্গমদ্বার দিয়ে পানি বেরুতে শুরু করে, আবার ঢালা শুরু করলে পানি বেরুনো বন্ধ হয়ে যায়, ঢালা বন্ধ করে দিলে পানি বেরুতে শুরু করে, আবার ঢালতে শুরু করলে পানি বেরুনো বন্ধ হয়ে যায়।[৫৫৪] এভাবে চলতেই থাকে..।

মডেল-৩ : দুটি ফোয়ারা একইসঙ্গে কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করছি। এর একটি ফোয়ারা থেকে বর্শার মতো পানি নির্গত হয় এবং অপরটি থেকে আইরিস ফুলের মতো। এভাবে কতক্ষণ চলে। তারপর পরিবর্তন ঘটে। যে ফোয়ারা থেকে বর্শার মতো পানি বেরুচ্ছিল তা থেকে আইরিস ফুলের মতো পানি বেরোয় এবং যে ফোয়ারা থেকে আইরিস ফুলের মতো পানি বেরুচ্ছিল তা থেকে বর্শার মতো পানি বেরোয়। ঠিক

---

৫৫১. গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ : *Book of Ingenious Devices.*

৫৫২. বিকার (Beaker) : ঠোঁটওয়ালা বড় কাচের পাত্র। সাধারণত রাসায়নিক পরীক্ষায় ব্যবহৃত।

৫৫৩. বানু মুসা ইবনে শাকির, *কিতাব আল-হিয়াল*, টীকা : আহমাদ ইউসুফ হাসান ও অন্যরা, *মা'হাদুত তুরাসিল ইলমিল আরাবি*, ১৯৮১, টীকাকারের ভূমিকা, পৃ. ৫৭।

৫৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

আগের সময়ের অনুরূপ। যতক্ষণ পানির প্রবাহ থাকে ততক্ষণ এভাবে চলতে থাকে।

এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এগুলো একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানী দল হিসেবে মুসা ইবনে শাকিরের পুত্রদের মেধা ও বুদ্ধিমত্তার বৈদগ্ধ্য প্রমাণ করে। জ্ঞানের ময়দানে যূথবদ্ধতা বা যৌথ ও সমন্বিত কর্মের মূল্য ও গুরুত্বও বোঝা যায় এ থেকে।

কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ দক্ষতার সম্মিলন ও পূর্ণাঙ্গতা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারে সহায়ক হয়েছে। একাধিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একাধিক বিজ্ঞানী ছাড়া এসব আবিষ্কার সহজ হতো না। যেমন : পৃথিবীর ব্যাসের সূক্ষ্ম অনুমান অথবা বিশাল আকার অ্যাস্ট্রোল্যাব[৫৫৫] প্রস্তুত করা, যার দ্বারা অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে গ্রহনক্ষত্রের চলাচলের হিসাব করা যায়।

এমন যৌথ গবেষণা কেবল এই অনন্য বিজ্ঞান-শাখাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও তা বিস্তৃত ছিল। আমরা দেখতে পাই, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভেষজবিজ্ঞান, ওষুধবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সহযোগিতামূলক সমন্বয়ের ভিত্তিতে গবেষণা হয়েছে। ভূতত্ত্ববিদ, ভূগোলবিদ ও জ্যোতির্বিদেরাও সমন্বিত গবেষণা করেছেন।

বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী আল-রাযি ও তার শিষ্যদের মধ্যে যৌথ গবেষণার কাজ হয়েছে। ইবনে নাদিম[৫৫৬] তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আল-রাযি ছিলেন তার যুগের অনন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব। তিনি পূর্ববর্তীদের জ্ঞান, বিশেষ করে চিকিৎসা-বিষয়ক জ্ঞান সংকলন করেছেন। তিনি দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতেন...। তিনি মজলিসে বসতেন, তার সামনে তার ছাত্ররা থাকত। তার ছাত্রদের পেছনে তাদের ছাত্ররা থাকত। তাদের পেছনে থাকত অন্য ছাত্ররা। কোনো একজন অসুস্থ লোক এসে প্রথমে যাদের পেত তাদের কাছে রোগ-লক্ষণ বর্ণনা করত। তাদের কাছে সমাধান থাকলে তারা বলে দিত। অন্যথায় অসুস্থ লোকটি তাদের

---

৫৫৫. গ্রহনক্ষত্রের উন্নতি নির্ণয়ের জন্য মধ্যযুগীয় যন্ত্রবিশেষ।

৫৫৬. যেমনটি পূর্বে গিয়েছে, বিশুদ্ধ মতানুসারে তার নাম নাদিম, ইবনে নাদিম নয়। দেখুন, *লিসানুল মিযান*, খ. ৯, পৃ. ২১৪।

ডিঙিয়ে অন্যদের কাছে আসত। তারা সঠিক সমাধান দিলে তো ভালোই, অন্যথায় আল-রাযি সে ব্যাপারে কথা বলতেন। তিনি ছিলেন অমায়িক, সহানুভূতিশীল, দয়ালু। দরিদ্র ও রোগীদের প্রতি অত্যন্ত মমতাময় ছিলেন। প্রয়োজনে তিনি রোগীদের অস্ত্রোপচার করতেন এবং তাদের সুস্থ করে তুলতেন।[৫৫৭]

আল-রাযির ছাত্ররা ছিলেন অসংখ্য বিজ্ঞানী দলের মতো। প্রত্যেক দল উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে তার মত পেশ করত এবং অবশেষে তারা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছত। তাদের সবার শিরোভূষণ হয়ে বসে থাকতেন আল-রাযি, তিনি তাদের বক্তব্য শুনতেন, পর্যালোচনা করতেন এবং ভুল হলে ঠিক করে দিতেন। জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি তাদের সঙ্গে থাকতেন এবং তাদের সবকিছু বিস্তারিত বুঝিয়ে দিতেন।

জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই যে কেবল বিজ্ঞানী দল ছিল তা নয়, শরিয়তের বিভিন্ন শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন দল ছিল। আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন ও সুন্নাহ, হাদিস, ফিকহ ও আকিদার নানা ধরনের সমস্যার সমাধানে আলেমদের বড় বড় দল একত্র হতেন এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। ফলে জ্ঞান-আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং তা দ্রুতই পরিণতিতে পৌঁছে।

---

৫৫৭. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৩৫৬।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

জ্ঞানের আমানত

জ্ঞানের আমানত সুরক্ষার যে নীতি তাও একটি নতুন নীতি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এই নীতির কথা জানা ছিল না। কারণ ধর্মাদর্শ ও নৈতিকতার অনুপস্থিতিতে যে-কেউ মুনাফা ও খ্যাতির আশায় বিভিন্ন আবিষ্কার নিজের নামে চালিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি।

জ্ঞানগত আমানতের দাবি হলো চিন্তার ও জ্ঞানের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান। গবেষণা ও আবিষ্কার তার কর্তার নামেই যুক্ত হবে এবং তার নামেই পরিচিতি পাবে। কিন্তু মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা ও আবিষ্কার চুরি যাওয়ার ফলে বেশ দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। তাদের আবিষ্কার ও গবেষণা পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ তারা মুসলিম বিজ্ঞানীদের কয়েক দশক বা কয়েক শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আমাদের মহান বিজ্ঞানী ইবনে নাফিসের ক্ষেত্রে যে জঘন্য চুরির ঘটনাটি ঘটেছে তা কারও অজানা থাকার কথা নয়। তিনি ফুসফুসীয় (রক্ত) সংবহন (pulmonary circulation) আবিষ্কার করেন এবং তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে *'শারহু তাশরিহিল কানুন'* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তার এই আবিষ্কার কয়েক শতাব্দীব্যাপী অগোচরেই থেকে যায়। পরবর্তীকালে এই আবিষ্কার ভুলবশত ব্রিটিশ চিকিৎসাবিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়। তিনি ইবনে নাফিসের মৃত্যুর তিন শতাব্দীরও বেশি পরে রক্ত সংবহন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেন। মানুষ যুগের পর যুগ এই ভ্রান্তির মধ্যেই থেকে যায়, অবশেষে মিশরীয় চিকিৎসক মহিউদ্দিন তাতাবি এই সত্য উদ্ঘাটন করেন।

ইতালীয় চিকিৎসক আলাপ্যাগো ৯৫৪ হিজরিতে/১৫৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইবনে নাফিসের *'শারহু তাশরিহিল কানুন'* গ্রন্থের কিছু অংশ লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এই চিকিৎসক ত্রিশ বছরের বেশি সময় রুহায় অবস্থান করেন এবং আরবি ভাষা আয়ত্ত করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল আরবি থেকে লাতিনে অনুবাদ করা। তিনি যে অংশগুলো অনুবাদ করেন তাতে

ফুসফুসীয় রক্ত সংবহন-সংক্রান্ত অধ্যায়টিও ছিল। তবে তার এই অনুবাদ হারিয়ে যায়।

চিত্র নং-২
ইবনে নাফিস রচিত 'আশ-শিফা'

মাইকেল সারভেটাস (Michael Servetus 1511-1553) নামের একজন স্প্যানিশ বিজ্ঞানী–যিনি চিকিৎসক ছিলেন না–প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। তিনি আলাপ্যাগো কর্তৃক অনূদিত ইবনে নাফিসের কিতাবের সন্ধান পান। সারভেটাস খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাস করতেন না এবং ত্রিত্ববাদের সমালোচনা করতেন। তিনি ভিন্নধর্মী চিন্তাভাবনা লালন করতেন। ফলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি বিভিন্ন শহরে নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। ১০৬৫ হিজরিতে/১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সারভেটাসকে পুড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং তার অধিকাংশ পুস্তকও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় তার কিছু গ্রন্থ পুড়ে যাওয়া থেকে বেঁচে যায়। তার মধ্যে আলাপ্যাগো কর্তৃক অনূদিত ইবনে নাফিসের রক্ত সংবহন-সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপিটিও ছিল। গবেষকেরা বিশ্বাস করে বসলেন যে রক্ত সংবহন পদ্ধতি আবিষ্কারের কৃতিত্ব প্রথমত এই স্প্যানিশ বিজ্ঞানী সারভেটাসের এবং দ্বিতীয়ত ব্রিটিশ চিকিৎসক উইলিয়াম হার্ভের। ১৩৪৩ হিজরি/১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ধারণা চালু থাকল। অবশেষে মিশরীয় চিকিৎসক ড. মহিউদ্দিন তাতাবি এই ভুল ধারণা দূর করেন এবং প্রাপ্য অধিকার তার প্রাপককে ফিরিয়ে দেন। তিনি বার্লিনের গ্রন্থাগারে ইবনে নাফিসের *'শার্হি তাশরিহিল কানুন'* গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন এবং এ বিষয়ে তার পিএইচডি অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেন। তিনি এই মহাগ্রন্থের একটি বিশেষ দিকের প্রতি সযত্ন আলোকপাত করেন। তা হলো ফুসফুসীয় রক্ত সংবহন পদ্ধতি। এটা ১৩৪৩ হিজরির/১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা।

তাতাবির গবেষণাপত্র দেখে তার শিক্ষক ও পর্যবেক্ষকগণ বিমূঢ় হয়ে পড়েন। এতে যে তথ্য রয়েছে তা জেনে তারা হতচকিত হয়ে যান, যেন তারা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। আরবি ভাষা তাদের জানা না থাকায় গবেষণাপত্রের একটি কপি জার্মান প্রাচ্যবিদ ম্যাক্স মেয়েরহোফের কাছে পাঠান। মেয়েরহোফ তখন কায়রোতে ছিলেন। তারা তার কাছে গবেষক তাতাবি যা লিখেছেন সে সম্পর্কে অভিমত চান। মেয়েরহোফ ড. তাতাবিকেই জোরালো সমর্থন করেন।

ড. তাতাবি তার একটি গবেষণায় লিখেছেন, আমাকে যে বিষয়টি বিস্ময়াভিভূত করে তা এই যে, সারভেটাসের বক্তব্যের কিছু কথা হুবহু ইবনে নাফিসের বক্তব্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, বরং তার অনুরূপ ছিল, যার

আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়েছে...। সারভেটাস স্বাধীন চিন্তার মানুষ ছিলেন, চিকিৎসক ছিলেন না। তিনি ইবনে নাফিসের ভাষাতেই ফুসফুসীয় রক্ত সংবহন পদ্ধতির উল্লেখ করেন, অথচ ইবনে নাফিস তার দেড় শতাব্দীরও বেশি আগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

মেয়েরহোফ ইবনে নাফিসের প্রচেষ্টার যে সত্য আবিষ্কৃত হলো তা ঐতিহাসিক জর্জ সার্টনের কাছে পাঠিয়ে দেন। সার্টন তা তার বিখ্যাত গ্রন্থ হিস্ট্রি অব সাইন্সের (*History of Science*) শেষ খণ্ডে[৫৫৮] প্রকাশ করেন।[৫৫৯]

আলদো মিলি[৫৬০] উভয়ের মূল বক্তব্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বলেন, ইবনে নাফিস ফুসফুসীয় সংবহনের যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন তা আক্ষরিকভাবে সারভেটাসের বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। সুতরাং স্পষ্ট সত্য এই যে, ফুসফুসীয় রক্ত সংবহন পদ্ধতির আবিষ্কার ইবনে নাফিসেরই, সারভেটাস বা হার্ভের নয়।[৫৬১]

মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে জ্ঞানগত নিরাপত্তাহীনতা ও এমন সব চৌর্যবৃত্তির ঘটনা কম নয়। আমরা এখানে সেসবের প্রতি সংক্ষেপে কিছু ইঙ্গিত দিয়ে যাব :

- ফরাসি ইহুদি ডুরখেইমকে সমাজবিজ্ঞানের জনক অভিহিত করা হয়। অথচ যিনি এই বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা ও ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা তিনি হলেন মুসলিম মনীষী ইবনে খালদুন। এই বিষয়ে আলোচনা আসছে।
- গতিসূত্রসমূহের (Laws of Motion) আবিষ্কর্তা বলা হয় আইজ্যাক নিউটনকে, অথচ দুই মুসলিম বিজ্ঞানী এসব সূত্র আবিষ্কার করেন।

---

৫৫৮. গ্রন্থটি ৯ খণ্ডে প্রকাশিত।-অনুবাদক

৫৫৯. মুহাম্মাদ আস-সাদিক আফিফি, তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন, পৃ. ২০৮; আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, রুউওয়াদু ইলমিত তিব্ব ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাতি ওয়াল-ইসলামিয়্যা, পৃ. ৪৫১।

৫৬০. Aldo Mieli (১৮৭৯-১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ) : ইতালীয় প্রাচ্যবিদ। *La science arabe et son role dans l'evolution scientifique mondiale* (العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي) গ্রন্থের প্রণেতা।

৫৬১. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, রুউওয়াদু ইলমিত তিব্ব ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাতি ওয়াল ইসলামিয়্যা, পৃ. ৪৫১।

তারা হলেন ইবনে সিনা ও হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা। পরবর্তী আলোচনায় এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

- আমরা রজার বেকনের[৫৬২] বিখ্যাত গ্রন্থ *Opus Majus*-এ একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় পাই—সেটি পঞ্চম অধ্যায়—যা ইবনে হাইসামের *'আল-মানাযির'* গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ ছাড়া কিছু নয়। অথচ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মূল লেখকের প্রতি কোনো ইঙ্গিতও করা হয়নি।

এ সবকিছু মুসলিমদের সঙ্গেই ঘটেছে। অন্যদিকে মুসলিমদের নীতি ছিল ভিন্ন। তা হলো জ্ঞানের আমানত সুরক্ষা এবং গবেষণা ও কৃতিত্ব তার প্রাপককে প্রদানের নীতি। এই নীতির ফলে কোনো মুসলিম বিজ্ঞানীই অন্যান্য সভ্যতার বিজ্ঞানীদের কারও কোনো আবিষ্কার বা কোনো তত্ত্ব নিজের বলে দাবি করেননি। বরং তারা যাদের তত্ত্ব উদ্ধৃত করেছেন তাদের নাম উল্লেখ করেছেন, ঋণ স্বীকার করেছেন। ওইসব জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর নামে তাদের গ্রন্থাবলি ভরপুর। যেমন : হিপোক্রেটিস, গ্যালেন, সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল প্রমুখ। মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন, তাদের প্রাপ্য হক দিয়েছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। গ্রন্থ রচনায় কিছুটা অবদান থাকলেও এবং সামান্য তথ্য নিলেও তাদের কারও নামই অনুল্লেখ থাকেনি।

উদাহরণস্বরূপ মুসা ইবনে শাকিরের পুত্ররা (বানু মুসা) তাদের معرفة مساحة الأشكال البسيطة والكروية *(The Book of the Measurement of Plane and Spherical Figures)* গ্রন্থে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তারা বলেছেন, আমাদের গ্রন্থে আমরা যা-কিছুর বর্ণনা দিয়েছি তা আমাদেরই গবেষণা। তবে ব্যাসের পরিধি নির্ণয়ের সূত্র আমাদের নয়। এটি আমরা আর্কিমিডিস থেকে নিয়েছি। (ত্রিভুজে অঙ্কিত বিভিন্ন পয়েন্টের) দুটি পয়েন্টের মধ্যে অঙ্কিত যেকোনো পরিমাণ একটি অনুপাত তৈরি করবে[৫৬৩]—এই সূত্র আমরা মেনেলাউস[৫৬৪] থেকে নিয়েছি।[৫৬৫]

---

৫৬২. Roger Bacon (১২১৪-১২৯২ খ্রি.) : ইংরেজ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। মধ্যযুগে বিজ্ঞানের বিকাশে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচিত। দৃষ্টিবিজ্ঞানের পথিকৃৎদের অন্যতম।

৫৬৩. এই সূত্র বুঝতে হলে মেনেলাউস কর্তৃক প্রদত্ত ত্রিভুজের সূত্র (Theorem of Menelaus) জানতে হবে।

মুসলিম মনীষী বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে কালজয়ী গ্রন্থ (الحاوي في الطب) *আল-হাবি ফিত-তিব্ব*-এর রচয়িতা আবু বকর আল-রাযি কী বলেছেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তিনি বলেছেন, আমি এই গ্রন্থে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নানাবিধ অসংখ্য বিষয় সংকলন করেছি। আমি প্রাচীন চিকিৎসক-দার্শনিকদের মধ্যে হিপোক্রেটিস, গ্যালেন, আরমাসুস ও অন্যদের গ্রন্থাবলি থেকে তথ্য নিয়েছি এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন নতুন বিষয় সংযোজনকারী, যেমন পল[৫৬৬], আহারোন, হুনাইন ইবনে ইসহাক, ইয়াহইয়া ইবনে মাসাওয়াইহ প্রমুখ।[৫৬৭]

আমরা ইসলামি গ্রন্থাগারগুলোতে ভিনদেশি বিজ্ঞানীদের অসংখ্য অনূদিত গ্রন্থ দেখতে পাই। সেগুলো তাদের নামেই অনূদিত হয়েছে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা সেসব গ্রন্থে টীকা ও বিশ্লেষণ যুক্ত করেছেন, অথচ মূল বক্তব্যে হাত দেননি। যাতে মূল লেখকের চিন্তাভাবনা অবিকৃতরূপে সুরক্ষিত থাকে। যেমন মুসলিম বিজ্ঞানী আল-ফারাবি অ্যারিস্টটলের *'মেটাফিজিক্স'* *(Metaphysics)* গ্রন্থে টীকা সংযুক্ত করেছেন।

জ্ঞানের সম্মানজনক আমানত সুরক্ষা কার্যতই মুসলিম বিজ্ঞানীদের সুকীর্তি। যেসব মৌলিক নীতি অনুসরণ করে মুসলিমগণ পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের চিন্তার রীতি ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধন করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো জ্ঞানের আমানত সুরক্ষা। বিশেষ করে যখন অন্যান্য জাতির সামসময়িক প্রজন্ম তাদের পিতৃপুরুষদের ইতিহাস জানতে আগ্রহী ছিল না, তখন তাদের গবেষণা ও আবিষ্কার চুরি করাটা সহজ ব্যাপারই ছিল। কিন্তু মুসলিম বিজ্ঞানীরা ছিলেন গভীর নীতিবোধ ও সততার ওপর অধিষ্ঠিত।

---

৫৬৪. Menelaus of Alexandria (৭০-১৪০ খ্রি.) : গ্রিক গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ। মুসলিমগণ গোলাকার কাঠামো মাপতে ও ল্যাবরেটরিতে তার রচনাবলি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। দেখুন, হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, খ. ১, পৃ. ১৪২।

৫৬৫. বানু মুসা ইবনে শাকির, *কিতাবু মারিফাতি মাসাহাতিল আশকাল*, সম্পাদনা : নাসিরুদ্দিন তুসি, পৃ. ২৫।

৫৬৬. Paul of Aegina (৬২৫-৬৯০ খ্রি.) : বাইজান্টীয় গ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞানী। *Medical Compendium in Seven Books* তার রচিত চিকিৎসা-বিশ্বকোষ।

৫৬৭. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ১, পৃ. ৭০।

ব্যক্তি-পরিচিতি[৫৬৮]

উইলিয়াম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) : ইংরেজ চিকিৎসক ও শারীরবিজ্ঞানী। রক্ত সংবহন বিষয়ে হার্ভের বিখ্যাত গ্রন্থ *'De Motu Cordis'* প্রকাশিত হয় ১৬২৮ সালে। ইউরোপে তিনি ফুসফুসীয় রক্ত সংবহন ও হৃৎপিণ্ড যে পাম্পের মতো কাজ করে তার আবিষ্কর্তা বলে পরিচিত।

মহিউদ্দিন আত-তাতাবি : তিনি জার্মানির ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইবনে নাফিসের ওপর অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ইবনে নাফিস সম্পর্কে অজানা সব তথ্য তিনি আবিষ্কার করেন। তার জন্ম ১৮৯৬ সালে এবং ১৯৪৫ সালে তিনি টাইফাস রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

ম্যাক্স মেয়েরহোফ ১২৯১-১৩৬৪ হিজরি (Max Meyerhof 1874-1945) : জার্মান চক্ষু-চিকিৎসক ও প্রাচ্যবিদ। ইউরোপের বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদদের অন্যতম। আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯০৩ সালে মিশর ভ্রমণ করেন এবং কায়রোতে অবস্থান করেন। কায়রোতেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ইসলামি সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ভেষজবিজ্ঞানের ইতিহাসের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

জর্জ সার্টন (George Sarton 1884-1956) : বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসবেত্তাদের অন্যতম। বেলজিয়ান বংশোদ্ভূত আমেরিকান। রসায়নবিদ, প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ। ১৯১৯ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি কার্নেগি ইনস্টিটিউট অব ওয়াশিংটনে গবেষণা সহকারী ছিলেন। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা দিয়েছেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ *হিস্ট্রি অব সাইন্স*।

এমিল ডুর্খেইম (Émile Durkheim 1858-1917) : University of Bordeaux-এ এবং প্যারিসের সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে একটি বিধিবদ্ধ বিদ্যায়তনিক বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা

---

৫৬৮. অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

করেন। পাশ্চাত্যে তিনি ম্যাক্স ওয়েবার, কার্ল মার্ক্সের সঙ্গে একত্রে সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত।

হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা : আবুল বারাকাত হিবাতুল্লাহ ইবনে আলি ইবনে মালকা আল-বালাদি আল-বাগদাদি (৪৮০-৫৬০ হি./১০৮৬-১১৬৫ খ্রি.)। 'আওহাদুয যামান' (যুগের অনন্য) উপাধিতে ভূষিত। চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। বসরায় জন্মগ্রহণ করেন ও বেড়ে ওঠেন। পরে বাগদাদ ভ্রমণ করেন। ইহুদি ছিলেন, শেষ বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আব্বাসি খলিফা মুসতানজিদ বিল্লাহ ও অন্য খলিফাদের প্রাসাদে কাজ করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

المعتبر في الحكمة، اختصار التشريح من كلام جالينوس، كتاب الأقراباذين، رسالة في العقل وماهيته، كتاب التفسيرا [৫৬৯]

হিপোক্রেটিস Hippocrates of Kos or Hippocrates of Cos II. (৪৬০-৩৭০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) : তার পিতার নাম Heraclides Ponticus এবং মায়ের নাম Praxitela। কোস দ্বীপের এক পুরোহিত-বৈদ্য পরিবারে তার জন্ম এবং পিতার কাছ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে হাতেখড়ি। তারপর নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে তিনি রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ-নির্ভর তথ্যকে একটি নিয়মাবদ্ধ তাত্ত্বিক কাঠামোয় রূপ দিতে সচেষ্ট হন। এইভাবে তিনি হলেন বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে '*দা প্রগ্নস্টিকস*', '*অন এয়ারস ওয়াটারস অ্যান্ড প্লেসেস*', '*অন ফ্র্যাকচারস*', '*অন সার্জারি*' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তার ছাত্র ও শিষ্যদের লেখা বহু গ্রন্থও তার নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে কার্যকারণ ফলাফল, পারিবেশিক অবস্থার বিশ্লেষণ ও নিদানিক পর্যবেক্ষণের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। তার আরেক কালজয়ী কীর্তি হলো চিকিৎসকদের জন্য রচিত শপথবাক্য, যা হিপোক্রেটীয় অনুজ্ঞা নামে পরিচিত এবং ডাক্তাররা আজও পেশায় প্রবেশ করার আগে এই শপথবাক্য পাঠ করে থাকেন। এই অনুজ্ঞা থেকে দায়িত্বসচেতনতা, নীতিবোধ ও মানবিকতার এক চমৎকার উদ্ভাস ঘটে।

---

৫৬৯. দেখুন, ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ২, পৃ. ৩১৩-৩১৬; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৮, পৃ. ৭৪।

সব মিলিয়ে পরবর্তী বিজ্ঞান ও বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর তার প্রভাব অনস্বীকার্য।

গ্যালেন (Galen Aelius Galenus or Claudius Galenus 129-200): গ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞানী, শল্যচিকিৎসক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী। অঙ্গব্যবচ্ছেদবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, রোগবিজ্ঞান, ওষুধবিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিকাশ ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। তিনি দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া ও করিন্থ পরিভ্রমণ করে ১৬৪ খ্রিষ্টাব্দে রোমে চলে এসে রোমান সম্রাটের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হন। দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে তিনি প্রায় চারশটি পাণ্ডুলিপি রচনা করেন।

আর্কিমিডিস (২৮৭-২১২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) : একজন গ্রিক গণিতবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক। যদিও তার জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা গেছে, তবুও তাকে ক্ল্যাসিক্যাল যুগের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পদার্থবিদ্যায় তার উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে রয়েছে স্থিতিবিদ্যা আর প্রবাহী স্থিতিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন ও লিভারের কার্যনীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যাপ্রদান। পানি তোলার জন্য আর্কিমিডিসের স্ক্রু পাম্প, যুদ্ধকালীন আক্রমণের জন্য সিজ ইঞ্জিন ইত্যাদি মৌলিক যন্ত্রপাতির ডিজাইনের জন্যও তিনি বিখ্যাত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তার নকশাকৃত আক্রমণকারী জাহাজকে পানি থেকে তুলে ফেলার যন্ত্র বা পাশাপাশি রাখা একগুচ্ছ আয়নার সাহায্যে জাহাজে অগ্নিসংযোগের পদ্ধতি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

হুনাইন ইবনে ইসহাক : আবু যায়দ হুনাইন ইবনে ইসহাক আল-ইবাদি (৮১০-৮৭৩ খ্রি.)। আরব নেস্টোরিয়ান খ্রিষ্টান। বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, অনুবাদক, ঐতিহাসিক। ইরাকের হিরার অধিবাসী। খলিফা মামুনের সময়ে অনুবাদ বিভাগের প্রধান ছিলেন। গ্রিক ও ফারসি গ্রন্থাবলি আরবি ও সুরয়ানি ভাষায় অনুবাদ করেছেন।[৫৭০]

---

৫৭০. দেখুন, ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ূনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ২, পৃ. ১২৮-১৩৭; ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৪০৯।

ইয়াহইয়া ইবনে মাসাওয়াইহ : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে মাসাওয়াইহ বা ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহ (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.)। আসিরিয়ান নেস্টোরিয়ান খ্রিষ্টান, চিকিৎসক। ভেষজবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ। সুরয়ানি বংশোদ্ভূত ও আরবে বেড়ে ওঠা। খলিফা হারুনুর রশিদ ও মামুনের চিকিৎসক ছিলেন। মুতাওয়াক্কিলের যুগেও চিকিৎসা করেছেন। ইরাকের সামাররায় ৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে/২৪৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।[৫৭১]

।। প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।।

08.07.'21
9:47 pm.

---

৫৭১. দেখুন, ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ২, পৃ. ১০৯-১২২; ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৪১১।
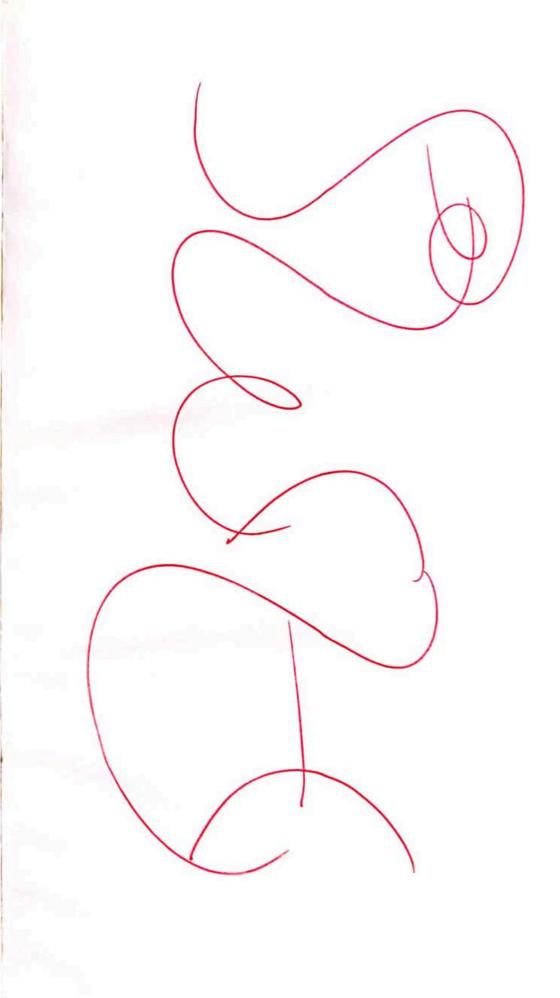
ড. রাগিব সারজানির প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধ শতাধিক, যার বেশ কয়েকটি অনূদিত হয়েছে ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ইন্দোনেশীয়, রুশ ও তুর্কি ভাষায়। বাংলাভাষীদের জন্য ড. রাগিব সারজানির বইগুলো অনুবাদ করে প্রকাশের উদ্যোগ নেয় মাকতাবাতুল হাসান। এর ধারাবাহিকতায় একে একে প্রকাশ হয়েছে ২৩টি বই। বাকি বইগুলো প্রকাশের পথে।

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে ড. রাগিব সারজানির অনবদ্য রচনা। এতে লেখক ইসলামি সভ্যতার বিশ্বজয়ী অবদানগুলোর নানাদিক তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি ২০০৯ সালে (মিশর ধর্মমন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুপ্রিম কাউন্সিল ফর ইসলামিক অ্যাফেয়ার্সের পক্ষ হতে) 'মুবারক অ্যাওয়ার্ড' ফর ইসলামিক স্টাডিজ এবং ২০১৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে ইন্দোনেশীয় ভাষায় অনূদিত 'শ্রেষ্ঠ বই' পুরস্কারে ভূষিত হয়। ড. রাগিব সারজানির এ গ্রন্থটি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার পাশাপাশি পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, ইন্দোনেশীয়, মান্দারিন ও রুশ ভাষায় অনূদিত ও সমাদৃত হয়।

মাকতাবাতুল হাসান